নন্দ আর কৃষ্ণা
এবং
রোমন্থন

নন্দ আর কৃষ্ণা

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভবিষ্যতে যাঁরা বড়ো হন তাঁদের মতো অদম্য জ্ঞান-পিপাসার প্রেরণায় নয়, ভদ্রভাবে এবং যথোচিত উদরান্ন সংগ্রহের জন্যই নন্দকিশোর লেখাপড়া শিখিয়াছে ইহা যেমন সত্য, সে-সুযোগ সহজেই মিলিবার নয় ইহাও তেমনি সত্য। কিন্তু নন্দকিশোরের ভাগ্য ভালোই বলিতে হইবে—তার ভদ্রভাবে এবং যথোচিত উদরান্ন সংগ্রহের উদ্যম অংশতঃ সফল হইল মণীন্দ্রবাবুর অনুগ্রহে, এবং অত্যল্প চেষ্টাতেই।

বিজ্ঞাপন দেখিয়া সে কম্পিত বক্ষে মণীন্দ্রবাবুর সমীপস্থ হইল, এবং দু'একটি প্রশ্ন করিয়াই মণীন্দ্রবাবু তাহাকে তাঁর পুত্রের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করিলেন। তার বুকের কাঁপুনি থামিল।

পুত্রের জন্য গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করা মণীন্দ্রবাবুর একান্ত প্রয়োজন—অনুগ্রহ বিতরণের আকাঙ্ক্ষা বা তাগিদ তার মূলে আদৌ নাই; কিন্তু বিজ্ঞাপনে আকৃষ্ট হইয়া এত লোক ঐটুকুর জন্য লালায়িত হইয়া ছুটিয়া আসিলেও তাহাকেই নিযুক্ত করা অনুগ্রহ ভিন্ন আর কি। তিনি অধিকতর গুণবান অপর কাহারো উপর ছেলের শিক্ষার ভার দিলেই পারিতেন—সেখানে তাঁর অবাধ স্বাধীনতা—জবাবদিহির প্রশ্নই উঠে না; কিন্তু তা না দিয়া দিলেন তিনি নন্দকিশোরকে, যার "কলেজ কেরিয়ার" ধর্ত্তব্যই নয়। নন্দকিশোর মণীন্দ্রবাবুর এই অপার সুখময় প্রভূত অনুগ্রহ সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করিল।

"কাজ পাইয়া" অর্থাৎ অন্যান্য কর্ম্মপ্রার্থিগণকে পরাস্ত করিয়া, নন্দকিশোরের যতই পুলক হউক, শুনিলে যে নিশ্চয়ই আশ্চর্য হইয়া যাইবে যে, মণীন্দ্র তাহাকে মনোনীত করিয়াছেন তার "কলেজ কেরিয়ার" বা গুণাগুণ বিচারপূর্ব্বক সন্তুষ্ট হইয়া নয়, তার চেহারা দেখিয়া গুণের ওজন বিচারের তুলাদণ্ডে চাপাইলে নন্দ গিয়া ঠেকিত একেবারে মাটিতে—কিন্তু তার চেহারাটা ভালো—আর-সব বাদ দিয়া মণীন্দ্র তাঁর চেহারাটাই পছন্দ করিলেন—তাঁর খোসমেজাজে একটু বাসন্তী বাহারই ফুটিল যেন।

মেয়েলী ছাঁদের সুকোমল আর স্বাস্থ্যোজ্জ্বল পুষ্ট চেহারা নন্দর—বড় বড় শান্ত চোখ; চোখ দেখিলেই মনে হয়, সরল বিশ্বাসে পৃথিবীকে আত্মসমর্পণ করিয়া এ সুখী হইয়াছে—মনে গ্লানি কি কপটতা নাই। গোঁফ অতি সামান্যই উঠিয়াছে—একটু বেশী বয়সেই উঠিয়াছে; কিন্তু মুখ পাকিয়া কড়া হইয়া ওঠে নাই; আর দাড়ি নেহাৎ কচি বলিয়াই তার জন্মস্থান কর্কশ আর ঘোরতর কালো কুৎসিত হইয়া ওঠে নাই; ললাট রেখাহীন মসৃণ—গণ্ডস্থলও তা-ই, অর্থাৎ ব্রণ-কলঙ্ক একটিও সেখানে নাই; মণীন্দ্র আরো লক্ষ্য করিলেন, আঙুল আর করতল দিব্য নরম—আঙুলের গিঁঠগুলি রূঢ় পৌরুষে পালোয়ানীভাবে প্রকট হইয়া নাই। ভুরুও ভালো, চোখও ভালো; কিন্তু ঐ দু'টি শোভার আধার যেন পরস্পর বিচ্ছিন্ন, তাদের সমন্বয়ে একটা সৌকুমার্য্যের উদয় হয় নাই, এমন অনেক দেখা যায়। কিন্তু

নন্দকিশোরের তা হইয়াছে, ভুরু আর চোখ যেন ভাবোন্মেষের চিরস্থির আলিঙ্গনে আবদ্ধ আর একাকার হইয়া গভীর সুন্দর স্বচ্ছ একটি প্রেম-পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছে ; দেখিলেই মনে হয়, আর মনে ছাপ পড়ে যে, এ আপন হইয়া যাইতে বিলম্ব করে না ; প্রীতির আদানপ্রদানে এ প্রশ্ন কি সন্দেহ কি কার্পণ্য করিতে জানে না। তার উপর, ইহাও দ্রষ্টব্য যে, নন্দকিশোরের ঠোঁট দু'খানিও রমণীসুলভ সরস আর লাবণ্যযুক্ত।

ঐ সব লক্ষ্য করিয়া মণীন্দ্র তাহাকে পছন্দ না করিয়া পারিলেন না ; এবং পছন্দ আর নিযুক্ত করবার পর স্থান, অর্থাৎ গৃহশিক্ষকের জন্য নির্দিষ্ট কক্ষ, নির্জন হইলে নন্দকিশোরকে প্রশ্ন করিয়া তিনি দু'একটি খবর জানিতে চাহিলেন। এই প্রথম অর্থোপার্জনের শুভ পথে পদার্পণ করা ছাড়া নন্দকিশোরের নগণ্য জীবনে অনুরূপ বৈচিত্র্যেরও সূত্রপাত হইল ; কারণ, মনীন্দ্রের প্রশ্ন শুনিয়া আর তাঁর রকম দেখিয়া এবং তাঁর প্রশ্নের জবাব দিবার সময় সে কেবলমাত্র বিস্মিতই হইল, প্রশ্নের হেতু, আর তাঁর ভঙ্গীর মর্ম্ম তখনকার মতো তার অনুভূতিই রহিয়া গেল, যেমন থাকে ব্যাধি যন্ত্রণাপদ হইয়া প্রকট হইবার পূর্ব্বে ভিতরে তার সঞ্চারটি।

মণীন্দ্র প্রথমে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি বিয়ে করেছ ?

উপযুক্ত বয়সে বিবাহ করা লজ্জার বিষয় নহে, তবু নন্দকিশোর লজ্জায় লাল হইয়া রহিল ; অত্যন্ত মৃদুভাবে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, বিবাহ সে করিয়াছে।

—করেছ। বলিয়া নির্নিমেষ চক্ষে মণীন্দ্র কয়েক মুহূর্ত্ত কি যেন ধ্যান করিলেন, বোধ হয় স্ত্রী-পুরুষের নিত্য সম্বন্ধটি।

তারপর বলিলেন, তোমার বয়স কত ?

—তেইশ।

—ছেলেপিলে হয়েছে ?

—আজ্ঞে না।

—বউটি বুঝি ছোট ?

এ-প্রশ্নের উত্তর দিতে নন্দকিশোরকে একটু থমকিয়া ঢোক গিলিতে হইল ; মাথা নামাইয়া খুব সংক্ষেপে প্রশ্নের উত্তর দিল ; বলিল, না।

শুনিয়া মণীন্দ্র পুনরায় পূর্ব্ববৎ নির্নিমেষ চক্ষে কি যেন ধ্যান করিলেন আরো গাঢ়ভাবে ; তারপর চক্ষু মুদ্রিত করিলেন যেন ধ্যেয় সামগ্রীটি তাঁর মুদ্রিত চক্ষুর সম্মুখে সর্ব্বতোভাবে পরিস্ফুট আর অধিকতর উপভোগ্য হইয়া উদ্ঘাটিত হইয়াছে।

বলিলেন, বেশ। কিশোর আর কিশোরী। বলিয়া এবার আর ধ্যান করিলেন না, চক্ষু অর্ধনিমীলিত করিয়া প্রসন্নবদনে একটু হাসিলেন।

নন্দকিশোর কিছুই বুঝিল না, কেন উনি ঐ প্রশ্নগুলি করিলেন, এবং কোন্ রসের আবেশে তাঁর চোখ বুজিয়া আসিল। নন্দকিশোর কেবল ধন্য আর কৃতজ্ঞ হইয়া রহিল—লেখাপড়ায় দিগ্‌গজ লায়েক লায়েক উমেদারকে এককথায় বিদায় করিয়া দিয়া তাহাদের অভিলষিত পদে তাহাকেই নিযুক্ত করিয়াছেন যে।

নন্দকিশোর পরম অনুগৃহীত হইয়া কেবল সুখানুভবই করিতে লাগিল, আর কিছু না। নন্দকিশোরের ইহাও মনে হইল যে, উহার কথায় বিস্মিত হওয়াই অন্যায় হইয়াছে।

—বেশ, পড়াও মন দিয়ে। বলিয়া মণীন্দ্র তাহাকে তার বাসস্থান দেখাইয়া দিয়া ছেলে রাখালকে ঘনিষ্ঠভাবে তার সম্মুখে বসাইয়া দিয়া এবং কয়েকটি সদুপদেশ দিয়া চলিয়া গেলেন।

নন্দকিশোর কায়েমী হইয়া বসিল।

নন্দকিশোরের বাড়ীতে আছেন বিধবা মা, আর আছে ছোটভাই বিণ্টু, আর স্ত্রী মমতাময়ী; কিন্তু তাঁদের জন্য ভাবনা যে খুবই দুস্তর আর নৈরাশ্যজনক হইয়া আছে তা নয়; তবে পৈতৃক অর্থে হাত দেওয়া অনুচিত, এবং নগদ খরচের জন্য নগদ টাকার দরকার আছে, তা ছাড়া আজকার দিনই ত' চরম দিন নহে—অনন্ত প্রয়োজন আর সুখ-দুঃখের দিন আছে সম্মুখে, তখন চোখে অন্ধকার দেখিয়া হাহাকার করিতে না হয় তাহারই জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। অকেজো হইয়া বাহাত্তুরের মতো সে, সুস্থ সবল, শিক্ষিত লোক,বসিয়াই বা থাকিবে কেন। মমতার সঙ্গে পরামর্শের ফলে এবং মায়ের সম্মতি লইয়া তাই সে মণীন্দ্রবাবুর ছেলেকে পড়াইতে আসিয়াছে।

ছেলেকে সে বাড়ীতে পড়ায়, সঙ্গে লইয়া বাহিরে বেড়ায়, মনের পক্ষে হিতকর আর বুদ্ধির পক্ষে পুষ্টিকর গল্প উপদেশ শুনায়, আনন্দ আর উৎসাহ দেয় এবং করে নিজের আসল যে কাজ তাই, ভালো একটা চাকরির সন্ধান করে।

এবং আরো কাজ সে করে।

পরম কৃতজ্ঞতাবশে সে ওঁদের সব আদেশই শিরোধার্য্য মনে করিয়া প্রাণপণে করে,আর, বাজারের ভিতর চক্ষুলজ্জা বিসর্জন দিয়াও তা পালন করে। বাড়ীর চাকর বলরামও সেই সুযোগে নন্দর উপর মাঝে মাঝে একহাত কৌশল খাটায়, তাহার জবানি গৃহিণী আদেশ করিতেছেন বলিয়া নন্দকে দিয়া সে তাহারই কাজ করাইয়া লয়।

এদিকে স্বয়ং মণীন্দ্রবাবু আড়চোখে নন্দকিশোরের শিক্ষাদানের কৌশল, কথাবার্ত্তা, রুচি, সহবৎ, অভ্যাস প্রভৃতি খুব বিজ্ঞভাবে লক্ষ্য করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া গেছেন।

ছেলেও পাঠগ্রহণে মনোযোগী হইয়াছে।

মণীন্দ্রবাবুর এই ছেলেটি তাঁর প্রথম পক্ষের। তাঁর প্রথম স্ত্রী পরলোকগমন করিয়াছেন। এবং এক্ষণে জনশ্রুতি ইহাই যে, মণীন্দ্র সম্প্রতি অর্থাৎ বছর দেড়েক হইল, দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিয়াছেন, সহরই তাঁর কর্ম্মস্থল বলিয়া তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করিবার কিছুদিন পূর্ব্বেই সহরেই অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া সস্ত্রীক এবং সুখেই বাস করিতেছেন। দেশের তোয়াক্কা তিনি রাখেন না।

আবার রাস্তার লোকেও ইহা জানে যে, মণীন্দ্রবাবুর টাকার অভাব নাই, ন্যায্য কাজে হুঁশ আর মনে উদারতারও অভাব নাই। নন্দকিশোরের কাছে তাঁর হুঁশের আর উদারতার অকাট্য প্রমাণ ইহাই আছে যে, মাসিক আটটি টাকা বেতনের অংশ তিনি সর্ব্বদাই তাহাকে দিতে রাজি; বলেন, হাত খরচের দরকার হলেই চেয়ে

নেবে ? বুঝলে ? উপরন্তু "খাওয়াদাওয়া" করিতে দেন অন্তঃপুরেই। নন্দকিশোর ভর্ত্তি হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহাকে অন্তঃপুরে লইবার অনুমতি অবশ্যই তিনি দেন নাই, কারণ অজ্ঞাতকুলশীলস্য ইত্যাদি হিতোপদেশটি তাঁর অজানা নয় ; কিন্তু নন্দকিশোরের কুলশীল অর্থাৎ প্রকৃত পরিচয় চারিত্রিক নির্ম্মলতা প্রভৃতি, বেশীদিন অজ্ঞাত রহিল না, নন্দকিশোর ঠাকুরের ডাকে তখন অন্তঃপুরে রন্ধনালয়ে গিয়া আহার করিতে লাগিল ! দিন তার সুখেই যায়।

মণীন্দ্রবাবুকে নন্দকিশোর ভালো করিয়াই দেখিয়াছে—তাঁর চেহারা তার কণ্ঠস্থ হইয়া গেছে ; এবং এই একটা আক্ষেপ তার আছে যে, মণীন্দ্রবাবু গোঁফ যদি অত ছোট করিয়া না ছাঁটিতেন তবে চেহারাটা দেখিতে আরো ভালো হইত, খুলিত—নাকের নীচে আর উপরের ঠোঁটের উপর গোঁফগুলি প্রাণপণে খাড়া হইয়া থাকে, তা অর্থাৎ খোঁচা মারার ভাবটা, না থাকিলেই যেন নিস্তেজ হওয়ায় নিখুঁত হইত, দর্শকের চোখে ব্যাঘাত জন্মাইত না।

মণীন্দ্রবাবুর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীকে, এই গৃহের গৃহিণীকেও নন্দ দেখিয়াছে ; খুব সুন্দরী তিনি ; অন্তঃপুরে কি সামনাসামনি দেখে নাই, দেখিয়াছে অন্তঃপুরের বাহিরে, যখন তিনি স্বামীর সঙ্গে বাহির হন আর ফিরিয়া আসেন, অর্থাৎ তাঁর অতিশয় সুসজ্জিত অবস্থায় ; কৃত্রিমতা, আর, তাঁরই একটা অভিনয়ের ভঙ্গীর ভিতর দূরে হইতে তাঁহাকে নন্দ দেখিয়াছে।

খুবই সুন্দরী তিনি—

আধুনিকতম বেশ আর সপ্রতিভ গতিভঙ্গী এবং দুনিয়াকে নিতান্ত অবহেলা করিয়া তাঁর দৃষ্টিচালনা নন্দ দেখিয়াছে, আর, মনে মনে কত যে বিস্মিত হইয়াছে আর প্রশংসাও করিয়াছে তাহার লেখাজোখা নাই ; কিন্তু ধন্য নন্দ ! মণীন্দ্রবাবুকে ঈর্ষা করিবার কি তাঁর স্ত্রীর প্রতি লুব্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবার মতো ইতর মন তার নয়, অত সাহসীও সে নয় ; দৃশ্য হিসাবে অনিন্দনীয় আর আনন্দপ্রদ, এ বিষয়ে এই মাত্র তার চেতনা, সজ্ঞান অনুভূতি।

ঐ সঙ্গে তার খুবই মনে পড়ে স্ত্রী মমতার কথা, নাম তার মমতাময়ী, এবং সত্যিই সে মমতাময়ী।

এঁর তুলনায় মমতার রূপ প্রণিধানযোগ্যই নয়, তর্কের অবসর না দিয়া তা বলা চলে না ; কিন্তু পার্থক্যও আকাশ পাতাল। নন্দ জানে রূপ ত' প্রসাধন আর মার্জ্জন-সাপেক্ষ কৃত্রিম বস্তু নয়, দেহলগ্ন বাহিরের বস্তু তা নয়। সে দেখিয়াছে ইঁহার বাহিরের রূপ ; কিন্তু উদ্ভিন্ন উন্মুখ অন্তরের দ্যুতিতে দীপ্ত হইয়া প্রেমের যে-রূপটি দেহে বিকশিত হয় তাঁর সে-রূপটি নন্দ দেখে নাই—কল্পনাও করে না—সে দৃষ্টবুদ্ধি তার নাই। ইঁহাকে যখনই সে দেখে তখনই দেখে ইঁহার রূপের অর্থাৎ রূপসজ্জার বিলাসবিভঙ্গ, এমন একটা চঞ্চল মূর্ত্তি যার স্বাদ নাই ; কিন্তু মমতার রূপ প্রসাধনপটুতা আর বেশ রচনার দুরূহ অন্তরাল হইতে উগ্র লীলায়িত হইয়া তার সম্মুখে নাই।

মমতাকে ভাবিতে যাইয়া সে ভেলকি দেখে না ; মমতা অতি সহজ, অতি সুবোধ্য, খুব স্বাভাবিক ; আর তার মন অজানা আধারে লুক্কায়িত নহে বলিয়াই তাহাকেই ভাবিতে নন্দর সবচাইতে ভালো লাগে—মনে হয়, এমন মধুর, এমন

গভীর একাত্মতার অনুভূতি দেওয়া পৃথিবীর মধ্যে কেবল মমতার দ্বারাই সম্ভব।

নন্দকিশোরের আরো মনে হয়, ইনি হয়তো খুবই শিক্ষিতা, "কলেজ কেরিয়ার" হয়তো তারই সমান; হয়তো খুবই বাক্‌পটু, খুবই প্রেমময়ী, খুবই আদরিণী ইত্যাদি; এবং ইহার পদক্ষেপ যেমন ক্ষিপ্র, অর্থাৎ অশান্ত, মুখের কথাও হয়তো অত্যন্ত স্পষ্ট ঋজুতম আকারে তেমনি ক্ষিপ্রবেগে নির্গত হইতে থাকে।

ভাবিয়া নন্দর মনে হয়, ভারি জটিল; আর তার ভয় হয়।

কিন্তু তার অদৃষ্ট ভালো, মমতার তা নয়—মমতার মুখের কথা চমৎকার অস্পষ্ট, আর চমৎকার মৃদু, তার এই অস্পষ্টতা আর মৃদুতা এমন মুগ্ধকর যে, ভুলিতে পারা যায় না, ভাবিতে গেলে স্নেহে মন উদ্বেল হইয়া ওঠে। তবু সে রসিকা, নিজের ধরণে সে বেশ রসিকা, হাসায় সে খুব, কিন্তু যেন অজ্ঞাতসারে; তার চোখের চেহারা কি ঠোঁটের ভঙ্গী দেখিয়া অনুমান করিবার কিছুমাত্র উপায় থাকে না যে, সে মনে মনে তৈরী হইয়া আছে; কিন্তু সে কথার জবাব দেয় এমন স্থিরভাবে, আর, হাসির কথার সঙ্গে তার শান্তমুখের এমন অপূর্ব্ব অসামঞ্জস্য দেখা যায় যে, তাকে ভারি নিরীহ, ভারি নির্দোষ, আর, ভারি ভদ্র সরল মনে হয়। চোখে তার আবেগ নাই, চঞ্চলতা নাই, বিলাস নাই, তীক্ষ্ণতা নাই, অথচ আলস্য নাই, নির্ব্বুদ্ধিতাও নাই, আছে কেবল কোমল একটা ভাষা, অসীম মাধুর্য আর নির্ভরতা, তার চোখের ভাবের সঙ্গে মুখের কথার অপূর্ব্ব মধুর অসঙ্গতি।

আর ভারি ভীরু সে।

স্বামীর আদর গ্রহণ করিতে করিতে সেও আদর করে—দু'হাতে স্বামীর হাত জড়াইয়া ধরিয়া অধিকতর নিকটবর্তী হইতে হইতে—স্বামীর আঙ্গুলগুলি লইয়া খেলা করিতে করিতে হঠাৎ সে সরিয়া যায়।

নন্দ বলে, ও কি, অমন ক'রে ত্যাগ করে গেলে যে।

মমতা বলে, তুমি যদি রাগ করো।

—রাগ করবো কেন। এ সুখের কথা না রাগের কথা!

—যদি অন্যায় মনে করো।

মমতার মুখের এমনি টুকটাক কথাগুলি নন্দর ভারি মিষ্টি লাগে, আর তার ভারি হাসি পায়।

বলে, অন্যায়ের জ্ঞান তোমার কিছুই নেই।

মমতা তখন হাসিয়া বলে, বাঁচলাম।

কিন্তু তার আচরণ কেহ অন্যায় কিংবা তাহাকে কেহ প্রগল্‌ভ মনে করিবে এই ভয়ে সে সর্ব্বদা সতাই সাবধান—স্বামীকে সঙ্গ আর আনন্দদানেও তার বাড়াবাড়ি কোথাও নাই।

তবু সে মাঝে মাঝে ইয়ারকি দেয়, বলে, অমন ক'রে তাকিয়ে আছ যে?

নন্দ বলে, একটু ইয়ারকি দেব ভাবছি।

—উঁহুঁ, ভয় পেয়েছ।

নন্দ বুঝিতে পারে না যে, তাঁহাকে ডিঙ্গাইয়া মমতাই ইয়ারকি সুরু করিয়াছে।

বলে, তার মানে?

—সেদিন রান্নাঘরে একটা বেড়াল কেবলি ছোঁক-ছোঁক করছিল, 'হেই' বলে ধমক দিতেই সেটা খানিক পিছিয়ে ঠিক তোমার মতো করে তাকিয়ে থাকল।

নন্দর মুখে হাসি দেখা দেয়; বলে, তারপর?

—আবার 'হেই' করতেই দিল পিটটান। আমি ত' তোমাকে কিছু বলিনি যে পালাবে!

নন্দ তখন হাসিয়া উল্লাসে আকুল হইয়া যায়, আগাইয়া গিয়া তাহাকে ধরে—দু'হাতের চাপের ভিতর তাহাকে জড়ো করিয়া লয়, চোখ বন্ধ করিয়া তার নিজের আর মমতার রক্তের উত্তপ্ত নাচন অনুভব করে।

মমতা চিঠি লেখে—

নন্দকিশোরও লেখে; নন্দকিশোর চিঠিতে চুম্বন জানায়, কিন্তু মমতা তা জানায় না। তৃষিত নন্দ মনে মনে খুঁৎখুঁৎ করিয়া একবার অপরিসীম তৃষ্ণা জ্ঞাপন করিয়া ঐ বস্তুটি ভিক্ষা চাহিয়া আর অনেক মিনতি ও কাতরোক্তি করিয়া এক পত্র ডাকে দিল।

"পুনশ্চ" দিয়া লিখিল, "চাই কিন্তু"।

কিন্তু মমতা লিখিল: "যদি হঠাৎ কেউ চিঠি দেখে ফেলে তবে সে মনে করবে কি! তোমরা লিখতে পারো; কিন্তু মেয়েরা কথাটা লিখলে কেমন যেন অন্যায় আর 'অভদ্দর' মনে হয়।"

ঐ অন্যায় আর 'অভদ্দর' শব্দটা পত্রে ব্যবহার না করার কারণ দেখাইয়া মমতা অনেক কথাই লিখিতে পারিত—লিখিতে পারিত যে, হাতে-কলমে সত্যিকার জিনিষই যখন চাওয়ামাত্র দিয়ে থাকি তখন পত্রের মারফৎ নিরবয়ব বস্তুর দরকার কি? তার জন্য অনর্থক এত লোলুপতা কেন? এসে নিয়ে যাও, একবার নয়, দু'বার নয়, অগুণতি, যত ইচ্ছে তত—

কিন্তু তা সে লেখে নাই।

কয়েক সপ্তাহ পরে অনেক ইতস্ততঃ করিয়া নন্দ একদিন বাড়ী যাইবার অনুমতি চাহিল।

নন্দকিশোর বিবাহিত মণীন্দ্র তা জানেন—প্রথম দিনই প্রথম সাক্ষাতেই, তিনি জিজ্ঞাসা করিয়া তা জানিয়া লইয়াছিলেন।

নন্দ বাড়ী যাইবার অনুমতি চাহিলেই তিনি আগে মুচকি হাসিলেন; তারপর নন্দর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, বাড়ী যাবে? যাও, কিন্তু দু'রাত্রির বেশি নয়।

দিনের কথা না বলিয়া মণীন্দ্র বলিলেন রাত্রির কথা, কোন্ দিকে তিনি ইঙ্গিত করিলেন নন্দকিশোর তা পরিষ্কার বুঝিল, একটু থতমত খাইয়া গেল।

তারপরই মণীন্দ্র বলিলেন, অত শীগগির চলে আসতে মন চাইবে না; না? বৌটিকে এখানে নিয়ে এলেও ত' পারো!

মনে হইতে পারে, বধূটিকে এতদিনেও তাঁহার গৃহে আনয়ন না করায় মণীন্দ্র মৃদু অনুযোগ করিলেন, এবং এই নিমন্ত্রণে এই অমায়িক ভদ্রলোকটির নিষ্পাপ হৃদ্যতা ব্যতীত ভিতরে আর কিছুই নাই।

নন্দকিশোর মনে করিল তা-ই এবং সে সুখী হইল ; বলিল, মাকে একা থাকতে হয়, আর—

মনীন্দ্র বাধা দিয়া বলিলেন, এদিকে তুমি যে একা থাকো ! বয়স কত তোমার ?

— তেইশ।

—তেইশ। তেইশ বছর বয়সে বিয়ের পরও একা থাকা কত কষ্ট তা যারা থাকে তারাই জানে। তোমাকে আমি আটকাবো না, শাপ লাগবে।—নিয়ে এসো, আনন্দে থাকা যাবে। বলিয়া মণীন্দ্র যেন জরুরী একটা তাগিদই দিলেন।

তাঁর আনন্দ কিরূপ, কোথায় এবং কেন, অর্থাৎ গৃহশিক্ষকের আনন্দেই অনুকম্পাশীল অভিজ্ঞ ঐ ব্যক্তির আনন্দ কি না তাহা নন্দ ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

কুণ্ঠিতভাবে বলিল, যাবো ?

—যাও ; কিন্তু—

—আজ্ঞে, পরশুই চলে আসব।

—দু'রাত্রি পাবে ?

নন্দ জবাব দিল না—

মণীন্দ্র বলিলেন, দিনে গাড়ী কখন ?

—তিনটের।

—তা হলে দুপুরেটাও পাচ্ছ। বলিয়া মণীন্দ্র সম্পর্ক-বিগর্হিত এবং বয়সের তারতম্য হিসাবেও অত্যন্ত অনুচিত একটা ইঙ্গিতের হাসিতে মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া তুলিলেন।

ছুটি পাইয়া নন্দকিশোর বাড়ী আসিল। মা বলিলেন, ভালো ছিলি ?

—হ্যাঁ, মা, যত্ন পাচ্ছি।

মমতা বলিল, আসতে দিলে ?

—হ্যাঁ।

—লোকটি ত' ভালো।

—হ্যাঁ, দয়া আছে। তেইশ বছরের যুবক স্ত্রীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে থাকতে যে কষ্ট পায় তা তিনি জানেন। বলিয়া নন্দ হাসিল ; বলিল, কষ্ট সত্যিই খুব—

মমতা জানিতে চাহিল, তিনি যে জানেন তা তুমি জানলে কেমন করে ?

—বললেই স্পষ্ট ; দরদ দেখালেন খুব। বললেন, বৌকে নিয়ে এস এখানে—তেইশ বছর বয়সে বৌ-ছাড়া হয়ে থাকা যে কত কষ্ট তা কেবল ভুক্তভোগীই জানে।

মমতা অবাক হইয়া বলিল, তোমার সঙ্গে ঐ সব কথা হয় নাকি ?

—হ'ল এবার, মানে, তিনিই বললেন।

—বয়স কত তাঁর ?

—প্রায় চল্লিশ। দ্বিতীয় পক্ষ।

—তাই নাকি। দ্বিতীয়াকে দেখেছ ?—কেমন ?

—খুব সুন্দরী।

মমতার মুখ হঠাৎ ভারি বিমর্ষ হইয়া উঠিল, ওখানকার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীটি খুব সুন্দরী বলিয়া নয়, আর তিনি বৃদ্ধের ভার্য্যা এবং স্বামী অনাত্মীয় যুবক এবং সেই গৃহবাসী বলিয়াও নয়, অন্য কারণে; তার মনে হইল, ভদ্রসন্তান আর গৃহশিক্ষক হিসাবে একটি ব্যক্তির যে মর্য্যাদা অবশ্যপ্রাপ্ত সে মর্য্যাদা তার স্বামীকে দেওয়া হয় নাই, আর, ভদ্র ব্যক্তি এবং বয়সের পার্থক্য হিসাবে যে সংযম আর গাম্ভীর্য্য রক্ষা করা মানুষের উচিত তাহা রক্ষিত হয় নাই, হয় নাই অতি জঘন্য কারণে: পরস্ত্রী সম্বন্ধে কুণ্ঠাহীন আলোচনায় রত হইয়া তিনি সেই শিষ্ট রীতি লঙ্ঘনপূর্ব্বক আত্মসম্মানের কথাটা বিস্মৃত হইয়াছেন, তিনি অগৌরবজনক নির্লজ্জতা আর আত্ম-সংযমের অভাব দেখাইয়া অমার্জ্জনীয় অন্যায় করিয়াছেন।

বলিল, তুমি ওখানে আর থেকো না।

—কেন?

—ভদ্রলোক লোক ভালো নয়।

নন্দ তা বুঝিয়াছে—

এবং শিশুপ্রকৃতি মমতাও তা বুঝিয়াছে দেখিয়া নন্দকিশোর ভারি বিস্মিত আর পুলকিত হইয়া গেল; বলিল, আমার অনিষ্ট তিনি কিছু করতে পারবেন না। তুমি যাবে সেখানে?

—দশ বছর তোমার দেখা না পেলেও নয়।

শুনিয়া নন্দকিশোর উৎসাহে আর প্রেমে পরিপূর্ণ হইয়া মমতাকে আরো ভালবাসিল।

একটা উৎকণ্ঠা লইয়াই নন্দকিশোর মণীন্দ্রবাবুর বাড়ীতে তার কর্ম্মস্থলে, আজ ঠিক দুদিন বাদেই প্রবেশ করিল। মণীন্দ্রবাবুর সঙ্গে দেখা হইবেই; এবং দেখা হইলে অত্যন্ত উৎসুক হইয়া তাহার কাছে তিনি অনেক কথা জানিতে চাহিবেন কিনা, এবং ছুটি মঞ্জুর করিবার সময় তিনি যে সমুদয় কথা বলিয়াছিলেন সেই কথার তন্তুমালা আরো প্রসারিত আর সূক্ষ্ম করিয়া লইয়া ঘটনার অন্বেষণ করিবেন কিনা এবং টিপ্পনী কাটিবেন কি না কে জানে! যদি করেন।

নন্দর একটু বিরক্তি বোধই হইল। কিন্তু নন্দ অস্বস্তি বোধ করিলে কি হইবে! মণীন্দ্রের কথা স্থির হইয়া শ্রবণ করা এবং স্থিরভাবে তাঁহার কথার জবাব দেওয়া তার অনিবার্য্য অদৃষ্ট। তার অনুমান সত্য হইল, অব্যর্থভাবে দেখা গেল নন্দকিশোরের পারিবারিক অস্তিত্বকে মণীন্দ্র আদৌ ভুলিতে পারিতেছেন না, ভুলিতে পারিতেছেন না বলিলে সবটা বলা হয় না, আরো নিবিড়তা তিনি চান।

দুদিন বাদে নন্দকে পাইয়া তিনি পরম বিস্মিত হইয়া গেলেন, বিস্ময়ে চোখ বড়ো করিয়া বলিলেন, কথা ঠিক রেখেছ দেখছি। তোমার দিব্যি, আমি ভেবেছিলাম, একটি দিন চুরি তুমি করবেই; তুমি না করো তোমাকে দিয়ে করাবে একজন।

কে তাহাকে আসিতে দিবে না, দিন চুরি করাইবে তাহা নন্দ বুঝিল, এবং

একটু হাসিল, হাসিয়া সে মাসিক আট টাকা বেতনদাতা আর রোজ দুবেলাকার অন্নদাতার মান রাখিল, প্রায় অর্থহীনভাবে বলিল, আজ্ঞে না।

মণীন্দ্র জানাইলেন, তোমার এই বয়সে আমি এ বিষয়ে খুব হাভেতে হ্যাংলা ছিলাম, তারপর বলিলেন, কিন্তু বৌকে আনলে না যে? বলিয়া পরক্ষণেই বলিলেন, সখীর মতো দু'জনে থাক্‌ত ভালো। একা থাকে ত' সর্ব্বদাই।

কথাটা সংস্কৃত, এবং নন্দ শুনাইল না। নন্দ তৎক্ষণাৎ মিথ্যা উক্তি সাজাইয়া তুলিল; বলিল, মা বললেন; বিষ্টুর পরীক্ষাটা হয়ে যাক, তারপর না হয় যাবে।

তারপর মণীন্দ্র আনন্দ আহরণের বিষয়বস্তু পরিবর্ত্তন করিলেন—

তোমার বোনের বুঝি বিয়ে হয়ে গেছে? বলিয়া তিনি পুনরায় ভারি লিপ্ত হইয়া উঠিলেন, নন্দর মেয়েলী ছাঁদের স্বচ্ছ মসৃণ সুগঠিত মুখের দিকে তিনি স্থির চক্ষে তাকাইয়া রহিলেন. কি তিনি কল্পনা করিতে লাগিলেন তাহা তিনিই জানেন; বোধ হয় ইহাই যে, নন্দর ভগিনীর স্বাস্থ্য নিবিড়, যৌবন সমাগত, মন প্রফুল্ল, মুখ সহাস্য এবং রূপৈশ্বর্য্য অপরিসীম হওয়াই সম্ভব।

কিন্তু নন্দ তাঁহাকে হতাশ করিল; বলিল, বোন আমার নেই।

নন্দকিশোরের বোনের ঝঞ্ঝাট নাই শুনিয়া মণীন্দ্র যেন সঙ্গে সঙ্গে বাঁচিয়া গেলেন। বলিলেন, যাক্, বেঁচেছ। কিন্তু আর ছুটি শীগ্‌গির পাবে না বলে দিচ্ছি।

বলিয়া নন্দকিশোরকে তিনি শাসাইয়া রাখিলেন এবং ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিতে লাগিলেন; স্ত্রীর সঙ্গে তার দীর্ঘ বিচ্ছেদের ভয় দেখাইয়া তিনি যেন একটা দুর্ম্মূল্য আর পবিত্র কৌতুকরসের সৃষ্টি করিয়াছেন।

নন্দ কেবল বিস্মিত হইতেই পারগ—

মণীন্দ্রের এই অস্বাভাবিকতার আওতায় সে বিস্মিত হইয়া বসিয়া রহিল, মণীন্দ্র চলিয়া গেলেন।

রাখালকে নন্দ খুব পড়ায়, কিন্তু মণীন্দ্রের মতো চৌকস পিতার পুত্র রাখাল জড়বুদ্ধি ছেলে, পাঠ্য বিষয় তার মস্তিষ্কে যেন ঠেলিয়া ঠেলিয়া ঢুকাইতে হয়।

চাকর বলরাম আহ্লাদে গোছের, কথা বলিবার সময় দাঁত বাহির করিয়া কেবলই গা দোলায়, আর, ঠাকুর হরেরাম গোবেচারী, যা বলো তাতেই সায়, তাতেই রাজি।

"ছেলে কেমন পড়ছে মাষ্টার?"

জিজ্ঞাসা করিয়া ছেলের পড়িবার অর্থাৎ নন্দর থাকিবার ঘরে প্রবেশ করিয়া মণীন্দ্র চেয়ারে উপবেশন করেন।

নন্দ বলেন, বুঝতে কিছু দেরী হয়, কিন্তু আগ্রহ আছে।

মণীন্দ্রের নাকের নীচেটা, অর্থাৎ গোঁফজোড়া, নড়িয়া ওঠে, তিনি হাসেন আর বলেন, তোমারও কিন্তু বুঝতে দেরী হয়, আর আগ্রহও নেই। তোমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না ত'?

—আজ্ঞে না।

—ঘরটাকে আর একটু সাজানো দরকার; ছেলেমানুষ তুমি, কিন্তু ধরণ তোমার বুড়োর। তোমার শখ কিছু নেই। তুমি জানো না বোধ হয়, বুড়ো

মানুষ আমি একেবারেই পছন্দ করিনে, বুড়ো মানুষের দিকে চাইলেই আমার বুকে যেন ঠাণ্ডা লাগে।

মনিবের মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিতে বিনয়ের অবতার নন্দকিশোর একটু হাস্য করিল।

মণীন্দ্র বলিলেন, হাসলে তুমি, বোধ হয় ঠাণ্ডা লাগার কথায়। কিন্তু দেখ, আমার বাড়ীতে যারা আছে তারা সবাই যুবক।

নন্দ তা স্বীকার করিল, আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কেন বলো ত'? দেখি তোমার বুদ্ধি।

বুদ্ধির পরীক্ষায় নন্দ ফেল করিল, বলিল, তা ত' জানিনে।

—জানো না। আর, সবাই বিবাহিত, লক্ষ্য করেছ? ঠাকুর, চাকর, আর অদৃষ্টক্রমে তুমিও। বিয়ে ক'রে দায়িত্ববোধ বেড়েছে ব'লে কাজ ভালো পাব এ আমার উদ্দেশ্য নয়।

কি তাঁহার উদ্দেশ্য তাহা জানিবার উদ্দেশ্যে, তিনি তা প্রকাশ করিবেন এই আশায়, শিষ্টাচারী নন্দ তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

উদ্দেশ্য প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে উদ্দেশ্যকে জোরালো এবং হৃদয়গ্রাহী করিবার উদ্দেশ্যে মণীন্দ্র একটু হাসিলেন, অকিঞ্চিৎকর হাসি নয়, খুব নিপুণ আর উচ্চস্তরের আত্মগরিমার হাসি।

হাসিয়া বলিলেন, ঘরে যুবতী স্ত্রী যার আছে সে সুখী নয় কি? সুখী। আমি তার সুখের অংশ গ্রহণ করি।

নন্দ হঠাৎ বলিয়া উঠিল, কেমন করে?

—মনে মনে ছাড়া আর কেমন করে। একেবারে বালক। বলিয়া মণীন্দ্র এমন একটা ভঙ্গী করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন যেন নন্দর সঙ্গে কথা কহিয়া সুখ পাওয়া যাইতেছে না।

কিন্তু তাঁর ঐ চাঞ্চল্য ক্ষণিকের, তারপরই তিনি যেন তুষ্ট হইয়া বলিলেন, আমার পর্দ্দা নিরাপদ। বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

নন্দকিশোর ভাবিয়া পাইল না, মনে মনে কেমন করিয়া অপরের সুখের অংশ গ্রহণ করা সম্ভব হয়।

পরীক্ষায় রাখাল এই প্রথম সকল বিষয়ে পাশ করিয়া প্রমোশন পাইল, মণীন্দ্র কলরব করিয়া শিক্ষক নন্দকিশোরকে অভিনন্দিত করিলেন; বলিলেন, "সাবাস মাষ্টার"। তারপর হর্ষ সংবরণ করিতে না পারিয়া নন্দকিশোরের বেতন দু টাকা বাড়াইয়া দশ টাকা করিয়া দিলেন। পটভূমিকা এই পর্য্যন্ত একেবারে দোষমুক্ত; কিন্তু মণীন্দ্রনাথ সত্যিকারের যাদুকর, রূপ বদলাইয়া অন্য পটের সম্মুখে লাফাইয়া পড়িতেও তাঁর বিলম্ব হইল না এবং ছেলের উন্নতিসূচক অত্যন্ত শান্তিপ্রদ সুখাবহ নির্ম্মল ব্যাপারটাই তাঁর মানসিক তৎপরতা এবং একটা তৎপরায়ণতার ফলে হইল নন্দকিশোরের পক্ষে অন্যতম বিক্ষোভের কারণ।

বেতনবৃদ্ধি জ্ঞাপন আর মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করিয়া মণীন্দ্র জানিতে চাহিলেন, খুশী ত'?

নন্দ খুশী বই কি, বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ।

কিন্তু মণীন্দ্র তখন একটা সুচিন্তিত অভিলাষবশত খুব খোশমেজাজে আছেন, বলিলেন, তুমি ত' খুশী এখানে; ওখানে তোমার বউকেও আমি খুশী করতে চাই। তাকে একখানা নীলাম্বরি কিনে দিও। দিও, বুঝলে? টাকাটা চেয়ে নিও।

মণীন্দ্রের এই ব্যাকুল আগ্রহ দেখিয়া অবাক নন্দ দ্বিগুণ অবাক হইয়া গেল, ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি দিতেও তার মন সরিল না, তার এই অবিচলতা অবাধ্য প্রতিবাদের মত দেখাইতেছে বুঝিয়াও সে অবিচলিতই রহিল।

তার স্ত্রী, মমতা, নীলাম্বরি পরিধান করিলে এই মানুষটির ইচ্ছার সার্থকতা কিসে? নন্দর খুবই মনে হইল, লোকটি অদ্ভুত, এবং ইঁহার আচরণ যেন হৃৎকম্পজনক, প্রকৃতির উচ্ছৃঙ্খলতা ক্রমশঃ উদ্‌ঘাটিত হইয়া যেন দুঃসহ হইয়া উঠিতেছে। তার স্ত্রীর সম্বন্ধে ইঁহার মনোভাব আর যেন আবছা সন্দেহের বিষয় নহে, ইনি তাহাকে আকাঙ্ক্ষাই করেন। নন্দকিশোরের মনে হইল, মমতাকে সে আশ্বাস দিয়া আসিয়াছে, মণীন্দ্র তার অনিষ্ট করিতে পারিবেন না; কিন্তু তা ভুল, এখানে থাকা সত্যই নিরাপদ নয়, কুসংসর্গে বুদ্ধি বিপথে চালিত এবং আত্মা অধোগামী হইবেই। নারী-প্রসঙ্গে মানুষের এমন নির্লজ্জ দুর্নিবার লোলুপতা কেমন করিয়া আসে আর প্রকাশ পায় তাহা সে কল্পনাই করিতে পারিল না, এমনই তা অভদ্র।

মণীন্দ্র জানেন না যে, তিনি নীলাম্বরি উপঢৌকন দিয়া একটি নারীকে খুশী করিতে চাহিয়া তার স্বামীর মনে বিদ্রোহী উত্তাপের সঞ্চার করিয়াছেন, সে তাঁহাকে জঘন্য মনে করিতেছে।

তিনি তখনও নিজের আনন্দেই বিভোর—সেখানে বসিয়া মানসচক্ষে দেখিতেছেন, নীলাম্বরি পরিহিতা রমণী অভিসারে যাত্রা করিয়া জ্যোৎস্নালোকে পথ খুঁজিয়া পাইয়াছে।

কিন্তু নন্দকে শীঘ্রই ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিতে হইল, মণীন্দ্রের অরূপ রসের উপদ্রবে নয়, অন্য কারণে।

মণীন্দ্র তাহাকে টাকা দেন, খাইতে দেন, আর দেন পীড়া। পীড়া সম্পর্কে বলা যাইতে পারে যে, অভীষ্টসাধনের উপায় হিসাবে মণীন্দ্রকে মধ্যে রাখিয়া, আর, তাহাকে পুনঃ পুনঃ কার্যকর উৎসাহ দিয়া অদৃষ্ট যেন নন্দকিশোরের সহিষ্ণুতার পরীক্ষা করিতেছে।

পরীক্ষার ফল কি দাঁড়াইত এবং কবে দেখা দিত তা কেউ জানে না, কিন্তু সেদিকে একটা ফল দাঁড়াইবার এবং দেখা দিবার পূর্বেই অন্য দিকে যা ঘটিল তাহাও ফলোৎপাদক—তাহারই ফলে প্রচণ্ড বেগযুক্ত একটাধাক্কাখাইয়া নন্দকিশোর অচিরেই একদিন পলায়ন করিল।

একদিন বৈকালে নন্দকিশোর বলরামকে খুঁজিয়া পাইল না, সচরাচর সে কাছাকাছি :কোথাও থাকে না, আজ এখনও নাই, ঠাকুর তার গ্রাম হইতে আগত এক ব্যক্তির কাছে বাড়ীর খবর জানিতে গেছে—তাহাকে বলিয়াই গেছে, এখনও সে ফেরে নাই। তৃতীয় ব্যক্তি রাখাল—কিন্তু তাহাকে তাহার জনৈক বন্ধু ডাকিয়া লইয়া কোথায় গেছে তারও ঠিক নাই।

বাবু আছেন "ওপরে" —

এদিকে টেলিগ্রাম পিওন আসিয়া টেলিগ্রাম লইয়া দাঁড়াইয়া আছে, তার সবুর সহিবার উপায় নাই—আর, 'কাম শার্প" ছাড়া আর কোন সংবাদই 'তারে' আসে না ; সুতরাং নন্দ সিদ্ধান্ত করিল যে, পরিস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ।

'বাবু' বলিয়া চীৎকার করাও অসম্ভব—লজ্জা করে ; অতএব এখন সাংঘাতিক জরুরী ব্যাপারে উপরে গিয়া সংবাদ দিতে বা সাক্ষাৎ করিতে বাধাটা কি ! বাবু তাহাতে অসন্তুষ্ট হইবেন না নিশ্চয়ই —

গবেষণাপূর্ব্বক, এবং কর্ত্তব্যপালনে মানুষের যে সাহস থাকা দরকার সেই সাহস তাহারও আছে ইহাই মনে করিয়া নন্দ, বাবু যে ঊর্ধ্বলোকে রহিয়াছে সেই ঊর্ধ্বলোকের অর্থাৎ দ্বিতলের অভিমুখে রওনা হইল। তার লক্ষ্য বাবু, এবং হাতে টেলিগ্রামের লেফাফা আর রসিদের কাগজখণ্ড।

সিঁড়ি দিয়া উঠিবার সময় নিষ্পাপ মন, দুরভিসন্ধির অভাব এবং কর্ত্তব্য পালনের সৎসাহস সত্ত্বেও তার বুক একটু একটু কাঁপিতে লাগিল ; যেন অদৃষ্টের উপর শুভাশুভের ভার দিয়া অপরিচিত আর সংকটসংকুল স্থানে সে চলিয়াছে—এত ক্লেশ স্বীকার করিয়া সে সিঁড়ি ভাঙ্গিতেছে ক্রুর নিয়তির বশে যেমন খাদ্য অন্বেষণ করিতে করিতে ব্যাং গিয়া লাফাইয়া পড়ে সাপের একেবারে মুখে।

মমতা শুনিলে স্বামীর ভীরুতায় হাসিবে নিশ্চয়ই ; কিন্তু পরের অন্তঃপুরে প্রবেশ উদ্যম নন্দর পক্ষে এমনিই ভয়ংকর।

সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া সম্মুখেই প্রশস্ত চৌকোণ বারান্দা দুদিকে, বাঁয়ে এবং সম্মুখে প্যাসেজ, প্রত্যেক ঘরে প্রবেশের দরজা ঐ প্যাসেজে—কিন্তু নন্দ দেখিল, সবগুলি ঘরের দরজা বন্ধ। মাত্র একটি ঘরের দরজা খোলা আছে বলিয়া তার মনে হইল , সম্মুখের প্যাসেজ দিয়া অনেকটা অগ্রসর হইয়া গেলে দক্ষিণে সেই দরজা পাওয়া যাইবে, এবং ঘরের অভ্যন্তরটা দেখা যাইবে।

কিন্তু এ ঘরেই বাবু আছেন কি না কে জানে।

পরক্ষণেই তার ত্রাস জন্মিল, গৃহিণী যদি হঠাৎ বাহির হইয়া তাহাকে দেখিয়া চীৎকার করিয়া ওঠেন। তখন চক্ষের পলক না ফেলিতেই অবস্থাটা কি দাড়াইবে ! মানুষের সে অবস্থা ভাবিতেই পারা যায় না।

অপরাধ হাল্কা করিয়া আনিতে নন্দ ডাকিল, বাবু ?

মণীন্দ্রকে নন্দ কোন সম্পর্ক ধরিয়া কি কিছু বলিয়াই ডাকে না, ভাবিয়া চিন্তিয়া সে বাবু বলিয়া ডাকিল। কিন্তু আহ্বান তার ভয়ে সঙ্কোচে এত ক্ষীণ যে, আহ্বানে ফলোদয় হইল না—বাবুর সাড়া আসিল না।

কিন্তু আসিল মধুর একটি গন্ধ, দামী সাবানের উৎকৃষ্ট ঘ্রাণ—

'টেলিগ্রাম পিওন কঠোরস্বরে বলিয়া দিয়াছে, বাবু, জলদি করুনা—

নন্দ আর দু'পা অগ্রসর হইয়া গেল—অনুমান করিল, সাবানের ঘ্রাণ আসিতেছে ঐ খোলা দরজা দিয়া, বাবু ঐ ঘরে বসিয়াই অভিজাত সাবান-সহযোগে বৈকালিক ক্ষৌরকার্য্য সমাধা করিতেছেন—

তারপর সে আরো বুক বাঁধিল ইহাই মনে করিয়া যে, যদি দুর্ভাগ্যবশতঃ গৃহিণীর সম্মুখে সে পড়িয়া যায় তবে সে কাতরস্বরে বলিবে, "ঠাকুরুণ, এই

টেলিগ্রাম এসেছে—অত্যন্ত জরুরী বলেই আমি নিয়ে এসেছি—নীচে আর কেউ নেই! আমাকে ক্ষমা করুন।"

স্বয়ং বাবুর হাতেই টেলিগ্রাম পৌঁছাইয়া দেওয়া সম্বন্ধে প্রায় নিঃসন্দেহ হইয়া নন্দ খোলা দরজা লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইল এবং দরজার সম্মুখে পৌঁছিয়াই, পরমুহূর্ত্তেই, হাতের কাগজ ফেলিয়া দিয়া সে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল—হুঁশ রহিল না, এখন সে কোথায়, চারিদিকে আলো না অন্ধকার, সিঁড়িতে পা দিয়া, না গড়াইয়া সে নামিতেছে, আর কোথায় সে চলিয়াছে।

এক মুহূর্ত্তে ফলগর্ভ এতবড় দৈবযোগ ইতিহাসে আর ঘটে নাই।

কিন্তু আসিল সে ঠিক পথেই, পৌঁছিল সে নিজের ঘরেই, এবং ধপ করিয়া বসিয়া পড়িল নিজের চেয়ারটিতেই—

তখন ঘামে তার সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া গেছে, মাথার ভিতর কেমন করিতেছে, সেই কেমন করাটা অসাড়তা, না যন্ত্রণা, না ঘূর্ণন তাহা উপলব্ধ হইতেছে না; এবং মস্তিষ্কের সেই অবর্ণনীয় অবস্থার দরুণ তার চিন্তাশক্তি, এবং নিজেকে হৃদয়ঙ্গম করিবার সম্বিৎ লোপ পাইয়া গেছে।

টেলিগ্রাম পিওনের প্রশ্ন তার কানে গেল না।

তারপর জন্মিল দুঃসহ প্রবল ত্রাস—

মা'র খাইয়া বিদায় লইতে হইবে—মারিবে জুতা, না বেত।

নন্দর চক্ষু দেওয়ালের দিকে নিষ্পলক হইয়া রহিল, ক্রোধে আগুন হইয়া শাস্তিদাতার ক্ষিপ্ত অবতরণের বিলম্ব আর কত?

যাহা দেখিবার নয় নন্দকিশোর দৈবাৎ তাহাই দেখিয়াছে সন্দেহ নাই; মূঢ়তার বশে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ সে করিয়াছে; অসাধুতার নয়, মূঢ়তার শাস্তি তাহাকে পাইতেই হইবে।

বাবু ঐ ঘরেই আছেন, কেবল উৎকৃষ্ট সাবানের গন্ধ পাইয়া তাহা অনুমান করা বুদ্ধির চূড়ান্ত জড়তা, অথবা যে-নিয়তির বশে খাদ্যান্বেষণে নির্গত ব্যাং লাফাইতে লাফাইতে গিয়া পড়ে সাপের একেবারেই মুখে সেই নিয়তির ক্রীড়া ছাড়া আর কি?

সে জানিত না যে—

কিন্তু অপরাধ চিরকালই অপরাধ, আর না জানিয়া অপরাধ করিলে সর্ব্বদাই তার ক্ষমা আছে, এবং ফলভোগ করিতে হয় না, এমনও নয়, যথা, আগুনে আঙুল পড়িলে আঙুল পুড়িবেই—আগুনে আঙুল দৈবাৎই পড়ুক, কি জানিয়া শুনিয়াই দাও। বিধি লঙ্ঘনের মতোই নিজের মনের নিষেধ লঙ্ঘনেও ঝুঁকি যথেষ্ট।

ছি ছি—

নিন্দা লজ্জা ঘৃণা ধিক্কার ইত্যাদি সূচক ঐ শব্দ দুটি নন্দকিশোর, আতঙ্কে অভিভূত হইয়াও পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতে লাগিল।

সর্ব্বনেশে সেই টেলিগ্রামকে মনে হইয়াছিল দুঃসংবাদের বাহক—কারো শেষ মুহূর্ত্তের ডাক, সে-ই করিল এই সর্ব্বনাশ। আর আরো মাটি করিয়াছে সাবানের সেই গন্ধ। সাবানের গন্ধের অনুসরণ করিয়াই ত' সে দরজায় গিয়া দাঁড়াইয়াছিল—

মনে করিয়াছিল, বাবু খেউরি করিতেছেন, কিন্তু দরজায় গিয়া দাঁড়াইতেই দেখা গেল অন্য লোক—"একেবারে যাচ্ছেতাই ব্যাপার"।

প্রভুপত্নী, তরুণী রমণী মাত্র একখানি তোয়ালে কটিতট হইতে বিলম্বিত করিয়া দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন—দীর্ঘ কেশদামে পৃষ্ঠদেশ আবৃত, ধৌত চুলে চিরুণী লাগাইয়া তিনি হাত তুলিয়া চিরুণী টানিয়া আনিতেছেন পিছনের চুলের ভিতর—দাঁড়াইয়া আছেন দরজার দিকে পিছন ফিরিয়া, এবং সুবৃহৎ দর্পণের পটভূমিকায় তাঁর সর্ব্বাঙ্গের ছায়া প্রতিবিম্বিত হইয়াছে।

এক-পলকে নন্দ তাহা দেখিল না, দেখা অসম্ভব, নন্দ আরো দেখিল যে, তাহারও প্রতিবিম্ব পড়িল সেই পাপ দর্পণেই, প্রভু-পত্নীর বহু পশ্চাতে।

আর সে দাঁড়ায় নাই, আর-কিছু সে দেখে নাই, তারপর সেখানে কিছু ঘটিল কিনা তাহা সে জানে না, কিন্তু পরিণামে কি ঘটিতে পারে, অর্থাৎ ফলভোগ কিরূপ হইবে তাহা সে জানে—হৃদ্‌পিণ্ডে তাহা অনুভূত হইতেছে।

সে পলাইবে নাকি! থাকু বাক্স-বিছানা বেতন—মানরক্ষা সর্ব্বাগ্রে।

কিন্তু মানরক্ষার্থে পলায়ন করিবার পূর্ব্বেই, অর্থাৎ মিনিট পাঁচ-ছয় পরেই, যাহার সম্মুখ হইতে পলায়নের কথা সে ভাবিতেছিল সেই মণীন্দ্রেরই পদশব্দ আসিল সিঁড়ি হইতে—অপমানিত প্রভু মৃত্যু-বিভীষিকার রূপ ধারণ করিয়া অনিবার্য্য রুদ্রমূর্ত্তিতে অবতরণ করিতেছেন।

নন্দর মনে হইল, তিনি যেন চীৎকার করিতেছেন, কই সে ব্যাটা?

নন্দ ছিটকাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, কোণের দিকে সরিয়া গেল, তখনই সরিয়া আসিল বৃহদাকার টেলিগ্রাম পিওনের পশ্চাতে।

মণীন্দ্র আসিয়া দরজায় দাঁড়াইলেন, চৌকাঠ পার হইয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন, আর নন্দকিশোরের কম্পমান প্রাণ কণ্ঠে উঠিয়া আরো বেগে কাঁপিতে লাগিল।

ক্রোধে যে ব্যক্তি একেবারে নিঃশব্দ হইয়া যায় সে-ই হয় আরো ক্ষমাহীন।

কিন্তু "কই সে ব্যাটা?" বলিয়া তারস্বরে চীৎকার করিয়া মণীন্দ্র তাহাকে খুঁজিলেন না, সহজ লোক যেমন সহজভাবে কথা কয় তেমনি সহজভাবে তিনি বলিলেন, এই নাও। একটু দেরী হ'ল। বলিয়া তিনি পিওনের হাতে রসিদ দিলেন।

পিওন চলিয়া গেল—

তৎক্ষণাৎ দেখা দিল চরম সংকট, নন্দর কণ্ঠাগত প্রাণ বোঁ করিয়া ওষ্ঠাগত হইল; তাহার আর তাঁর মাঝখানে অন্তরাল আর নাই, বৃহৎ শরীর লইয়া সে প্রভুর চোখের উপর দাঁড়াইয়া আছে!

আড়ষ্ট নন্দ কণ্ঠে একটা ঢোঁক গিলিল।

যে-মেঘ দেখিয়া লোকে ঝঞ্ঝাসহ বজ্র শিলা আর বারিপাতের প্রতীক্ষা করে সে-মেঘে তা কিছুই ঘটে না এমন ঢের দেখা গেছে—তেমনি ঘটিল এখানেও, দুর্য্যোগ আসিল না। মণীন্দ্র তাহাকে দেখিয়াই কলকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, আরে, তুমি ছিলে কোথায়? টেলিগ্রাম বুঝি তুমি দিয়ে এসেছ ওপরে!

স্বীকার করিতে গিয়া নন্দকিশোরের শুষ্ক কণ্ঠ এবং শুষ্ক জিহ্বা আরো আড়ষ্ট হইয়া গেল, ঠোঁটের ফাঁক দিয়া শব্দের স্থানে খানিক বায়ু বাহির হইল কেবল।

মণীন্দ্র বলিলেন, রাখাল কি বলরাম ছিল না এখানে ?

নন্দ আগে দিল একটু গলা খাঁকারি, উহাতে বাক্‌শক্তি সামান্য কার্যকর হইলে সে উচ্চারণ করিল, আজ্ঞে না।

সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়িতে হিল্-উঁচু জুতার খট্‌খট্ দ্রুত শব্দ উঠিল, গৃহিণী আসিতেছেন। নন্দকিশোর আর কিছু বলিতে চেষ্টা করিল না, করিলে সে দেখিতে পাইত, তার বাক্‌শক্তি পুনরায় লুপ্ত হইয়া গেছে ; কারণ গৃহিণী আসিতেছেন ; তাহার সম্মুখেই তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ স্বামীর কাছে করিবেন এবং প্রতিকার চাহিবেন এমন দৃপ্ত তেজে আর এমন ক্রুদ্ধ হইয়া যে তখন—

কিন্তু কিছুই ঘটিল না, তিনি তা করিলেন না, স্বামীর জন্য তিনি দাঁড়াইলেন না পর্যন্ত, একাই অগ্রসর হইয়া গেলেন রোজ যেমন যান ; মণীন্দ্র তাঁর অনুগমন করিলেন, বলিয়া গেলেন, তুমি বুঝি বেড়াও না, মাষ্টার ? বেড়িও, নইলে ও চেহারা থাকবে না।

নন্দকিশোর তখন মুহূর্ত্ত দুই নিশ্চেষ্ট অবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকিয়া সরিয়া যাইয়া চেয়ারে বসিল, একেবারে গা ছাড়িয়া দিয়া অবিলম্বেই একটা নিঃশ্বাস মুক্ত করিয়া দিল এবং সেই নিঃশ্বাসের সঙ্গে তার জ্বালা যন্ত্রণা উৎকণ্ঠা আতঙ্ক প্রভৃতি অশুভজনিত সমুদয় গ্লানি বহিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল, ওঝার ফুঁ-এ বিষের মতো, তারপর ক্রমে সে খুশী হইয়া উঠিল ; এমনি ক্ষমাই ত' মানুষকে করা উচিত, অজানত দৈবাৎ যে-অপরাধ ঘটিয়া যায় যথার্থ ভদ্রলোক নিজেরই মনে তার উপযুক্ত শাস্তি ভোগ করে, বাহিরের শাস্তি কখনো অতিরিক্ত, কখনো অত্যাচার।

যে ব্যাপার সংক্ষোভে তুমুল এবং মারাত্মক ভাবে ক্ষতিজনক হইয়া উঠিতে পারিত তাহা ক্ষমাময় উদার নির্লিপ্ততার ভিতর দিয়া নিঃশব্দে শেষ হইয়া গেছে। অন্য দিক্ দিয়া তাহার আর গুরুত্ব রহিল না, কেবল রহিল নিষ্কৃতিদানের দরুণ ওঁদের প্রতি অপার কৃতজ্ঞতা আর, অতুল একটা আনন্দ।

পরদিন দ্বিপ্রহরে মণীন্দ্র আহারান্তে তাঁর কাজে বাহির হইয়া গেলেন। আজকাল তাঁহাকে কাজে একটু বেশি ব্যস্তই দেখা যাইতেছে।

নন্দকিশোর রান্নাঘরের দুয়ারের দিকে মুখ করিয়া আর একটা দেয়াল ঘেঁষিয়া খাইতে বসিয়া গেছে।

খানিকক্ষণ চুপচাপ থাকিয়া ঠাকুর কুণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, ডালটা কেমন হয়েছে, বাবু ?

ভালো না হইলে নন্দ ভালোই বলিত, বলিল, ভালো হয়েছে।

—ঝোল্‌টা ?

—ঝোল্‌টাও ভালো হয়েছে।

ঠাকুরের ইচ্ছা, মাহিনা বাড়াইবার প্রস্তাবটা মনিবের কাছে আজকালই করে, একটু দুঃখিতভাবেই বলিল, কিন্তু বাবু ত' কিছু বললেন না।

মণীন্দ্র রোজ তারিফ বা নিন্দা করেন।

নন্দ তাহাকে সান্ত্বনা দিল, বলিল, ভুলে গেছেন হয়েতো।

বলিয়াই নন্দ অনুভব করিল, ঘরের ভিতর একটা ছায়া পড়িল, ছায়া

ভৌতিক নয়, মনুষ্যদেহের, কারণ, পরক্ষণেই কণ্ঠস্বর শুনা গেল্ : ঠাকুর, বলরাম কোথায় ?

শুনিয়াই বুঝা গেল, কণ্ঠস্বর নারীর, এবং তা শুনিয়াই নন্দকিশোর অধোমুখ, শশব্যস্ত, ত্রস্ত এবং মনে মনে পলায়নোদ্যত হইয়া উঠিল, মুখে ভাতের গ্রাস তোলার চাঞ্চল্য বন্ধ হইয়া গেল, এবং দরজায় আসিয়া দাঁড়াইলেন গৃহিণী।

ঠাকুর বলিল, তাকে আমি একটু বাজারে পাঠিয়েছি, মা, এক পয়সার পান আনতে।

ঠাকুর বড্ড পান খায় ; এবং একটি করিয়া পয়সা সে রোজ প্যান-খরচা পায়।

কিন্তু গৃহিণী তখন মাষ্টারবাবুকে লক্ষ্য করিতেছেন, লক্ষ্য স্থির রাখিয়াই ঠাকুরকে বলিলেন, ঠাকুর, এ-বাবুকে গাদার মাছ দিয়েছ যে ?

ঠাকুর হাত কচলাইতে লাগিল।

গৃহিণী ঠাকুরকে আদেশ করিলেন, পেটির মাছ দেবে। —খান্ আপনি, খাওয়া বন্ধ করলেন কেন ?

ঠাকুরকে যেমন তাহাকেও তেমনি আদেশই তিনি করিলেন , নন্দকিশোরের মনে হইল, আদেশ মান্য করিতে সে বাধ্য, লজ্জায় চোখ-মুখ লাল করিয়া আর ছোট ছোট গ্রাস ধীরে ধীরে মুখে পুরিয়া নন্দ তাঁর আদেশ মান্য করিতে লাগিল।

গৃহিণী পুনরায় আদেশ করিলেন, ঠাকুর, দু পয়সার মিছরি নিয়ে এস ত' শীগ্গির। যে মিছরির ওপর মাছি বসে আছে দেখবে তা খবরদার এন না। যাও। আমি এঁর খাওয়ার কাছে দাঁড়াচ্ছি।

নন্দকিশোরের মনে হইল, গৃহকর্ত্রীর আদেশ করিবার ক্ষমতা অস্বস্তিকর হইলেও তাঁর এ আচরণটি খুবই অনুকম্পাময়, খুবই শিষ্ট, খুবই দায়িত্ববোধের পরিচায়ক।

ঠাকুর পয়সা লইয়া মিছরি আনিতে গেল।

এবং একা পড়িয়াই নন্দকিশোরের বুক আবার বেজায় ঢিপ ঢিপ করিতে লাগিল, গৃহকর্ত্রীর অনুকম্পা, শিষ্টতা এবং দায়িত্ববোধ যতই স্নিগ্ধ আর শান্তিদায়ক হউক, স্নিগ্ধতা আর শান্তির সেই আবহাওয়া টিকিতে পারিল না, অপরাধের স্মৃতি সজীব, আর কর্ত্রীর উপস্থিতি সেই মুহূর্তেই নিদারুণ উদ্বেগজনক হইয়া উঠিল।

সে এতক্ষণে যেন তার একটা ভুল বুঝিতে পারিল : নিজেরই হাতে যথেচ্ছ আর অবিসম্বাদিত শাসনক্ষমতা থাকিতে ইনি ঘটনার যথাযথ এবং আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা দিয়া স্বামীর কাছে অকারণে লজ্জা পাইতে যাইবেন কেন। পাপীকে দণ্ড দিবার হক্ তাঁর আছে তাই দিতে তিনি আসিয়াছেন।

কিন্তু সব তার আগাগোড়া ভুয়ো [illegible] ভুসোর মত কালো আর হাল্কা। নন্দ যাঁহাকে চণ্ডিকা, [illegible]নকর্ত্রী, আর [illegible]ী মনে করিয়া ভয়ে লজ্জায় ক্ষোভে এতটুকু হইয়া [illegible] আর অনর্গল ঘা[illegible], তিনি তখন তার অবনত মুখের দিকে তরল চক্ষে চা[illegible] মৃদ[illegible]তেছে[illegible]

হাসিটুকু নন্দ দেখিতে পা[illegible] না, [illegible] দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্রী বলিলেন, কাল হঠাৎ অমন করে এ[illegible] দাঁড়ানো আপনার উ[illegible]নি।
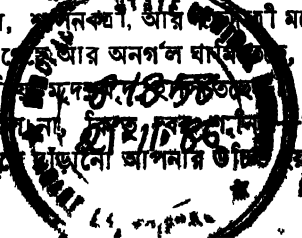
খুঁজিলে ভং'সনার হুল ঐ কথার ভিতর খুঁজিয়া পাওয়া যাইতে পারে।

ক্ষমা ভিক্ষার সুযোগ পাইয়া নন্দর কথা ফুটিল, নিজেকে যেন সে সেখানে লুটাইয়া দিয়া বলিল,—আজ্ঞে, সেজন্যে আমি অপরাধী আর অনুতপ্ত। আমাকে ক্ষমা করুন।

প্রার্থনাবাক্য উচ্চারণ করিয়াও নন্দ তীব্রতম তিরস্কারের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, আর তার তখনকার কাতরতাকে অবিশ্বাস কেহ করিতে পারিবে না।

অপরাধী আর অনুতপ্ত নন্দকিশোরের কাতর ক্ষমা-প্রার্থনা বিফল গেল, ক্ষমা করিতে তিনি রাজী কি নারাজ তা তিনি জানাইলেন না, বলিলেন, আমি তখন কেবল গা ধুয়ে এসে দাঁড়িয়েছি, হঠাৎ আয়নার ভেতর আপনাকে দেখলুম, আপনার ছায়া পড়ল।

নন্দ তা জানে, মর্ম্মান্তিকভাবেই জানে।

উনি বলিলেন, কিন্তু অমন করে ছুটে পালিয়ে গেলেন ভয়ে, লজ্জায় না ঘৃণায়?

এ প্রশ্নের উত্তর কি থাকিতে পারে! নন্দ কথা কহিল না, উঠিবার উপক্রম করিল।

—ভয় পাবার কি ছিল। ঘৃণাই বা করবেন কেন! দোষ ত' আপনারই। লজ্জা পেয়েছিলেন বুঝি? ও কি! খাওয়া শেষ না হতেই উঠছেন যে? আমি তবে যাই এখান থেকে।

বলিয়া তিনি গেলেন না, বোধ হয় যে মিছরিতে মাছি বসে নাই সেই মিছরি না লইয়া তিনি যাইবেন না।

নন্দ উঠিল না, অবসন্ন হস্তে ভাত তুলিয়া মুখে দিতে লাগিল।

—আপনার বিয়ে হয়েছে?

নন্দ ধীরে ধীরে মাথা কাত করিয়া জানাইল, তার বিবাহ হইয়াছে।

—তবে ত' বোঝেনই সব। কিন্তু আর কখনও যদি ওপরে আসেন তবে খবর দিয়ে আসবেন।

উপরে আসিতে তিনি নিষেধ করিলেন না। খবর দিবার লোক যখন থাকে না তখন টেলিগ্রাম আসিলে কি করিতে হইবে তাহাও তিনি বলিলেন না।

খবর দিতে অতিশয় সম্মত এবং তৎসহ ধন্য হইয়া নন্দ বলিল, আজ্ঞে।

—তাই করবেন। আর একটা কাজ করবেন, আমার হুকুম—

বলিয়া তিনি চুপ করিয়া রহিলেন।

আদেশ গ্রহণ করিতে মনে মনে মাথা পাতিয়া নন্দ নিজের অজ্ঞাতেই যেন হঠাৎ মুখ তুলিয়া চাহিল। সম্মুখবর্ত্তিনীর মুখের উপর তার দৃষ্টি পড়িল, তাঁহাকে না দেখিয়া সে পারিল না, দৃষ্টি অন্য দিকে ফিরাইবার পূর্ব্বেই যে একটিমাত্র চকিত মুহূর্ত্ত অতিবাহিত হইল, সেই একটি মুহূর্ত্তেই তাঁর সমস্ত মুখ-মণ্ডল তার দর্শনেন্দ্রিয় প্রত্যক্ষীভূত হইল, পরিহার করা গেল না; সে দেখিল, এবং তার হৃদয়ঙ্গম হইল যে রূপ অজস্র, এত যে, আর, এমনি বিভ্রম ঘটানো তার শ্রী উজ্জ্বলতা যে, দৃষ্টি রূপ দেখিতে দেখিতে রূপ দেখিতে ভুলিয়া গিয়া রূপের দিকেই নির্নিমেষ হইয়া থাকিতে চায়।

তবু সে তাড়াতাড়ি চোখ নামাইল, কর্ত্রী বলিলেন, আমার হুকুম মানবেন ত'?

নিতান্ত বশংবদ নন্দ যেমন করিয়া বিবাহের কথা স্বীকার করিয়াছিল, ভয়ে ভয়ে মাথা কাত করিয়া হুকুম মানিতেও সে তেমনি রাজি হইল, কিন্তু সেটা যে এমন হাসির কথা হইবে তা কে জানিত! কর্ত্রী খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন; তাহাতে মধুবৃষ্টি কতটা হইল এবং মুক্তা ঝরিল কি না তা নন্দ জানে না, সে কেবল কর্ত্রীর কাছে নির্বোধ বনিয়া অপ্রস্তুত হইল।

তারপর, যে আদেশ মান্য করিতে নন্দ মাথা কাত করিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছে সেই আদেশবাক্য তিনি উচ্চারণ করিলেন, বলিলেন,—পালাবেন না, আমাকে আয়নায় যেমন দেখেছেন, তেমনি দেখা আমার ভালো লাগে আপনাকে আরো—আপনি নির্ব্বোধ, তাই দিশে পান না, পালান।

বলিয়া তিনি থামিলেন।

পলায়নের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হইল। নন্দ সাষ্টাঙ্গে মাটির সঙ্গে মিশিয়া গিয়াও সর্ব্বান্তঃকরণ দিয়া অনুভব করিতে লাগিল যে, তিনি দুই চক্ষুর দৃষ্টির দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন, আর, অল্প অল্প হাসিতেছেন।

পরক্ষণেই তার কাপড়ের খসখস শব্দ উঠিল, তিনি প্রস্থান করিলেন, যে মিছরিতে মাছি বসে নাই সেই জরুরী মিছরির কথা তিনি বোধ হয় তখন ভুলিয়াই গেছেন।

তারপর নন্দ কি করিল, কেমন করিয়া করিল; উঠিয়া না বসিয়াই রহিল, খাওয়া শেষ করিল কি না, কোথা দিয়া সময় যাইতেছে, কেমন করিয়া আর কোন পথে আসিয়া সে তার তক্তাপোষে আছড়াইয়া পড়িল তাহা সে জানে না।

সর্ব্বপ্রকার উপসর্গের অতীত একটা তুরীয় অবস্থায় কিছুক্ষণ বেহুঁশ অসাড় হইয়া পড়িয়া থাকিবার পর সময়ের শুশ্রূষায় ক্রমে তার চোখে দৃষ্টি, বুকে নিঃশ্বাস, মস্তিষ্কে চিন্তার চৈতন্য এবং হাত পা নাড়িবার সামর্থ্য ফিরিল, তখনই সে উঠিল যেন বহুদিন পরে রোগশয্যা ছাড়িয়া নন্দ উঠিয়া বসিল।

বলিল, পালাই।—কারো কাছে সে বলিল না, মনের কথাটা মুখে ফুটিল। চামড়ার ব্যাগটি লইয়া নন্দ বাড়ীর বাহির হইয়া গেল, বাক্স বিছানা আর একুশ দিনের বেতন ফেলিয়া সে চলিয়া আসিল।

মাকে বলিল, তাড়িয়ে দিলে। বলিয়া প্রণাম করিল।

মমতাকে বলিল, পালিয়ে এলাম। বলিয়া গভীর আগ্রহে তার মুখচুম্বন করিল।

পুত্রের পথশ্রম দূর হইলে মা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাড়িয়ে দিলে কেন?

নন্দকিশোর এদিকে সাদাসিদে আর সাধু যতই হউক ওদিকে মিথ্যা কথা বলিতে সে রাজী আছে; বলিল, আমার বিদ্যে অল্প; বেশী বিদ্যের লোক পেয়ে গেছে বোধ হয়।

—তা'তেই তুই সর্ব্বস্ব ফেলে রেখে চলে এলি?

নন্দকিশোর বলিল, কতবড়ো অবিশ্বাসের কাজটা করলেন তিনি তা বুঝতে পারছ না? রাগ হয় না? একটু মেজাজই দেখিয়েছি, মা। বলিয়া নন্দ হাসিল।

—কিন্তু তার ত' তলে তলে কাজ হাসিল করার কারণ দেখিনে!

—কি জানি, তাঁর প্রকৃতিই ঐ রকম , সাধারণ কথাই তিনি স্পষ্ট করে বলেন না।

—জিনিসগুলো পাবি ত' ?

—পাবো, মা। কিছু ভেবো না।

মমতার সঙ্গে আবার দেখা হইতেই মমতা বলিল পালিয়ে ত' এলে। কিন্তু তল্পিতল্পা ফেলে কেন ?

—তুমিই ত' চলে আসতে বলেছিলে।

—কিন্তু—বলিয়া মমতা থামিয়া গেল ; তারপর বলিল, জিনিসগুলো নিয়ে আসার সময় হ'ল না, এ কেমন চলে আসা ! তোমার রাগ এত তা ত' জানতাম না। গুরুতর কিছু ঘটেছে নিশ্চয়ই।

—ঐ যে বললাম, একটু মেজাজই তাঁকে দেখিয়েছি। তাঁর রোখ দেখে দেরী করতে সাহস হ'ল না।

—তা হবে। বলিয়া মমতা তাহাকে ছাড়িয়া দিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১

খানিকটা সময় নন্দর ভাবনার ভিতর দিয়াই কাটিল , মা এবং মমতা তার এই চলিয়া আসাটা যেন সম্পূর্ণ পছন্দ করেন নাই। জেরা করিয়াছেন খুব। কিন্তু মায়ের আর স্ত্রীর জেরা, যদি অবুঝও হয় তবু, মানুষকে উদাস কি আনমনা করে না—নন্দকিশোরকেও করিল না। যা মানুষকে উদাস আর আনমনা করে, নন্দকিশোরের বেলায় আজ তাই ঘটিল রাত্রে, নন্দর নিদ্রিতাবস্থায়।

নারীর রূপ আর আকর্ষণ, বিভ্রান্তিকর সেই মোহন ইন্দ্রজাল, পুরুষ অত সহজে আর অত সত্বর ভুলিতে পারিলে পৃথিবীর বুক হাল্‌কা, কাব্য ক্ষুণ্ণ, এমন কি মরণশীল, পুরাণ অপাঠ্য, আর পাগলের সংখ্যা চৌদ্দ আনা হ্রাসপ্রাপ্ত হইত। তা যা'তে না হয় সেইজন্যই বোধ হয় নন্দকিশোর সেই রাত্রেই এক অভাবনীয় স্বপ্ন দেখিল।

স্বপ্ন ব্যাপারটাই অলীক, অর্থাৎ অমূলক, লোকে সাধারণতঃ তা-ই বলে ; কিন্তু যার মূলের সন্ধান আপাততঃ প্রথম দৃষ্টিতেই পাওয়া গেল না তাহাকেই অমূলক বলা বোধ হয় সমীচীন নয়। মানুষের বিস্মৃত অন্বেষণ, যাচঞা, যত্ন, অপূর্ণ ইচ্ছা, মুহূর্তের কি যুগব্যাপী গোপন আকাঙ্ক্ষা, শোনা গল্প, দেখা ঘটনা, অর্থশূন্য কল্পনা ইত্যাদি জোড়াতাড়া দিয়া জখাখিচুড়ি স্বপ্নও নাকি লোকে দেখে, ভালো দেখে, মন্দ দেখে, একটানা দেখে, ভাঙা ভাঙা দেখে ; কোনোটার মানে হয়, কোনোটার তা হয় না ; কিন্তু মূলে থাকে দ্রষ্টার চেতন কি সুপ্ত মনের গতি আর ক্রিয়া, তা যেমনই হোক, যতদিনকারই হোক। জ্ঞানতঃ থাক কি অজ্ঞাতে থাক, অর্থাৎ স্বপ্ন অমূলক নহে বলিয়াই স্বপ্নতত্ত্বজ্ঞের বিশ্বাস।

নন্দকিশোরের মতো বাহ্যতঃ নির্ব্বিকার ঠাণ্ডা মানুষের বুকেও বোধ হয় রূপের অর্চ্চনা করিবার প্রচ্ছন্ন অভিলাষ ছিল, কিন্তু যে অনুপম আশ্রয়ে স্বপ্নের সৃজন হইবে তাহা আগে সে দেখে নাই বলিয়াই বোধ হয় আগে সে স্বপ্ন দেখে নাই। আজ স্বপ্ন-সৃষ্টির সেই অনুকূল পাইয়া সে স্বপ্নটা দেখিল।

দেখিল, মণীন্দ্রবাবুর স্ত্রী, অনুপমা পুরনারী, যাঁর ভয়ে সে বাক্স বিছানা এবং একুশ দিনের বেতন ত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিয়াছে, তিনি একখানি অতিশয় উজ্জ্বল সিংহাসনে বসিয়া আছেন, পদযুগল সংস্থাপিত করিয়াছেন অতি শুভ্র গজদন্তনির্ম্মিত আর ক্রমনিম্ন একখানা পাদপীঠের উপর, অস্তমিতপ্রায় সূর্য্যের লোহিত দীপ্তির তুল্য গাঢ় রক্তবর্ণ বসন প্রান্ত তাঁর গুল্ফ চুম্বন করিয়াছে ; আর, বিশ্বাস করুন যে, সে, অর্থাৎ নন্দকিশোর তাঁর পদপ্রান্তে বসিয়া দ্বিরদরদ-নির্ম্মিত শুভ্রাসন আর বসনের লোহিতরাগযুক্ত প্রান্ত লক্ষ্য করিয়া অক্লান্তভাবে পুনঃ পুনঃ পুষ্পাঞ্জলি নিক্ষেপ করিতেছে।

নন্দ আরো দেখিল যে, তাঁর মুখখানা বিষণ্ণ, এবং তা বিষণ্ণতার ছায়া ম্লানিমার অনুলেপনে চমৎকার অভয়প্রদ আর স্নিগ্ধ দেখাইতেছে।

ঐ চরণে পুষ্পাঞ্জলি নিক্ষেপ করিতে করিতে স্বপ্ন কখন বিলীন হইয়া গেছে তা নন্দকিশোর জানে না। এ-স্বপ্ন তেমন স্বপ্নও নয় যাহাতে বুক ধড়ফড় করিয়া রোমাঞ্চিত কি উত্তেজিত অবস্থায় মানুষের ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। স্বপ্ন-দর্শনের পরই নন্দকিশোরের ঘুম ভাঙ্গিল না ; এবং সকালবেলা ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিবার পরও স্বপ্ন বৃত্তান্তই যে তাহার মানসিক সকল বিষয়ের সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী হইয়া উদিত হইল তাহাও নয়। খানিকক্ষণ এদিক ওদিক করিবার পর এবং মা ও বিষ্টুর সঙ্গে দু' চারবার কথোপকথনের পর মুখ ধুইতে বসিয়া খড়িমাটি দিয়া দাঁত মাজিতে মাজিতে অকস্মাৎ তার মনে পড়িয়া গেল যে, সে স্বপ্ন দেখিয়াছে। স্বপ্নটা মোটেই বড় নয়—মাত্র ইহাই যে, একটি নারীমূর্ত্তির পায়ে সে ফুল দিতেছে ; কিন্তু নারীটি যেমন, স্বপ্নের সেই অংশটাই স্বপ্নে প্রত্যক্ষে একাকার হইয়া একেবারে ঝক্ মক্ করিয়া উঠিল—নন্দকিশোরের অন্তর যেন আলোকিত হইল—

দন্তধাবন সে দ্রুতবেগেই করিতেছিল। স্বপ্ন ঐ ভাবে মনে পড়িয়া যাইতেই তার হাতের সে কাজটা মুহূর্ত্তেকের জন্য বন্ধ হইয়া গেল, তারপর শ্লথভাবে চলিতে লাগিল, এবং তারপর একটা অপরাধ হইতেছে মনে করিয়া নন্দকিশোর পূর্ব্বের চাইতেও দ্রুতবেগে দাঁত মাজিতে লাগিল।

ত্রিলোকপূজ্য দুর্জ্জয় দেবগণ এবং তাঁদেরও বরেণ্য মহাতপা মুনিগণ যে বিষয়ে ধৈর্য্য ধারণপূর্ব্বক অন্যথাচরণ করিতে পারেন নাই—লজ্জাহীনের মতো পরাভব স্বীকার করিয়াছেন - নন্দকিশোর, মাটির মানুষ, সেই কার্য্যসাধন করিতে গেল হুঁ হুঁ শব্দে দাঁত মাজিয়া—দাঁত মাজিয়া সে রূপের প্রভাব পরিবেশ ভগ্ন বা অতিক্রম করিবে।—সে অঘটন ঘটিল না ; রূপের প্রভাব আর পরিবেশের মধ্যেই তার চিত্ত বিচরণ করিতে লাগিল। অপরাধ হইতেছে জানিয়াও সে অনুভব করিতে লাগিল সাবানের সেই ঘ্রাণটি, যা তাহাকে মরীচিকার মতো ভুলাইয়া ভুলপথে লইয়া গিয়াছিল।—বায়ুবাহিত সেই ঘ্রাণের অনুসরণ করত অগ্রসর হইতে হইতে তার

গতি আচম্বিতে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল যে দৃশ্য দেখিয়া সে-দৃশ্য তার এখনই মনে পড়িল না, কিন্তু বরবর্ণিনীর যে অঙ্গ-সৌরভ তাঁর অঙ্গচ্যুত হইয়া তার নাসিকায় প্রবেশ করিয়া বহুক্ষণ স্থিতিলাভ করিয়াছিল, স্বপ্নদৃষ্ট মূর্ত্তির শান্ত কোমল বিষণ্ণতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হইয়া আর ঘনীভূত হইয়া, সেই সৌরভটুকু যেন তার চৈতন্যের সঙ্গে মিশিয়া যাইতে লাগিল, এবং তাহা ঘটিতে লাগিল যেন বলপূর্ব্বক দ্রুতহস্তে দাঁত মাজিয়া তাহাকে নিবারণ করা গেল না।

ছোট ভাই বিণ্টু আসিয়া বলিল,—দাদা, বৌদি বলছে, তোমার মুখ ধুতে আজ বড়ো দেরী হচ্ছে।

—যাই। বলিয়া ক্ষিপ্রগ নন্দকিশোর তাড়াতাড়ি কুলকুচা করিতে লাগিল।

বিণ্টু বলিল, চা ভিজিয়েছে।

নন্দকিশোর পুনরায় বলিল, যাই।

নন্দকিশোর রান্নাঘরের ভিতরে মমতার সম্মুখে বসিয়াই চা খায়। মুখ ধুইয়া সেখানেই সে গেল—চা খাইতে লাগিল, আর, তার মুখে মৃদু একটু হাসি লাগিয়াই রহিল।

তার সে হাসির দিকে চাহিয়া মমতা জানিতে চাহিল, হাসছ যে অমন করে?

—কেমন করে?

—বদমতলবী লোক মতলব ঠিক করে ফেলার পর ঐ রকম একটা দুষ্টু ফুর্ত্তির হাসি হাসে।

নন্দকিশোর মমতার চাতুর্য্যে অবাক না হইয়া পারিল না, এবং তার মুখখানা সঙ্গে সঙ্গে ছায়াচ্ছন্ন হইয়া গেল, তারপরই সে হাসিয়া বলিল, আমি ভাবতাম, তুমি বুঝি সরল অনভিজ্ঞ লোক; তা ত' নয়! বদমতলবী লোক মতলব ঠিক করে ফেললে তার মুখের চেহারা কেমন হয় তা জানো দেখছি।

মমতা হাসিয়া বলিল, নিজের চোখেই দেখেছি যে অনেকবার।

—কোথায়?

—বাড়ীতেই। বড়দা মেজদাকে জব্দ করার ফিকিরেই থাকে; ফিকিরটা খাটাবার আগে সে ঐরকম অল্প অল্প হাসে। বাবা মা কতদিন তার চালাকি ধরে ফেলেছেন তার ঠিক নাই। আমরা কতদিন তা-ই নিয়ে হাসাহাসি করেছি।

—তা'ই বলো, ঘরোয়া নির্দ্দোষ ব্যাপার! কিন্তু আমি ত' বিণ্টুকে—

—তা ত' নয়ই। আমাকে নয় ত'?

—উঁহুঁ। আমি হাসছিলাম কেন জানো?

—কেন?

নন্দ মিথ্যা কথা খুব বলে, বলিল, সাপ স্বপন দেখেছি।

—অজগর না হেলে?

—কিংবদন্তী তা কিছু বলে না, সাপ হ'লেই হল।

—বাজে কথা যাক্। ওরা তোমার খোঁজ করবে না?

—না করাই সম্ভব।

—মণীন্দ্রবাবু করতে পারেন।

— কেন ?

—যে কারণে তিনি তোমাকে বাহাল করেছিলেন ; বেশি বেশি পাশ করা বড় বড় লোককে তিনি চান নাই। কেন বলো ত' ?

—আমার সঙ্গে আমার স্ত্রীর কথা নিয়ে উল্লাস করার সুবিধে ভেবে হয়তো ; কিম্বা—

বাধা দিয়া মমতা বলিয়া বসিল, খুব হালকাভাবে, যাহাকে বলা হইতেছে, সে কিছু মনে না করিতে পারে এমনি নির্লিপ্তভাবে হাসিতে হাসিতেই বলিল,—তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে তুমি উল্লাস করতে যাওনি ত' ?

পরস্ত্রী তাহাকে কামনা করিয়াছে, স্বীয় স্ত্রীর কাছে সজ্জন নন্দকিশোর তাহা বলিতে পারিল না ; নিজে সে দোষী নয়, সুতরাং কেবল বলিল. যাঃ।

—আর কি বলতে যাচ্ছিলে বলো।

– কিম্বা অপেক্ষাকৃত অনুপযুক্ত লোককে কাজে লাগালে কাজ হ রাবার ভ.য় সে খুব মন দিয়ে পড়াবে এই জন্যেও হ'তে পারে। বেশি পাশ করা লোকের আরো বড় বড় জায়গায় ডাক হ'তে পারে, কিন্তু আমার মতো লোকের সে সুযোগ নাই, যা পেয়ে গেলাম তা-ই যথেষ্ট মনে করে এক জায়গায় টিকে থাকার ইচ্ছাই আমার পক্ষে স্বাভাবিক। ভগবান জানেন কি তাঁর উদ্দেশ্য !

নীলাম্বরির ব্যাপারটা এই সূত্রে নন্দর মনে পড়িল ; তখনও ভালো লাগে নাই, এখনও কৌতুকাবহ মনে হইয়াও সে হাসিতে পারিল না, ঘটনাটা শিক্ষাপ্রদও বটে ; যেন তাহাকে চির-রহস্যের তীরে আনিয়া একটা কুহক-সুন্দর আবেদনের দিকে তাহার চোখ ফুটাইয়া দিয়াছে।

নন্দকিশোর উঠিবার উপক্রম করিয়া বলিল, কিন্তু বড় লোকের পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিতে আর যাচ্ছিনে। বলিয়া চায়ের পেয়ালা প্রায় উপুড় করিয়া শেষ-চুমুকটা দিয়া সে বাহির হইয়া আসিল ; এবং তার বেজায় মনে পড়িতে লাগিল স্বপ্নের সেই বিশিষ্ট অংশটা যাহাতে সে সিংহাসনাসীনা রমণীর পায়ে ঘন ঘন পুষ্পাঞ্জলি দিতেছে।

চমকপ্রদভাবে হঠাৎ তাঁর আবির্ভাব হইয়াছিল, মুহূর্ত্তের জন্য সে চোখ তুলিয়াছিল ; তাঁহার মুখচ্ছবি অনিন্দ্যসুন্দর মনে হইয়াছিল। কিন্তু মস্তিষ্ক এমনি চতুর, বিশ্বাসঘাতক, আর ধারণাক্ষম যে, মুহূর্ত্তের সেই ঝলকটিকে একটা গুপ্ত কোটরে সে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, নিদ্রার সুযোগ আবদ্ধ ছবিকে মুক্ত করিয়া দিয়াছে, অর্থাৎ স্বপ্নে তাহাকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছে। মস্তিষ্কের বজ্জাতির দরুণই স্বপ্নে তাঁহাকে সে পুনরায় দেখিয়াছে। তিনি অত্যন্ত মহিমময়ী বলিয়াই তাঁহাকে না হয় সিংহাসনে বসানো হইয়াছে, পাড়ের রং যেমনই হোক; বসন একখানা থাকি.বই ; কিন্তু পায়ে ফুল দিবার তাৎপর্য্য'টা কি ? তা আবার একটা দুটো না. অঢেল। ঐ ফুল দেওয়াতেই পরস্ত্রীর রূপের সম্মুখে পরাভব আর নতি স্বীকার করা হইয়াছে, এবং মনের জঘন্যতা উদ্ঘাটিত হইয়াছে। স্বপ্নের এ স্থানটা একেবারেই অমূলক। সে সন্ত্রস্ত হইয়া পলায়ন করিয়াছিল। আর একবার দেখিবার বাসনা, কি ভোগের কামনা, ঘুণাক্ষরেও তার সম্বিতে অঙ্কুরিত হয় নাই ত'।

ভয়ঙ্কর বিস্মিত হইবার পর নন্দকিশোর মাকে ডাকিয়া বলিল,—মা, আমি একটু বেরুলাম।

—বিণ্টুকে পড়াবিনে? তোর কাছে পড়বে বলে বই নিয়ে বসে আছে।

—আসি এখন একটু ঘুরে, সারাদিনই পড়াবো।

জামা জুতা পরিয়া বাহির হইবার সময় নন্দকিশোরের মুখে হাসি ছিল; ছ্যাৎ করিয়া তার হুঁশ হইল, সে হাসিতেছে, ব্যস্ত হইয়া সে এদিক ওদিক তাকাইল; তখন তার হাসি দেখিয়া মমতা মন্তব্যসহ, আর, কেমন করিয়া একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি লইয়া, কারণ জানিতে চাহিয়াছিল; এখন আবার তার হাসি দেখিলে পাগল মনে করিবে।

কিন্তু মমতা তখন হেঁসেলে ব্যস্ত।

২

একটু ঘুরিতে বাহির হইয়া নন্দকিশোর অনেক ঘুরিয়া অনেক বিলম্বে বাড়ী ফিরিল। এতটা সময় সে আর কিছু চিন্তা করে নাই, কেবল চিন্তা করিয়াছে এবং অনুভব করিয়াছে মণীন্দ্রবাবুর বাড়ীতে তার নিজের আচরণ; নিজের আচরণ এবং তার হেতু বিশ্লেষণ করিয়া সে আবিষ্কার করিল যে, সেখানে সে ভয় পাইয়াছিল, এত ভয় যে তার ইয়ত্তা নাই। মণীন্দ্রবাবু তার অন্নদাতা প্রতিপালক বলিয়া নয়, তিনি শক্তিশালী লোক বলিয়া, এবং বাড়ীর ভিতর তাহার প্রতি যথেচ্ছ আচরণ করিবার ক্ষমতা তাঁর আছে বলিয়া, তার দুর্ব্বল চিত্তে সহজাত যে ত্রাস প্রচ্ছন্ন ছিল, একটুখানি অপরাধবোধের সূত্রেই তাহা অসাধারণ উৎকট আকার লাভ করিয়া প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার ঘাম ছুটাইয়া ছাড়িয়াছিল; তার পবিত্রতা কালিমালিপ্ত হইতেছে বলিয়া সে আদৌ ক্ষুব্ধ হয় নাই, এমন কি, তা হওয়া না হওয়ার কথা তার মনেই পড়ে নাই। মণীন্দ্রবাবুর কথাবার্ত্তা কেমন যেন রহস্যময়, আর, অহেতুক বলিয়া প্রলাপ মনে হইত, কেমন একটা অন্ধকারের ভিতর হইতে, তার অগোচর স্থান হইতে, তিনি যেন উঁকি মারিতেন; উহাতেই, ব্যাপারটা দুর্ব্বোধ্য বলিয়াই তার ভয় করিত। তার স্ত্রীর প্রসঙ্গে তাঁকে কিছু অতিরিক্তই আগ্রহান্বিত দেখা যাইত; কিন্তু সেটা তেমন ভয়ের কারণ হইয়া ওঠে নাই, যথার্থ ভয়ের কারণ ছিল মণীন্দ্রবাবুর স্ত্রীর উগ্রতা, আধুনিক ভাব-ভঙ্গীর তীব্র প্রকাশ, মাত্রাধিক্য। মমতার মৃদুতার আর কোমলতার এবং তাহারই ভিতর তার অশেষ প্রণয়বিহ্বলতার তুলনা নাই; সে কেবল মৃদু আর কোমলই নয়, সে যেন তাহারই জীবন্ত ছায়া, জীবনের পক্ষে এত অনুকূল এমন সুস্থ আন্তরিক আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়া সে নিজে থাকে এবং তাহাকে রাখে যে, তাহাকে পরম আপন মনে করিয়া আরামের অন্ত থাকে না; কিন্তু মণীন্দ্রবাবুর স্ত্রী যেন অজ্ঞাত লোকাভিমুখিনী ক্ষিপ্র একটি জ্যোতির স্রোত, তাহাকে স্পর্শ করাই বিপদ, তাহাতে অবগাহনের কথা ত' চিন্তা করাই যায় না।

কিন্তু স্বপ্নে দেখা মুখখানা অতিশয় বিষণ্ণ, তাহার প্রত্যাখ্যান তাঁর পক্ষে মর্ম্মান্তিক হইয়াছে বুঝি! স্বপ্নে কত তত্ত্ব, কত সত্য, কত তথ্য জানা যায়, ইহা ত' সবাই বলে। তাঁর অন্তরের এই ব্যথাটুকু এই করুণ নিগূঢ় তথ্যটি, সত্য বলিয়াই জাগ্রত মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাহাকে দেখা দিয়াছে, মানুষের মনের

সর্ব্বজ্ঞতা স্বপ্নযোগে কাজ করিয়াছে। তারপর বিষণ্ণ মুখে নিস্তব্ধ হইয়া পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণও খুবই আশাপ্রদ এবং উৎসাহজনক নম্রতা, ভাবিতে ভালই লাগে: এমন কি, মনে মনে তাঁর নিকটবর্ত্তী হইতেই যেন ইচ্ছা হয়।

তারপর নন্দকিশোরের মনে পড়িল, একটি চঞ্চল উদ্‌ভ্রান্ত মুহূর্ত্তের জন্য উর্ধমুখ হইয়া সে সেই অপরিমেয় রূপরাশির দিকে নেত্রপাত করিয়াছিল, ভাবিতেই নন্দকিশোরের মনে দাহজনক অনুতাপ এবং তাহারই পাশে অস্থিরকর তৃষ্ণার সঞ্চার হইল। বহুক্ষণ তাকাইয়া থাকিলেও তিনি কিছু মনে করিতেন না, তিনি দেখা দিতেই আসিয়াছিলেন; সে নির্ব্বোধ এবং দুর্ব্বলচিত্ত বলিয়াই ভয়ে দিশাহারা হইয়া গিয়াছিল। এক মুহূর্ত্তে যাহা সে দেখিয়াছিল তাহা অনন্তকাল-স্থায়ী অপূর্ব্ব উপভোগ্য সঞ্চয় বলিয়া এখন সে মনে করিতে পারিল না।

স্বপ্নের মূর্ত্তির সঙ্গে সে মূর্ত্তির মিল নাই; দ্বিতীয় মূর্ত্তি রক্তহীন দেহের মতো, তার নিজস্ব চাহিদা নাই, কিন্তু সেই মূর্ত্তির তা ছিল, পুরুষের চিরাভিলষিত দান লইয়া তিনি সম্মুখ অবতরণ করিয়াছিলেন।

কিন্তু বড় স্থূলভাবে, আর, অত্যন্ত অকস্মাৎ, এবং স্থূল আর আকস্মিক বলিয়া যেন নিঃশ্বাসরোধকর একটা আঘাত হানিয়া মৃদুতা আর মন্থর কোমলতার সঙ্গে সে আত্মসমর্পণ আসে, তাহাই হয় অনিবার্য্য, শিবের জটায় গঙ্গাবতরণের মতো দুর্জ্জয় বেগ সংবরণ তার অসাধ্য বলিয়াই তার ত্রাস উপস্থিত হইয়াছিল; কিন্তু পরম সুখের বিষয় ইহাই যে, স্বপ্নে তিনি দেখা দিয়াছেন কমনীয় কোমল স্তিমিত মূর্ত্তিতে। সম্ভবতঃ তাঁর ঐ মূর্ত্তিটাই স্বাভাবিক মূর্ত্তি, ক্ষিপ্র অধীরতা কেবল লোক দেখানো বহিরঙ্গ, চমক লাগাইবার আর শ্রেষ্ঠত্ব ও আভিজাত্য প্রতিপাদনের উপায় মাত্র। তিনি যার একান্ত আপন এবং যার বশবর্ত্তিনী তার কাছে নিশ্চয়ই তিনি অবনত, তার কাছে ক্ষুদ্রতর আর শিথিল হইয়া এবং নিঃশেষ বিলীন হইয়া তার সঙ্গে মিশিয়া থাকাই চরম সার্থকতা ইহা তিনি নিশ্চয়ই হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম এবং অনুভব করিয়া থাকেন।

এখানে একটি স্বস্তির নিঃশ্বাস মোচন করিয়া দিয়া নন্দকিশোর ভারি হাল্‌কা বোধ করিতে লাগিল।

বিন্টু তখন তার হেপাজতের অধীনে বসিয়া পড়িতেছে, স্বার্থপর মানে যে অন্যের ইষ্টানিষ্ট না ভাবিয়া কেবল নিজের ইষ্ট খোঁজে।

নন্দকিশোর জানিতে চাহিল, স্বার্থপরের ইংরেজী কি?

—সেল্‌ফিস্‌।

তারপর বিন্টু মুখস্থ করিতে লাগিল লোক মানে মনুষ্য।

বিন্টুর পড়া চলিতে লাগিল, এবং নন্দকিশোরের মনের চারি প্রান্তেই একটা অপরূপ আলোকে দীপ্ত করিয়া জাগিয়া রহিল একটি অলৌকিক রূপবৈভবসম্পন্না নারীর করুণমূর্ত্তি, এবং তাঁর যে মূর্ত্তি বিষণ্ণ নয়, প্রফুল্ল সেই মূর্ত্তি হৃদয়ে প্রতি-বিম্বিত করিয়া লইয়া আসিবার অপরিমেয় লালসা, একেবারে স্থির সংকল্প হইয়া আর অপরাজেয় নিরঙ্কুশ মন লইয়া তাঁহাকে উত্তমরূপে, নিষ্পলক চক্ষু মেলিয়া, নিরবকাশ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতে হইবে, সেই রূপের ছবি দিয়া প্রাণ মণ্ডিত এবং বক্ষকুহর পূর্ণ করিতে হইবে।

দ্বিতীয় রাত্রে নন্দকিশোর স্বপ্নে কাহাকেও বা কিছুই দেখিল না; কিন্তু মনে মনে পূর্ব্ববৎ ভারি সজাগ থাকিয়া দিনের দুটা পর্যন্ত শুইয়া বসিয়া কাটাইল, রূপসন্দর্শনের আকাঙ্ক্ষার একটা স্রোত নিরন্তর বহিতেই লাগিল।

মণীন্দ্রবাবুকে যদি অসন্তুষ্ট দেখা যায় তবে তাঁহাকে অনুরোধে বশীভূত, কৃপাপ্রার্থনায় দ্রব, স্তবে তুষ্ট এবং পরমেশ্বরের অজস্র অনুগ্রহে তাঁর শ্রীবৃদ্ধি আরো হোক্, তার উপরে আরো হোক্ এবং তার উপরেও আরো হোক, ত্রিগুণিত এই আশীর্ব্বাদ অফুরন্তভাবে করিতে হইবে, কারণ সে ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব এবং মণীন্দ্রবাবু দত্তোপাধিক কায়স্থ সে দীন হীন, তিনি লক্ষ্মীমন্ত।

অসময়ে হঠাৎ যেন সে মনঃস্থির করিয়া ফেলিয়াছে এমনি ব্যস্তভাবে নন্দকিশোর বেলা দুটার সময় মাকে ডাকিয়া বলিল, মা, তিনটের গাড়ীতেই আমি সেখানে একবার যাবো।

মা বলিলেন, যাও জিনিসগুলো আর মাইনেটা নিয়ে এস। মাইনে চাওয়ার মুখ রেখেছ ত'?

নন্দকিশোর হাসিয়া বলিল, তা আছে মা। আমি তেমন কিছু দুর্ব্ব্যবহার তাঁদের সঙ্গে করিনি।

—না করলেই ভালো। লোকে গরীব মনে করুক, অল্প বিদ্যের মানুষ মনে করুক, কিছু যায় আসে না; কিন্তু যেন অভদ্দর মনে না করে।

নন্দকিশোর হঠাৎ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন করিল, কথা কহিল না।

ভদ্র বলিয়াই সে ভীরু, এবং ভদ্র আর ভীরু বলিয়া যে-বস্তু সে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে তাহার তুলনা নাই, তার তুল্য বন্ধন, অত্যাজ্য সম্পদ সংসারে আর নাই। স্বেচ্ছায় নিবেদিত সে বস্তু ত্যাগ করিতে পুরুষ কদাচ পারে নাই, অভদ্র প্রতিপন্ন হইবার, বিধাতা বিমুখ হইবার, রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটিবার, সমাজ হইতে বিতাড়িত হইবার, এবং কল্পনাতীত আরো অনেক প্রতিফল পাইবার ভয়েও পুরুষ নিরস্ত হয় নাই, রূপৈশ্বর্য্য হস্তগত করিতে সে সর্ব্বস্ব বিসর্জন দিয়াছে, প্রাণপণ করিয়াছে, সর্ব্বনাশের ভয় কেউ করে নাই; রাজায় রাজায় যুদ্ধ হইয়াছে, মুনিগণ জপ তপে আর দেবতারা ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়াছেন, ভদ্রভাব মোটেই দেখান নাই।

মানুষের মন আকাশের চাইতেও উদার, ততোধিক প্রশস্ত কত লোককে সমাদর করিয়া সেখানে স্থান দান করা যাইতে পারে এবং যথাযোগ্য আসন দিয়া আনন্দ উপভোগ করা যাইতে পারে তাহার ইয়ত্তাই নাই। কত লোককে ধারণ করিয়া মন নিয়ত আপনাকে সার্থক করিতেছে, সার্থক করিতে চাহিতেছে, এবং আরও তৃষ্ণাপহারক কত সত্তার সন্ধান করিতেছে তাহা ভাবিলে অবাক হইয়া থাকিতে হয়। প্রতি দিনের হঠাৎ-ভাল-লাগার চঞ্চল গতায়াত আনন্দ হইতে শুরু করিয়া চিরদিনের প্রিয় বস্তু, আর ধ্যানের বস্তু, আর সুখের বস্তু, আর আশার বস্তু, প্রভৃতি অসংখ্য বস্তু একই সঙ্গে মনের ক্ষেত্রে আপন আপন স্থানে বিহার করিতে পারে না কি? নন্দকিশোর মীমাংসা করিল যে তা পারে, সুন্দরভাবেই পারে।

ষ্টেশন নিকটেই, গাড়ীরও সময় আছে —

নন্দকিশোর চিন্তামগ্নভাবে উঠানে পায়চারি করিতে করিতে তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিতে লাগিল, মমতা মায়ের সাহায্যে এবং উপদেশে দিশা পাইয়া কি একটা সেলাইয়ের কাজ চালাইতেছে।

মমতার কাছে অবিশ্বাসী হইতে অবশ্যই সে চাহে না; মমতার কাছে সে অবিচ্ছিন্নভাবে ঋণী; কারণ, মমতা ভারি স্নিগ্ধ, সুখদায়িনী আর প্রিয়বাদিনী আর ভারি অকপট। তার স্থান হৃদয়ে অটুটই রহিল এবং রহিবে; মমতা চন্দ্র, তার গৌরব তার নিজস্ব, তার মর্য্যাদা স্বতন্ত্রভাবে রক্ষিত আছে, তবে, একটি সুপ্রভাতে অরুণোদয়কে বরণ করিতে বাধা কি, নিষেধ কোথায়!

কিন্তু মমতা একটু ম্লান এই হিসাবে যে সে কখনো হৃদয় উন্মুক্ত করিয়া দিয়া কলকণ্ঠে আহ্বান করে নাই, স্বামীর প্রতি তার যা অবিস্মরণীয় কর্ত্তব্য তাহাই সে মনঃপ্রাণ নিবিষ্ট করিয়া নিষ্ঠার সহিত কায়মনোবাক্যে দিবারাত্রি পালন করিতেছে; সে অধর্ম্মাচরণ করে না, কিন্তু আকাঙ্ক্ষার উদ্দাম বেগ আর প্রাপ্তির পরমোল্লাস সে সৃষ্টি করে নাই, হিংসালু চৌর্য্যপ্রবৃত্তি, যা নিয়ত সম্বিতে ক্রিয়াপরায়ণ রহিয়াছে বলিয়াই অভিনব কত চিন্তার উদ্ভব, নব নব কত আনন্দের বিকাশ হইতেছে, আর কত শত কর্ম্মের প্রেরণা জাগিতেছে, তাহাকে সে ঠেলিয়া জাগাইয়া দেয় নাই, যে জাগাইয়া দিয়াছে, জ্যোতিকিরীটিনী সেই রূপময়ীকে প্রাণ ভরিয়া একবার দেখিতেই হইবে।

যাত্রাকালে নন্দকিশোর জিজ্ঞাসা করিল, মা, যদি থাকতে বলে?

মা তার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, বলিল, থাকতে যদি বলে তবে থেকো। ঐ কাজ যখন একটা দরকার, তখন ওটা ছেড়ে দেওয়া উচিত কি না তা তুমিই বুঝে যা হয় করো। আর একজনকে ঠিক করেছে বলেছিলি না?

নন্দকিশোর বলিল, যদি সে না এসে থাকে। এমনও ত' হয়। কথা দিয়ে এল না। যাই। বলিয়াই রওনা হইয়া গেল। মাকে প্রণাম করিল না, কুণ্ঠাবশতঃ করিতে পারিল না। যে উদ্দেশ্য লইয়া এবার সে যাত্রা করিতেছে তাহাতে সিদ্ধির জন্য প্রণামান্তে মায়ের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করা মাকেই এমন অসম্মান করা যে সে অপরাধের ক্ষমা নাই।

বিষ্টু হঠাৎ চেঁচাইয়া উঠিল, দাদা, আমি ইষ্টিশনে যাবো তোমার সঙ্গে?

মা বলিলেন, কাজে বেরুচ্ছে, অমনি পিছু ডাকলি!—তারপর নন্দর কুশল কামনা করিয়া তাহারই উদ্দেশ্যে বলিলেন, ষাট্, ষাট্।

ওদিকে সাড়ে তিন আনা পয়সা দিয়া একখানা টিকিট কিনিয়া নন্দকিশোর গাড়ীতে উঠিল, এবং উঠিয়াই শুনিল, যুগ্মকণ্ঠে চমৎকার সঙ্গীত চলিতেছে। অন্ধ ভিখিরী একটি বালকের সঙ্গে গলা মিলাইয়া গান করিতেছে, গানের মর্ম্ম ইহাই যে, অন্ধকে দান করিলে ভগবান তার, দাতার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। অন্ধ হাত পাতিয়া যাত্রিগণের সম্মুখীন হইতে হইতে তাহার সম্মুখে আসিতেই নন্দকিশোর একটি পয়সা তাহার হাতে দিল; ভিখারী আশীর্ব্বাদ করিল, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক বাবা। এই মামুলি আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া তার দান সার্থক হইল; বোধ হয় সে কিছুক্ষণ খুশী হইয়াই থাকিত, কিন্তু তৎক্ষণাৎ মনে পড়িয়া গেল

একটা অকৃত কার্য্যের কথা, আসিবার সময় মমতাকে কিছু বলিয়া আসা হয় নাই, তাহার কাছে বিদায় লইয়া আসা হয় নাই, ভুল হইয়া গেছে, মন যতই উদার প্রশস্ত হোক, আর ধারণক্ষম হোক, সেখানে একই সঙ্গে দু'টি বস্তুর অবস্থান ঘটিলে একটিকে প্রাধান্য দিতেই হয়, একটিকে আবৃত করিয়া অপরটি প্রোজ্জ্বল উন্নত হইয়া ওঠেই। মনে মনে অপরাধ স্বীকার করিয়া নন্দকিশোর ভারি অনুতপ্ত হইল, বেচারী মমতা মনে করিতেছে কি। মাকে লুকাইয়া চোখে চোখে চাহিয়া বেশ বিদায় লওয়া যাইত, তা' লওয়া হয় নাই ; হয়তো তার চোখে জলই আসিয়াছে। একই সঙ্গে দু'টি কিংবা বহু সত্তাকে চিন্তা আর অনুভব করা যায়, কিন্তু ব্যবহারের বেলায় মনোনিয়োগে তারতম্য দেখা দেয়ই। তার উপর নন্দকিশোরের মনে পড়িল, মমতা ঠাট্টার ছলে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "পরস্ত্রী লইয়া উল্লাস করিতে যাও নাই ত'? অর্থাৎ সেই অপরাধের দরুণ তাড়াইয়া দেয় নাই ত'? তার সেখানে হইতে রওনা হইয়া বাড়ীতে আসিয়া উঠার রকমটা সত্যই যেন কেমন। ক্রুদ্ধ হইয়া লম্ফঝম্ফ করা কি বেখাপ কিছু করিয়া ফেলা তার স্বভাবই নয়, সবাই তা জানে ; কাহারো উপর চোখ রাঙ্গাইয়া কট্‌মট্‌ করিয়া তাকাইতেই মমতা তাহাকে দেখে নাই। এই প্রকৃতির লোকটি চাকরি বুঝি যায় এই আশংকা কি সন্দেহের বশে ধনী মনিবের সঙ্গে চটাচটি করিয়া বাক্স বিছানা আর বেতন ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছে, ইহা বিশ্বাস করা কঠিনই। কুকর্ম্মের দরুণ তাড়া খাওয়ার পর বিপদের ভয়ে জ্ঞানশূন্য হইয়া পলায়নের মতোই তার চলিয়া আসার রকম। লক্ষণ দেখিয়া যা বুঝা যায় সেইরকমই বুঝিয়া মাও জেরা করিয়াছিলেন, কিছুই অবিচার করেন নাই। স্বামীর স্বাস্থ্য উন্নতি সুখ সুবিধা সম্বন্ধে স্ত্রীর যেমন উদ্বেগ আর তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সীমা নাই, তেমনি একটি বিষয়ে সন্দেহও প্রচুর, সেটা হইতেছে চরিত্র। চরিত্রের দিকে দৃষ্টি রাখিবার এবং সতর্ক করিবার সময় মেয়েদের বুদ্ধিও খুব খোলে, কথাও খুব ফোটে। সে যাহাই হউক, মমতার কাছে বিদায় না লইয়া আসা ভারি অনুচিত কাজ হইয়াছে, তাহাকে অগ্রাহ্য করা হইয়াছে, ব্যথা দেওয়া হইয়াছে।

চিন্তাগুলি অস্বস্তিকর।

অন্যমনস্ক হইবার অভিপ্রায়ে নন্দকিশোর এদিক ওদিক তাকাইতে লাগিল, দৃশ্য বা ঘটনা হিসাবে চিত্তাকর্ষক কিছু চোখে পড়িলেই সেই দিকে সে মনোনিবেশ করিবে ; কিন্তু তেমন কিছু চোখে পড়িবার আগেই তার চোখে পড়িল তারই এক বন্ধু, নিজেকে এক গণনা করিয়া চতুর্থ ব্যক্তিই তার বন্ধু, দুই পায়ের ফাঁকের ভিতর ছাতাটা দিয়া বেশ স্বচ্ছন্দভাবে বসিয়া আছে।

বন্ধুর সঙ্গে দৃষ্টির মিলন হইল, নন্দকিশোর বলিল, চলেছ ?

—হুঁ। তুমিও চলেছ দেখছি।

—হুঁ।

—বিদ্যাদান করছ ত' ?

—করছি।

—নিজের কিছু বাড়ছে ?

—হ্যাঁ, দু'টাকা।

—না, না, তা বলছিনে, রিদ্যে।

—নন্দকিশোর হাসিয়া দৃষ্টি টানিয়া লইল।

তারপর সে হিসাব করিয়া দেখিল যে, তার একুশ দিনের বেতন সাত টাকা মাত্র। ঐ সাত টাকা মণীন্দ্রবাবুর কাছে মুখ ফুটিয়া চাওয়া যাইবে কিনা সন্দেহ, কারণ, সে না বলিয়া না কহিয়া চোরের মতো আচমকা গা-ঢাকা দেওয়ায় সে ভদ্রতার এবং কর্ম্মত্যাগের রীতি লঙ্ঘন করিয়াছে। স্তবে তুষ্ট এবং অনুরোধে বশীভূত করিবার পূর্ব্বেই হয়তো তিনি উদরান্নের জন্য তাহাকে এবং তত্তুল্য গৃহশিক্ষক সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়া এমন নিদারুণ কটূক্তি বর্ষণ করিবেন যে, অপমানের চূড়ান্ত হইয়া যাইবে। শুধু অপমানিত হইবার ভয়ে মণীন্দ্রবাবুর গৃহে পূর্ব্বেই সে এত কাণ্ড করিলেও এবং অকথ্য দুঃখ পাইলেও বেতন সম্পর্কে কটূক্তির আর মানহানির ভয়টাকে সে তেমন তেজালো হইতে দিল না, কারণ, টাকা আর অন্তঃপুরিকায় স্বর্গ মর্ত্ত্য প্রভেদ ঠিক ততটা তফাৎ যতটা তফাৎ ভ্রূভঙ্গী আর ফাঁসিতে; প্রথমটির সম্বন্ধে নিয়ম অমান্য করিবার পর ত্রুটি বা অজ্ঞানতা স্বীকার করিয়া শাস্তি লঘু করিয়া আনা যাইতে পারে, ক্ষমা চাহিবার পথ থাকে; কিন্তু অপরটি সম্বন্ধে গণ্ডি অতিক্রম করিয়া অবোধ সাজা চলে না, কৈফিয়ৎ সাজানও চলে না।

সুতরাং টাকা চাহিলে মণীন্দ্র কিরূপ বাক্য প্রয়োগ করিবেন সে উৎকণ্ঠা দমন করিয়া গাড়ীর ঝাঁকানি আর আওয়াজের মধ্যেই নন্দকিশোর ধ্যানস্থ হইল, ধ্যানযোগে সে দর্শন করিল বিষণ্ণ অতুলনীয় একখানি মুখ, দুখানি পা আর সেই শুভ্র সুকুমার পদপল্লবদ্বয়ে অগণিত পুষ্পের স্তূপ পুনঃ পুনঃ অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া সে-ই ঢালিয়া দিয়াছে।

নন্দকিশোরের আনন্দ আজ উদ্বেল হইল।

তারপর সে দেখিল, ধ্যানযোগেই দেখিল, তিনি প্রতীক্ষা করিতেছেন, চঞ্চলতা আর কাঠিন্য পরিত্যাগ করিয়া তিনি নিষ্কম্প শিখার মতো স্নিগ্ধোজ্জ্বল মূর্ত্তিতে পথ চাহিয়া আছেন। তাঁর এই মূর্ত্তিখানিই সে একবার অকম্পিত চক্ষে এবং অকুণ্ঠ চিত্তে অবলোকন করিবে, তৃপ্ত হইবে; তারপর সে বাক্স বিছানা বেতন লইয়া চলিয়া আসিবে, কিংবা থাকিবে, যেরূপ অবস্থা দাঁড়ায় তদনুসারে কাজ করিবে, মায়ের অনুজ্ঞাও তা-ই।

রূপই যদি না দেখিলাম তবে এতবড়ো চোখ দুটা আর প্রচুর দৃষ্টিশক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি কেন? কেবল পুস্তকের অক্ষর দেখিবার আর হোঁচট এড়াইবার জন্য? মনে হইতেই নন্দকিশোর একটু হাসিল এবং বিধাতাও বোধ হয় হাসিলেন।

৪

নানান তরঙ্গে মাথায় নাচিতে নাচিতে থামিয়া ট্রেণ-জারনিটা কাটাইয়া গাড়ী হইতে অবতরণ করিবার পর মনীন্দ্রবাবুর বাড়ীর উদ্দেশে চলিতে চলিতে নন্দকিশোরের পা থামিয়া আসিতে লাগিল। আপন গৃহের অভ্যন্তরে এবং খোলা জায়গায় নন্দকিশোরের যে চিন্তা, ইচ্ছা আর কল্পনা উল্লসিত হইয়া

যথেচ্ছভাবে বিচরণ করিতেছিল, মণীন্দ্রবাবুর বাড়ীর সমগ্র ছবিটা আর আবহাওয়া মনে পড়িতেই তার মনের সেই স্বেচ্ছাচারিতা যেন একটি বলয়ের বেষ্টনের ভিতর আবদ্ধ হইয়া গেল আর সে বলয় যেন ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া আসিতে লাগিল, এক কথায়, নন্দকিশোরের প্রাণে ভয় দেখা দিল। যত অল্প সময়ের জন্যই হউক, সে পরস্ত্রীর রূপদর্শন করিতে চলিয়াছে; কিন্তু তাহাতে তার অধিকারই বা কি, তার সুযোগই বা কোথায়! এমনও ত' হইতে পারে, যাঁহাকে দেখিতে সে চলিয়াছে তিনি হয়তো মনের অত্যন্ত বিকল অবস্থায় দু'চারটা বেহিসাবী বেফাঁস কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন; তজ্জন্য এখন তিনি অসহ্য অনুতাপে দগ্ধ হইতেছেন, তাহাই সম্ভব, এবং তাহার দরুণ অধিকতর প্রখরা হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁর প্রখরতাই তাকে ত্রাসে অন্ধ করিয়া দিয়াছিল। স্বপ্নে দেখা মূর্ত্তি শান্ত কোমল সন্দেহ নাই; কিন্তু স্বপ্ন স্বপ্নই; নিশ্চিত আর প্রলুব্ধ হইবার পক্ষে স্বপ্নাদেশ ছাড়া আর কি আছে? আগে এ-বিষয়ে নন্দ কি প্রণালীতে চিন্তা করিয়াছিল তাহা তার একবিন্দুও মনে পড়িল না।

তবু, এই কষ্টকর অবস্থাতেই নন্দকিশোর ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল, এবং মণীন্দ্রবাবুর দরজার অদূরে পৌঁছিতেই তার সাক্ষাৎ হইয়া গেল রাখালের সঙ্গে। রাখাল দরজাতেই দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাকে দেখিয়াই লাফাইয়া রাস্তায় নামিল, এবং দৌড়াইয়া আসিয়া তার হাত ধরিল।

রাখালের এই আচরণটা মধুর লাগিয়া নন্দকিশোর হাসিমুখে দাঁড়াইয়া গেল।

রাখাল বলিল, আসুন মাষ্টার মশায়; কোথায় গিয়েছিলেন? বাবা আপনাকে খুঁজেছেন খুব। আমাদের ইস্কুলের একটা ছেলে বললে, মর্গ-এ দেখো গিয়ে, পাবে। মর্গ কি মাষ্টার মশায়?

নন্দকিশোর তার হাত ধরিয়া চলিতে চলিতে বলিল, যেখানে বেওয়ারিশ মড়া রাখা হয় তাকেই বলে মর্গ।

রাখাল খুব রাগিয়া গেল; বলিল, দেখুন অন্যায়, আপনার মতো মানুষকে বলে মরেছে!

—তা বলুক। তোমার বাবা বাড়ীতে আছেন?

—আছেন, ওপরে আছেন। আপনি এসেছেন শুনলে এখুনি নামবেন।

এতক্ষণ পরে নন্দকিশোরের মনে হইল, হঠাৎ চলিয়া যাইবার একটা সমীচীন কারণ ত' ভাবিয়া রাখা হয় নাই। ভারি অন্যায় হইয়া গেছে।

রাখাল তাহাকে ঘরে তুলিল, চেয়ারে বসাইল, এবং উপরে খবর দিতে দৌড়াইয়া গেল; আর, অশান্তি দুরন্ত হইয়া উপস্থিত হইল নন্দকিশোরের প্রাণে, কিরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হইবে, এবং তাহার কর্ত্তব্য আর বক্তব্য তখন কি দাঁড়াইবে। নন্দকিশোরের ধ্যানজগৎ ঘোলা হইয়া গিয়াছিল খানিক পূর্ব্বেই, এখন সম্পূর্ণ অন্ধকার হইয়া গেল।

মণীন্দ্রবাবু নন্দকিশোরকে বেশিক্ষণ অমনি বসাইয়া রাখিলেন না, খবর পাইয়াই দেখিতে আসিলেন, বা দেখা করিতে আসিলেন, এবং আসিলেন হাসিতে হাসিতে, গুম্ফযুগল বিস্তৃত করিয়া।

তিনি দরজায় আসিতেই নন্দকিশোর সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল, নমস্কারও

করিল, কিন্তু মণীন্দ্র তার নমস্কার লক্ষ্যও করিলেন না ; তাঁর সে অবকাশই যেন নাই ; বলিলেন, আরে, ছিলে কোথায় ? আমি তোমাকে খ‍ঁুজেছি ঢের, অবশ্য চীৎকার করে নয়। চম্পট দিয়েছিলে যে ? বলিয়া তিনি যাইয়া চেয়ারে বসিলেন, নন্দকিশোর বসিল তার তক্তাপোষে।

বসিয়া মণীন্দ্র পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, অমন করে একবস্ত্রে চম্পট দিয়েছিলে যে ? জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি নন্দকিশোরকে যেন পরীক্ষা করিতেছেন এমনি নিবিষ্ট চক্ষে তার মুখের দিকে তাকাইয়া অল্প অল্প হাসিতে লাগিলেন।

নন্দকিশোর বলিল, বাড়ীর জন্যে মনটা বড় উতলা হয়েছিল।

মণীন্দ্রবাবুর গোঁফ জোড়াটা হাসিতে ভরিয়া উঠিল ; বলিলেন, তা হওয়া সম্ভব, কারণ, বাড়ী মানে স্ত্রী। কিন্তু বলে যেতেও ত' পারতে !

নন্দকিশোর চুপ করিয়া রহিল।

মণীন্দ্র বলিলেন, তুমি যথেষ্ট সুশীল, অমায়িক, আর, ভদ্র তা জানি ; কিন্তু দেখছি মিথ্যে কথা বলতে তোমার বাধে না। সত্যি কি না ?

শুনিয়া নন্দকিশোর ক্ষণিকের জন্যে দৃষ্টি অবনত করিল, এবং অনুভব করিল, তার মুখমণ্ডলের স্বাভাবিক বর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া ঈষৎ লাল হইয়াছে।

মণীন্দ্রের গোঁফ আরো খানিক উত্তোলিত হইল, বলিলেন, এই ত' ধরা পড়লে বাপু ! চোখ নামালে আর লাল হয়ে উঠেছ ! সত্যবাদী লোক কখনো চোখ নামায় না। বলিয়া মাথা নাড়িলেন, যেন বুদ্ধির পাল্লায় তাঁরই জিত হইতেছে, ও পক্ষের মনের কথা তিনি ধরিয়া ফেলিয়াছেন ; তারপর বলিলেন, বলোই না কারণটা কি ?

নন্দকিশোর ভারি কাতর হইয়া বলিল, আমাকে মাপ করুন।

—মাপ আমি করেছি। তোমাকে সম্ভাষণের স্বর শুনেও তুমি বুঝতে পারলে না, মাপ আমি করেই বসে আছি। কারণটা আমি জানি।

এমন অতর্কিতে আর এমন অনায়াসে এতো বড়ো সাংঘাতিক কথা বলিতে কেবল মণীন্দ্রই পারেন ; চক্ষের পলকে মুখ আর তালু শুকাইয়া নন্দকিশোর আপাদমস্তকে ভারি নির্জীব হইয়া উঠিল। কারণটা উনি জানিবেন কি করিয়া ? কি অনুমান করিয়া বসিয়া আছেন ! স্ত্রীর মুখে তিনি বিপরীত কিছু শোনেন নাই ত'। দণ্ড দিয়া তাহাকে ধূলিসাৎ করিয়া শেষ করিবার পূর্ব্বে তাহাকে খানিক খেলাইয়া মজা দেখিতেছেন না ত' ?

কিন্তু তা নয়, মণীন্দ্রনাথের উৎফুল্লতা স্বভাবতঃই অপরাজেয়।

তিনি উৎফুল্ল থাকিয়াই বলিলেন, শুকিয়ে আদ্দেক হ'য়ে উঠলে যে, মাষ্টার ! আমার স্ত্রীর উৎপাত। নয় ?

মণীন্দ্রের এ প্রশ্ন এমনি যে তাহাকে অতিক্রম করা মানুষের সাধ্যাতীত, মানুষকে অস্থির সে করিবেই, কথা সে বলাইবেই, কথা যেমনই হউক, যাহাই হউক।

নন্দও অস্থিরভাবেই মুখ তুলিয়া তাকাইল, জবাব দিতে নয়, প্রশ্নকর্ত্তাকে উপলব্ধি করিতে। উৎপাতের অর্থ কি তাহা কাহারো না বুঝিবার নয়। সেই রকম উৎপাত করিয়া একটি পরপুরুষকে স্ত্রী গৃহ হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য করিয়াছে, সেই প্রসঙ্গে এমন উৎফুল্লতা কেমন করিয়া মানুষের আসিতে পারে ;

কিন্তু স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, মণীন্দ্রের তা অপর্য্যাপ্ত মাত্রায় আসিয়াছে। ইঁহার ধৈর্য্যের তারিফ করিতে হয়, না ইঁহার বীভৎস অসাড়তার দরুণ ইঁহাকে অবজ্ঞা করিতে হয়।

শক্ত হইয়া বসিয়া থাকা ছাড়া নন্দকিশোরকে আর কিছুই করিতে হইল না, হাঁ, না, কোনো জবাবই দিতে হইল না; নিজের প্রশ্নের আরো যা ব্যাখ্যা আছে তা উদ্ঘাটন করিলেন মণীন্দ্রই।

বলিলেন, তুমি দাঁতে দাঁত চেপে আছ বেশ; থাকো। তুমি হয়তো ভাবছো, আমার সন্দেহবাই আছে, তা-ই টোকা মেরে একটু পরীক্ষ করছি; কিংবা সবই আমার মিথ্যে কথা আর আমি খুব নির্লজ্জ। তবে শোনো এক মজার কথা; প্রথমেই জানাই যে, উনি আমার স্ত্রী নন।

প্রথমেই এই খবরটা জানাইয়া, অর্থাৎ একটা ধাক্কা দিয়া, নন্দকিশোরের চোখের আঁতকানোটা তিনি সস্মিত মুখেই উপভোগ করিলেন; তারপর বলিলেন, তোমার কাছে এ-সব কথা বলছি কেন জানো?

নন্দকিশোর মাথা নাড়িল, তাহাকে গুহ্য কথা কহিবার কারণ সে জানে না।

মণীন্দ্র তা জানাইলেন।

বলিলেন, আমার বয়স চল্লিশ, তোমার বয়স তেইশ, আর, তুমি পালিয়েছ বলে। আমি কিন্তু ধরে নিলাম, আমার স্ত্রীর উৎপাতেই পালিয়েছিলে। কাজেই তুমি আমার পরম বিশ্বাসভাজন, তোমার শুভ আমি একান্তভাবেই চাই। তারপর শোনো, উনি আমার স্ত্রী নন। তবে কে? নিশ্চয়ই তা জানতে তোমার কৌতূহল হয়েছে। উনি আমার খুড়তুতো ভগিনী।

বাক্য আর ভঙ্গীর সংযম প্রভুর সম্মুখেই শূন্যে উড়াইয়া দিয়া নন্দকিশোর বলিয়া উঠিল, "বলেন কি"? নন্দ যেন লাফাইয়া উঠিল।

কিন্তু মণীন্দ্রের স্নায়ু সাপের গায়ের চাইতেও ঠাণ্ডা; তিনি হাসিয়া পরিহাসের সুরে বলিলেন, আরে, আরে থামো। তুমি যে সেই কোবরেজের বড়ির মতো করলে। তার বড়ি নাকি শিশির ভিতর খালি লাফাত। লাফিও না অত, খুড়তুতো ভগিনী শুনেই তুমি লাফিয়ে উঠলে যে। স্বামী-স্ত্রীর মতো বাস ত' না-ও করতে পারি।

নন্দকিশোর লজ্জা পাইল।

মণীন্দ্র বলিলেন, যত পার লজ্জা পাও, কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর মতোই আমরা বাস করি। খুড়তুতো ভগিনী বটে বললাম তা-ই, কিন্তু কেমন খুড়ো কেমন খুড়ী তা ত' কিছুই জানো না।

নন্দকিশোর হাঁ করিয়া তাকাইয়া রহিল।

মণীন্দ্র বলিতে লাগিলেন, খুড়ো আমার বাবার সহোদর ভাই খুড়ো নন, বাবার মামাতো ভাই, সে মামা আবার মায়ের সহোদর নন, মায়ের মামাতো ভাই।

এত ঘুরিয়া সম্পর্কটা কিরূপ দাঁড়াইল তা নন্দকিশোরের মাথায় ঢুকিল না, সে পূর্ব্ববৎ কেবল মণীন্দ্রের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

মণীন্দ্র বলিলেন, এমন খুড়ী। খুড়ীর কেচ্ছা শোনো। আমার ঐ খুড়োর ছিল একটি বুঝলে?

খুব অল্প সময়ের জন্য মাথাটা অতি সামান্য একটু কাত করিয়া নন্দকিশোর বুঝিতে দিল যে, ব্যাপারটা সে বুঝিয়াছে। খুড়ো গিয়ে তাকে অধিকার করার আগেই তার একটি মেয়ে হয়েছিল, সেই মেয়েই ইনি। বলিয়া মণীন্দ্র নিজের অন্তঃপুরির উদ্দেশে চোখের ইঙ্গিত করিলেন ; বলিলেন, তারপর, আমি সম্পর্কে সেই খুড়ীর বাড়ীতে যেতাম ; এবং তারপর সেই মেয়েটি বড় হ'লে, আর আমার স্ত্রীবিয়োগ হ'লে, যাক্, অত খুঁটিনাটিতে কাজ নেই। আশ্চর্য্য সুন্দরী ; আমি লোভ সংবরণ করতে পারিনি, তুমি পেরেছ। ধন্যি ছেলে বটে তুমি! তোমার এখন যৌবনের পুরো জোয়ার, আর, রূপ আছে, আমি প্রৌঢ়। তোমাকে তিনি আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন, সত্যি কি না?

নন্দকিশোর মাথা নত করিয়া বসিয়া রহিল নৈতিক লজ্জায় নহে, অপ্রয়োজনীয় উত্তরটা মুখে উচ্চারিত হইল না বলিয়া।

মণীন্দ্র উঠিতে উঠিতে বলিলেন, এখানে থাকবে, না, নিয়ে থুয়ে বাড়ী যাবে?

নন্দকিশোর থাকিবে বলিয়াই আসিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গেই সে সাগ্রহে সম্মত হইল ; বলিল, থাকবো।

উপস্থিত সঙ্কট কাটিয়া যাওয়ায় একদিকে নিরুদ্বিগ্ন এবং উনি এঁর বিবাহিতা স্ত্রী নয় শুনিয়া অন্যদিকে কোথায় যেন একটু ক্ষুণ্ণ হইবার হেতু পাইয়া নন্দকিশোরের নাক দিয়া একটা টানা নিঃশ্বাস নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।

মণীন্দ্র উৎসাহিত হইয়া বলিলেন, এই ত' বাহাদুর ছেলের কথা! থাকো। আসছে মাস থেকে তোমার মাইনে হ'ল পনরো। তারপর জানিতে চাহিলেন, তোমার ছেলেপিলে হয়নি বুঝি?

—আজ্ঞে না।

—তুমিই থাকো বাইরে বাইরে। বলিয়া, যেন সম্পূর্ণ ধাতস্থ হইয়া মণীন্দ্র হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া গেলেন ; পরক্ষণেই ফিরিয়া আসিলেন, বলিলেন, যে-সব কথা তোমায় বললাম তা যেন বাইরে না যায়।

নন্দকিশোর দাঁতে জিব কাটিল—

মণীন্দ্র আবার 'উপরে' গেলেন।

৫

নন্দ তক্তাপোষে বসিয়া রহিল, বিরহের পর কাঠের এই তক্তাপোষখানাকে তার খুব আপন আর দৃঢ় একটা আশ্রয় বলিয়া মনে হইল, দুই হাত তাহার উপর শক্ত করিয়া চাপিয়া দিয়া সে সুখবোধ করিল, সুখবোধ করিতে করিতে তার আনন্দ জন্মিল ; সংযমের পুরস্কার হিসাবে তার পাঁচ টাকা বেতন বৃদ্ধি হইয়াছে। নন্দকিশোর মনে মনে হাসিল।—মণীন্দ্রের মুখের দিকে তাকাইয়া তাঁর মুখে তাঁর পারিবারিক খণ্ডকাব্য শুনিতে শুনিতে স্বেদ রোমাঞ্চ আতঙ্ক বিস্ময় প্রভৃতি বিপর্য্যয় উপর্য্যুপরি দেখা দিলেও, এখন তাঁর কথাগুলি আবোল-তাবোল মনে হইয়া নন্দকিশোর একটু ঠোঁট বাঁকাইল, সেই খণ্ডকাব্যর ভিতর সেও আছে ; মণীন্দ্রের বর্ণনার মধ্যে সে প্রকাশ্যেই আছে, এবং অধুনা নিশ্চিন্তেই আছে, এবং সম্ভবতঃ শীঘ্রই খুব গুপ্তভাবে প্রচুর প্রাধান্যই লাভ করিবে।

নন্দকিশোর মনে মনে আরো খানিকটা হাসিল, মণীন্দ্রেরই কথার আলোড়নে তার অভীপ্সা আরও ফেনিল হইয়াছে, ঘূণাক্ষরেও তিনি তা অনুমান করিতে পারেন নাই, পারিবেন কেমন করিয়া? পরচিত্ত চিরদিনই অন্ধকারময়।—মণীন্দ্রের যে চঞ্চল ভঙ্গী, অশোভন বাক্যালাপ, স্ত্রীলোক সম্পর্কে প্রগল্ভতা, ইত্যাদি অর্থাৎ যে ছ্যাবলামি নন্দকিশোরের অশ্রাব্য তিক্ত মনে হইত, তাহাই যেন এখন তাহাকে আসান দিল; তিনি রাশভারি লোক হইলে তার মন মাথা তুলিতেই পারিত না, মণীন্দ্র সলিতা ঠেলিয়া দিয়া দীপ উজ্জ্বলতর করিতেছেন, রস নিবিড় করিয়া তুলিতেছেন। ফিরিবার কারণ তিনি জানিতে চাহেন নাই; বোধ হয় তিনি ধরিয়া লইয়াছেন টাকার ব্যাপারটাই। ফ্রী আহার ও বাসস্থান সহ মাসে মাসে বসিয়া দশটা টাকা উপার্জনের মায়া ত্যাগ করিয়া ধ্যুৎ বলা আর চলিয়া যাওয়া দরিদ্রের পক্ষে সম্ভব নহে; হয়তো ওঁকেও তিনি সাবধান করিয়া দিয়াছেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই নন্দ এই তৃতীয়বার মনে মনে হাসিল।

মনে মনে হাসা খুবই সহজ, চতুরেও হাসে, বোকারাও হাসে; লোকে বুঝিয়াও হাসে, না বুঝিয়াও হাসে: এবং কখনো কখনো সেই হাসি ঘা খাইয়া চাপা পড়িতেও বিলম্ব হয় না।

নন্দকিশোরের মনের হাসিটাকে আঘাত করিবার জন্যই বোধ হয়, পরদিন, বেলা ন'টা সাড়ে ন'টার সময় হঠাৎ একটা আবরণের আবির্ভাব হইল; বলরাম দাঁত মেলিয়া তার ঘরের ভিতর একবার উঁকি মারিল, তারপর ঘরের চৌকাঠে দুটি পেরেক মারিয়া পুরু একখানা পর্দ্দা টাঙাইয়া দিয়া গেল। নন্দকিশোর বিস্মিত হইয়া নিষ্পলক চক্ষে তাকাইয়া তাকাইয়া বলরামের কাজটা দেখিল, এবং অত্যন্ত আগ্রহ হইলেও জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না, কার হুকুমে তার চোখের সামনে দৃষ্টিনিরোধক এই পর্দ্দা বিলম্বিত হইল। অযথা পরের কথায় থাকা তার পছন্দসই নয়। কিন্তু কাপড়ের পর্দ্দা এমন কিছু অন্তরায় নয় যার অপসারণ ইচ্ছুক মানুষের পক্ষেও অসম্ভব, কিংবা দরকার হইলেও যা ঠেলিয়া ঠেলিয়া ভিতরের মানুষ বাহিরে আসিতে কি বাহিরের মানুষ ভিতরে যাইতে পারে না, তথাপি ঐ পর্দ্দা একটি কঠিন নিষেধ, আর এক্ষেত্রে যেন কারো অপরাধের নির্ম্মম সাজা। নন্দকিশোরের মনে মনে হাসাটা চাপা পড়িল।

নন্দকিশোর যথাসময়ে স্নান করিল; পরিপাটি করিয়া চুল আঁচড়াইল; একটা গেঞ্জিও গায়ে দিল।

বলরাম আসিয়া ডাকিল, খেতে আসুন, বাবু।

রান্নাঘরেই সে খাইত, রান্নাঘরের দিকেই সে অগ্রসর হইতেছিল, বলরাম বলিল, এদিকে আসুন বাবু, ওপরে ঠাঁই হয়েছে। বলিয়া খানিক গা দুলাইল, যেন নন্দকিশোরকে উপরে লইতে আসিয়া সে কৃতার্থ হইয়াছে।

বলরামের অনুসরণ করিয়া সে উপরে উঠিল, দেখিল, প্রশস্ত বারান্দার এক স্থানে তার আহারের ঠাঁই হইয়াছে, আয়োজন রাজকীয়; সুবৃহৎ গালিচার আসন পাতা রহিয়াছে, আসনের গায়ে ফুলের অক্ষরে লেখা রহিয়াছে, "পেট ভরিয়া

খান, লজ্জা করিবেন না।" তা ছাড়া, যে-থালায় ভাত দেওয়া হইয়াছে তাহাও প্রকাণ্ড এবং ব্যঞ্জনাদি দেওয়া হইয়াছে বাটিতে বাটিতে।

সমারোহ আর সমাদর দেখিয়া নন্দকিশোর খুশী হইতে পারিল না, যেন একটু বিদ্রূপমুখী।

সে যাহাই হউক, নন্দকিশোর আরো দেখিল, একটি প্রৌঢ়া পরিচারিকা সেখানে উপস্থিত, অদূরে দাঁড়াইয়া আছে, সেমিজের উপর ধপ্‌ধপে থান কাপড় পরা, দিব্যি গিন্নিবান্নীর মতো সুস্থির চেহারা। এটিকে আগে সে দেখে নাই; অনুমান করিল, বোধ হয় কাল কি পরশু নিযুক্তা হইয়াছে।

নন্দকিশোর আসনের সম্মুখে সহসা থম্‌কিয়া দাঁড়াইল, ঝিয়ের দিকে তাকাইল, যেন, জানিতে চায়, এ-আয়োজন কি তাহারই জন্য?

ঝি বলিল, বসুন। তারপর যেন আপন মনেই বলিয়া উঠিল, মা ঠাকরুণ ঐ পর্দ্দার ওদিকেই আছেন।—অর্থাৎ তিনিও তার আহারের তদ্বির করিতে অন্তরালে হাজির আছেন। কেবল ঝিয়ের উপর ভার দিয়া তিনি নিশ্চিত নন।

নন্দকিশোর ভারি অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল, একটা ষড়যন্ত্রের আভাস যেন পাওয়া যাইতেছে।

কিন্তু তা নয়।

সে আসনে বসিয়া ভাতে হাত দিতেই ঝি বলিল, আপনি রান্নাঘরে খেতেন, বাবু বলছেন, আপনাকে রান্নাঘরে যেন বসানো না হয়, আপনি সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে।

ঝিয়ের মুখে শুদ্ধ ভাষা শুনিয়া নন্দকিশোর বিস্মিত হইল; বলিল, কিন্তু রান্নাঘরই আমার পক্ষে কাছে হয়।

ঝি মুখ টিপিয়া হাসিল; বলিল, দূরে খেতে আপনার আপত্তিটা কি?

নন্দকিশোর চট্‌পট্ উত্তর দিল, পরিশ্রম বেশি, অনর্থক কতকগুলো সিঁড়ি ভাঙতে হয়।

কর্ত্তা ও কর্ত্রীর সঙ্গে অবাধে কথা বলিতে তার যে সংকোচ আছে, ঝিয়ের সঙ্গে কথা বলিতে তা তার নাই। তার উপর তার আহার আর আপ্যায়নের জন্য এই সুসজ্জিত আয়োজন তার ভালো লাগে নাই।

ঝি বলিয়াছিল, কর্ত্রী পর্দ্দার ওদিকেই আছেন। কথাটা সত্য। নিঃশব্দে খাইতে খাইতে সে হঠাৎ তাঁহারই কণ্ঠঝঙ্কার শুনিয়া চমকিয়া উঠিল; শুনিল কর্ত্রী বলিতেছেন, আপনি দু'দিন অনুপস্থিত থাকায় ছেলের পড়ার ক্ষতি হয়েছে। আর বিনা অনুমতিতে কাজে অনুপস্থিত থাকলে মাইনে কাটা যায়, তা কি জানেন না?

নন্দকিশোর আবারও মনে মনে হাসিল, কথা কহিল না। বেতনকর্ত্তন সম্বন্ধে সে নির্ভয়; তার উপর তার মনে হইল, এমনি করিয়া ভৎর্সনার সুরে কথা বলা এ-গৃহের গৃহিণীর রঙ্গ-প্রিয়তারই অন্তর্গত, কিংবা রূপগৌরবের একটা ভঙ্গী; এবং গা সির্‌সির্ করিয়া তার আরো মনে হইল, তার ফিরিয়া আসা সার্থক হইয়াছে; উনি রূঢ়স্বরে কথা কহিতেছেন, আর, ভারি তারল্যের সহিত মৃদু মৃদু হাসিতেছেন।

গৃহিণীর কণ্ঠস্বর আবারও শুনা গেল ; তিনি বলিলেন, কথা না বললে, লোকে গোবেচারা মনে করতে পারে ; তাতে মাইনে কাটা বন্ধ থাকে না। কিন্তু আবার এলেন যে বড়ো ?

রক্ত তোলপাড় করিয়া একটি উত্তর নন্দকিশোরের জিহ্বাগ্রে নাচিয়া উঠিল, "তোমাকে দেখতে—"

কিন্তু নন্দকিশোর পূর্ব্ববৎ নিঃশব্দই রহিল।

গৃহিণী বলিতে লাগিলেন, শেষ কথা বলছি : শুনে রাখুন আমার হুকুম। নির্ব্বোধের মতো অমন করে আর কখনো পালাবেন না। পালিয়ে গিয়ে ফিরে আসায় কি মনে হচ্ছে জানেন ?—যে কারণে আপনি পালিয়েছিলেন, দিন দুই বাড়ীতে থেকে ভেবে চিন্তে দেখে তাতে রাজি হয়েছেন। গৃহশিক্ষকের অত আপন খেয়ালে চলা ঠিক নয়।

তিনি চুপ করিতেই নন্দকিশোরের হুঁশ হইল যে, এত কথার উত্তরে একটি কথাও না বলা বোধ হয় ন্যাকামি হইতেছে ; সুতরাং সে রা কাড়িল . বলিল, যে আজ্ঞে।

তারপর আর কোনো কথা কেহই কহিল না, নন্দকিশোর মাঝখানে হরেরামের জিজ্ঞাসার উত্তরে কেবল মাথা নাড়িয়া জানাইল, ভাত এবং ব্যঞ্জনাদি কোনোটিই সে আর চায় না। আহার শেষ করিয়া সে নামিয়া গেল, কিন্তু দর্পণে একটি প্রতিবিম্ব যেদিন সে দেখিয়াছিল সেদিনকার মতো অজ্ঞানাবস্থায় শূন্যপথে হুড়মুড় করিয়া নয়. অত্যন্ত ধীরপদে, সজ্ঞানে, কঠিন পদার্থের উপর পা ফেলিয়া আর, আনন্দের উত্তাল তরঙ্গবেগ প্রশমিত করিতে করিতে।

হরেরামের রাঁধা ভাত নন্দকিশোরের আজ ভারি ভালো লাগিয়াছে, আজ সে প্রকৃতই তৃপ্ত।—একটি উদ্গার তুলিয়া নন্দকিশোর তার চেয়ারে বসিল। বলরাম পান দিয়া গেল ; পান চিবাইতে চিবাইতে নন্দকিশোর ভাবিতে লাগিল, উনি যে বলিলেন ; "পালিয়ে গিয়ে ফিরে আসায় কি মনে হচ্ছে জানেন ? যে কারণে আপনি পালিয়েছিলেন, দিন দুই বাড়ীতে থেকে ভেবে চিন্তে দেখে তাতে রাজি হয়েছেন।" ইহাতে কি বুঝায় ?—প্রশ্নটি উত্থাপন করিয়া নন্দকিশোর অত্যন্ত পুলকিতচিত্তে নিজেরই সঙ্গে ছলনা শুরু করিয়া দিল. প্রশ্নের উত্তরটিকে এড়াইয়া এড়াইয়া মনের কাছে তাহাকে পৌঁছিতেই দিল না, ইহাতে যা বুঝায় তা বুঝিয়া ফেলিলেই যেন অপূর্ব্ব রোমাঞ্চকর একটা স্বাদ নষ্ট হইয়া যাইবে।

তারপর নন্দকিশোর তাঁর মুখশ্রী মনে করিতে যাইয়া মনে করিতে পারি [illegible] প্রাণপণে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়াও পারিল না, একটা কুজ্ঝটিকার অভ্যন্তরে যেন তার সমগ্রতা ঢাকা পড়িয়া গেছে, কেবল একটা প্রস্ফুটিত অপরূপত্বের অনুভূতি আছে, সংবিৎ সেই দিকে চুম্বক-শলাকার মতো স্থির হইয়া থাকিতে পারে, আবেগে থর থর করিয়া কাঁপেও কিন্তু ধারণ করিবার বস্তুর সন্ধান পায় না, অন্যগতি মন তাহাতে সরসও হয়, জ্বালাও সহে।

অতিশয় চঞ্চল কয়েকটি মুহূর্ত্ত ঝলকিত করিয়া চক্ষু বিদ্যুৎবিদ্ধ করিয়া,

আর জীবনস্থানে জ্বলন্ত রেখা একটি টানিয়া দিয়া, রূপরাশি অন্তর্হিত হইয়াছিল, যেমন বিস্ময়ের অন্ত পাওয়া যায় নাই, তেমনি তাহাকে ছুঁইতে পারাও যায় নাই। তখন নন্দকিশোরের অবজ্ঞার সঙ্গে ক্ষোভ জন্মিয়াছিল মমতার তুলনায় তাঁহাকে অস্বাভাবিক আর ভয়ানক মনে হইয়া—এখন তার যন্ত্রণার সঙ্গে ক্ষোভ জন্মিল—অঙ্গুলির ভিতর ফুলের মতো মানসপুটে তাঁহাকে ধরিতে না পাইয়া।

আহারে বসাইয়া যখন এত কথা কহিলেন, আর এতই যখন আকর্ষণ, তখন পর্দাটা একটুখানি দক্ষিণে বামে সরাইয়া ধরিলেও ত' পারিতেন।—দেখিতাম। নন্দকিশোর মুখখানা ভার করিয়া রহিল।

তন্দ্রাকর্ষণ হওয়ায় নন্দকিশোর চেয়ার ত্যাগ করিয়া তার তক্তাপোষে গেল; তিনটা বালিশ পর পর সাজাইয়া লইয়া তার উপর মাথা রাখিয়া শুইল, তারপর ঘুমাইয়া পড়িল।

ঘুম ভাঙ্গিবার পর যখন আলস্য দেহে আছেই তখন নন্দকিশোর সবিস্ময়ে দেখিল বলরাম ঢুঁ মারিয়া পর্দা সরাইয়া ঘরের ভিতর মাথা ঢুকাইয়া দিয়াছে, পরক্ষণেই তার সমগ্র দেহ প্রবেশ করিল, তার এক হাতে চায়ের পেয়ালা, অন্য হাতে খাবারের ডিস্। ঐ সব লইয়া বলরাম তাহারই কাছে গেল।

নন্দকিশোর জানিতে চাহিল, এ-সব কি?

দাঁত মেলিয়া বলরাম বলিল, মা পাঠিয়ে দিলেন; বাবু বলেছেন দিতে। বলিয়া নন্দকিশোরের সম্মুখে তার জলযোগ নামাইয়া দিল।

চা ত' আমি খাইনে। নন্দকিশোর আপত্তি করিল।

—আমি ত' বলেছিলাম; বলেছিলাম যে মাষ্টার মশায় চা খান না। তাতে মা আমার ওপর বিষম খাপ্পা হয়ে উঠলেন; বললেন, তুই নিয়ে যা, খাবেন; খেতে তাঁকে হবে, আমার হুকুম। তাঁর হুকুমে নিয়ে এলাম, তাঁর হুকুমেই খেতে হবে, খান।

—রাখো, খাই। বলিয়া নন্দকিশোর হুকুমজারির চোট্ দেখিয়া সামান্য একটু হাসিল, জিজ্ঞাসা করিল, বাবু কোথায়?

বলরাম বলিল, ন'টায় খেয়ে বেরিয়ে গেছেন, টাঁকশালে সভা করতে গেছেন।

—টাঁকশালে?

—না, না, টাঁকশালে নয়; ব্যা, ব্যা ব্যা।

নন্দকিশোর শেষ করিয়া দিল: ব্যাঙ্কে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, সেখানেই বটে!

—একটু জল চাই যে!

—আনি।

বলরাম জল দিয়া চলিয়া গেল, নন্দকিশোর চোখে মুখে জল দিয়া খাবার খাইল; তার পর তাঁর হুকুমে চা খাইতে বসিল।

প্রথম যে দিন সে 'আমার হুকুম' শুনিয়া "তটস্থ" হইয়াছিল সেদিন যা মনে হয় নাই আজ চা খাইতে খাইতে সেইটাই তার মনে হইতে লাগিল।

মণীন্দ্র তাহাকে যে খণ্ডকাব্য শুনাইয়াছেন তাহা সত্য নিশ্চয়ই; সে হিসাবে

তাহাকে খর্ব্ব করিবার অধিকার ও'র যেন নাই। তারপর তার মনে হইল, হয়তো ঐ কথাটা বলা তাঁর মুদ্রাদোষ; সেবকগণকে হুকুমের উপর রাখিয়া হুকুম জাহির করা মজ্জাগত অভ্যাস দাঁড়াইয়া গেছে; পাত্রাপাত্র হিসাব বড় করেন না; অসম্মান করার উদ্দেশ্যও বোধ হয় থাকে না; তবে, শ্রুতিকটু বাক্য উচ্চারণ না করাই ভালো।

তারপরই, চা-পান শেষ হইবার বহু পূর্ব্বেই নন্দকিশোরের ভুল আপনিই ভাঙ্গিল, মানুষকে হুকুম করার দর্প যদি দুনিয়ার কাউকে সাজে তবে একমাত্র তাঁকেই, রূপের পশ্চাতে পৃথিবী ছুটিয়াছে, রূপের ইঙ্গিতে ত্রিলোক চালিত হইতেছে, তিনি যে রূপরাজেন্দ্রাণী! সিংহাসনে বসাইয়া পায়ে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের কথাটা ভুলিলে চলিবে কেন!

নন্দকিশোর পরম পরিতুষ্ট হইয়া চায়ের কাপ নামাইয়া রাখিল।

বলরাম পান লইয়া আসিল।

তারপর আসিল রাখাল।

রাখালকে সঙ্গে লইয়া নন্দকিশোর বেড়াইতে বাহির হইয়া গেল।

অন্যায় কার্য্য কত প্রকার এবং মূর্খ কত প্রকার, বেড়াইতে বেড়াইতে নন্দকিশোর ছাত্রকে তা বুঝাইয়া দিল। পরের গাছের ফুলটি, পরের দিকে লোষ্ট্র নিক্ষেপ ইত্যাদি তেমনি অন্যায় কার্য্য যেমন অন্যান্য কার্য্য হইতেছে পরীক্ষার সময় অন্যের লেখা নকল করা। মূর্খের সম্বন্ধে বলিল যে, মূর্খ একশত প্রকারের ত' আছেই, সূক্ষ্মভাবে পর্য্যালোচনা করিলে সম্ভবতঃ তার বেশিই পাওয়া যাইবে।

রাখাল বিস্মিত হইয়া বলিল, এত?

—হ্যাঁ, এতই।

—বলুন না, মাষ্টার মশাই, কি কি রকম।

—অত বলতে পারবো না, দুটো একটা বলি।

মাসিকপত্রে পড়া বৃত্তান্ত সামান্যই নন্দকিশোরের মনে ছিল; বলিল, ভেবো না যে মূর্খ যাকে বলা হয় সে সব বিষয়েই মূর্খ, একেবারে অকেজো গর্দ্দভ, তা কিন্তু নয়। বললেই বুঝবে, যথা: নীরসে গুণবিক্রয়ী; দুঃখে দর্শিত দৈন্যার্ত্তিঃ; স্বাস্থ্যে বৈদ্য ক্রিয়ান্বেষী; লোভেন স্বজনত্যাগী; রোগী পথ্যপরাঙ্মুখঃ; আর শুনবে?

—শুনব।

—বুঝলে কিছু?

রাখাল অনুনয় করিয়া বলিল, বুঝিয়ে দিন, মাষ্টার মশায়।

—দেব ক্রমশঃ। স্বল্পে ভোজ্যোতিইতিরসিকঃ; শ্লাঘায়ৈ স্বল্পভোজনঃ; মর্ম্মভেদী প্রিয়োক্তিভিঃ; বাচা মিত্রবিরাগকৃৎ; রাজ্যার্থী গণকস্যোক্তেঃ; নৃপানুকারী মানেন; মন্যুমান্ ভোজনক্ষণে; লাভকালে কলহকৃৎ; লোকোক্তৌ ক্লিষ্টসংবৃতঃ; পুত্রাধীনে ধনে দীনঃ।

অনেক চেষ্টায় মনে করিয়া করিয়া নন্দকিশোর মূর্খ কাহাকে বলে তাহারই ঐ নির্ঘণ্ট দিল; তারপর পুনরায় মনে করিয়া করিয়া বেকুবির ধাত আর ভাবগতিক বাংলা ভাষায় বুঝাইয়া দিতে লাগল।

এবং তাহাতে সন্ধ্যা লাগিয়া আসিল, ফিরিবার সময় হইল।

৬

সন্ধ্যার পরই বেড়াইয়া ফিরিয়া রাখাল গেল 'উপরে', মুখ'দের চিনিয়া ফেলিয়া সে ভারি আনন্দ পাইয়াছে।

এবং সেই মুখ'-তত্ত্বেরই খানিক রস লইয়া নন্দকিশোর তার ঘরের চৌকাঠ পার হইল, আর তখনই মুখ'-তত্ত্বের আমোদ তাকে ভুলিতে হইল; নন্দকিশোর চৌকাঠের কাছেই থমকিয়া রহিল, এ কি তাজ্জব। এ কোথায় আসিলাম! এ যে ইন্দ্রপুরী!

ইন্দ্রপুরী বলিলেই অবশ্যই বর্ণনায় অতিশয়োক্তি দোষ বটে; তবে ইহা সত্যই যে, আমূল পরিবর্ত্তিত করিয়া ঘরটিকে চমৎকার সুখপ্রদ আর সুশোভিত করা হইয়াছে, চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া নন্দকিশোর দেখিতে লাগিল, আর-একখানা চেয়ার, নূতন চেয়ার, এবং আর-একখানা টেবিল, নূতন টেবিল আনা হইয়াছে, টেবিলের উপর রাখা আছে 'হ্যারিকেন' নয়, সুবৃহৎ আর অত্যুজ্জ্বল একটা টেবিল ল্যাম্প, তার আলো কি। কাজেই, হীনাবস্থ আর অনভ্যস্ত নন্দকিশোরের মনে হইল, সে যেন ঠিক ইন্দ্রপুরীতেই প্রবেশ করিয়াছে।

অবাক হইয়া নন্দকিশোর দাঁড়াইয়া আছে এমন সময় দেখা দিল বলরাম; একগাল হাসিয়া বলরাম বলিল, দেখছেন কি, বাবু, আপনার ভালো হ'য়ে যাবে!

—তার মানে?

—আপনি বাবুর নেকনজরে পড়ে গেছেন। এ-সব বাবুর হুকুমেই হচ্ছে। একটুখানি এদিক ওদিক হ'লেই বাবু অম্বথ করবেন বলেছেন।

—কাকে বলেছেন?

—আমাকে আর ঠাকুরকে। মাকেও বোধ হয় কিছু বলেছেন; তিনিও খুব শ—শ—শ, কথাটা বলতে পারলাম না, খুবই ব্যস্ত আর কি!

—শশব্যস্ত?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, শশব্যস্ত।

—তাই নাকি?

—তবে বলছি কি। ইস্।

—কি হ'ল?

—ভাগ্যিস্ মনে পড়েছে! বলিয়া বিস্মৃত মারাত্মক বিষয়ের উদ্দেশে বলরাম শশব্যস্তে প্রস্থান করিল।

রাখাল পড়িতে আসিল।

তাহাকে পড়ানো শেষ হইল, সমুজ্জ্বল আলোকাধারের সম্মুখে বসিয়া পাঠনে নন্দর মন বসিল বেশি।

একা একা বসিয়া নন্দকিশোর একটু আনমনা হইয়া রহিল; ভাবিতে লাগিল, "হল ভালো"।

সুদৃশ্য আরামপ্রদ আবাসস্থানটির দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া তার মনে হইতে লাগিল, তাহাকে অন্য কলেবরে রূপান্তরিত, আর, আদ্যন্ত সংশোধিত করিবার

ইচ্ছাই বুঝি মণীন্দ্রবাবুর! বাবু তাহাকে নিরুপদ্রবে রাখিবেন এবং বাবু তাহার ভালো করিবেনই, তিনি বন্ধপরিকর হইয়াছেন, বলরাম বোধ হয় ঠিকই বলিয়াছে।

বলরামেরই উচ্চকণ্ঠ পর্দ্দার বাহিরে শুনা গেল; বলরাম বলিতেছে, "হুঁশিয়ার ঠাকুর"।

তারপরই দেখা গেল, বলরাম পর্দ্দাটা একধারে অনেকটা টানিয়া ধরিয়া আছে, এবং ঠাকুর গা বাঁচাইয়া প্রবেশ করিতেছে, তার একহাতে সোপকরণ একথালা ফুলকো লুচি, আর, অপর হাতে বড় একটা বাটি।

ভোজ্য সম্ভারের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া নন্দকিশোর বড়ই কুণ্ঠিত হইয়া গেল; বলিল, এখানে যে? আর, এ-সব কি!

ঠাকুর টেবিলের উপর থালা আর বাটি অত্যন্ত সাবধানে নামাইয়া দিল, নন্দকিশোরের প্রশ্নের জবাব দিল বলরাম, বলিল, বাবুর হুকুম। বললাম কি তখন! নেকনজরে পড়ে গেছেন।

নন্দকিশোরের মুখখানা গম্ভীর এবং মনটা সেই অনুপাতে ভারি হইয়া উঠিল। এ-সব তার সংযম আর ত্যাগের সম্মান না আর, সম্বর্দ্ধনা, আর, মণীন্দ্রের সুখের স্বীকৃতি; পুরস্কার অকপট এবং অজস্র, কিন্তু সে ত' মনে মনে চরম বিশ্বাসঘাতক আর অকৃতজ্ঞ।

মনের গুপ্ত গুহাশয়ী গভীর কলঙ্কযুক্ত একটা ভাষাবিন্যাস সহসা প্রবল হইয়া তাহারই সম্মুখে যেন উঠিয়া দাঁড়াইল, লজ্জার অবধি রহিল না।

এখন কেবল রূপদর্শন করিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করা তার অভিলাষ নয়; তার আরো অধঃপতন ঘটিয়াছে, সে আরো চায়।

কিন্তু, "দৈন্যে বিস্মৃতভোজনঃ" অর্থাৎ শোক বা তাপ পাইয়া যিনি আহারের কথা বিস্মৃত হন, তাঁহাকে মূর্খ বলিতে পারা যায়।

সুধী নন্দকিশোরের প্রাণে আত্মগ্লানির দহন চলিতে লাগিল, এবং সে লুচি ছিঁড়িয়া মুখে দিতে লাগিল, মন এবং হাত যুগপৎ নিযুক্ত থাকিতে পারিবে না কেন!

তা-ই আছে বলিয়া নন্দকিশোরের গ্লানি মিথ্যা নয়।

মণীন্দ্রের মন অশুচি হইলেও হৃদয় প্রশস্ত, তাঁর মন দিয়া দরকার নাই, তাঁর অভ্যাস দস্তুর ইত্যাদি এবং যা কিছু দোষাবহ বিচ্যুতি তাঁর আছে, সবই অবান্তর, দ্রষ্টব্য যা, তা এই যে, তাঁর নিরহঙ্কার উদার হৃদয় হইতে প্রচুর দান নির্গত হইয়া তাহাকে, বলিতে গেলে, অর্চ্চনাই করিতেছে; এমন কি, চরিত্রগৌরবে তাহাকেই শ্রেষ্ঠতর ব্যক্তি বলিয়া স্বীকার করিয়া তিনি তাহারই সম্মুখে নিজেকে খর্ব্ব করিয়া দেখিয়াছেন। অসাধারণ মহত্ত্ব না থাকিলে ইহা সম্ভব হইত না। কিন্তু সে এমনই পাপাত্মা যে, এমন উৎকৃষ্ট ব্যক্তির অন্নদাতা প্রতিপালকের, একটি সাধের আর সুখের বস্তু অপহরণ করিবার প্রবৃত্তি আর উদ্যম লইয়া বসিয়া আছে।

নারীর রূপ আর দেহ এমনই অপার দুর্লঙ্ঘ্য জিনিষ যে তাহাকে অতিক্রম করিয়া কামনা আর জ্ঞান-অপর কোথাও আনন্দের সন্ধান পাইবে না! মনুষ্যত্বের বিনিময়ে, ধর্ম্মকে নাকচ করিয়া দিয়া, আর, চোখ বুজিয়া সমুদয় অন্তর-সম্পদ ধরণীর ধুলায় নিক্ষেপ করিয়া তাহার সেই নকসাকাটা কাচখণ্ড, পাইতেই হইবে।

এই ধরণে আরো খানিক ধিক্কারমূলক চিন্তা, এবং জাগতিক নশ্বর ঘৃণিত ব্যাপার সমুদয় বিশ্লেষণ অর্থাৎ কুকর্ম্মকে অশ্রদ্ধা আর সৎকর্ম্মকে সাধুবাদ দিয়া, অনুতপ্ত নন্দকিশোর, একটা জগদতীত নিষ্কাম অবস্থায় উপনীত হইল ; দিব্যদৃষ্টি লাভ, বিবেককে ঠাণ্ডা, এবং আহার শেষ করিল।

মানুষের জন্মাবচ্ছিন্ন সত্য মধুময় সুখ আর নিত্য অনাবিল শান্তি দুরভিসন্ধির লালনে নহে, দুশ্চেষ্টায় মত্ত হওয়ায় নহে, দুষ্প্রবৃত্তির পোষণে নহে, ইহার ঠিক উল্টা দিকে, এ কথা যিনি মানুষকে শুনাইয়াছেন তিনি ধন্যবাদার্হ।

ঐ উক্তির মহামতি কর্ত্তাকে ধন্যবাদ দিয়া নন্দকিশোর আরো উপকৃত আর শুদ্ধ হইল, আরো কি হইত বলা যায় না, কিন্তু বলরাম আসিয়া দাঁড়াইল, নন্দকিশোরের আহার শেষ হইয়াছে দেখিয়া তার হাতে পান দিল, জিজ্ঞাসা করিল, পানে চুন খয়ের ঠিক হয় ত', বাবু ?

—হয়।

—না হলে বাবুকে যেন বলবেন না, তৎক্ষণাৎ আমাকে বাবু তাড়িয়ে দেবেন।

নন্দকিশোর জিজ্ঞাসা করিল, বাবু এসেছেন ?

বাবুর তল্লাস লইতে নন্দকিশোরের আজ এখন একটা নূতন রকমে ভাল লাগিল।

বলরাম বলিল, উঁ হুঁ। ফিরতে রাত কতো হবে ঠিক নাই, বারটাও হ'তে পারে, বলে গেছেন, বলিয়া বলরাম থালা বাটি তুলিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

নন্দকিশোর আলো নিবাইয়া শুইয়া পড়িল।

আহারাদির পর বাতি নিবাইয়া শুইয়া পড়িতেই যখন দেখা যায়, নিজস্ব চিন্তার ফলে চিত্ত উত্তেজনাহীন আর বিক্ষোভশূন্য হইয়াছে, শান্তি অগাধ, আর গ্লানিশূন্য অন্তর যে কতো নির্ভীক আর কতো মধুর তাহা উপলব্ধি হইতেছে, তখন প্রবাসী বিবাহিত ব্যক্তি চিন্তা করিতে থাকে, ভবিষ্যৎ নয়, চাকরি নয়, স্বাস্থ্য নয়, অর্থ নয়, কোনো দৃশ্য নয়, পুরাতন প্রসঙ্গ নয়, স্ত্রীকে। তদবস্থ নন্দকিশোর সেই নিয়মের অধীনে আসিয়া চিন্তা করিতে লাগিল মমতাকে, তার সম্বন্ধে একেবারে সার আর শেষ কথাটাই সে চিন্তা করিতে লাগিল ; "অমনটি আর হয় না, সুশীতল আর সুশোভনা।" যেদিক হইতেই বিচার করো, ঐ একই উত্তর "অমনটি আর হয় না, সুশীতল আর সুশোভনা।"

সুশীতল আর সুশোভনা মমতার হৃদয়-মাধুর্য্য তাহাকে বিভোর করিয়া রাখিল বোধ হয় অর্ধ ঘণ্টা।

তারপরই হঠাৎ এক সময় দুরু দুরু বুকে অস্থির আর প্রাণপণে উৎকর্ণ হইয়া সে শয্যার উপর উঠিয়া বসিল, পর্দ্দার দিকে চক্ষু নির্নিমেষ হইয়া রহিল, এবং ইতঃপূর্ব্বেকার নিষ্কণ্টক পরিশুদ্ধ সমুন্নত আর প্রসাদসম্পন্ন চিত্ত কল্লোলিত আর মহাবেগে মথিত হইতে লাগিল।

এমন স্নায়ূৎপাটক বিপ্লব ঘটাইয়াছে, আর কিছু নয়, একটুখানি শব্দ ; নন্দকিশোরের কানে একটা শব্দ আসিয়াছে, সিন্দুক বা কপাট ভাঙ্গার শব্দ নয়, পদশব্দ, কে যেন সিঁড়িতে মৃদু মৃদু শব্দ করিয়া পা ফেলিতেছে, অর্থাৎ অবতরণ করিতেছে।

চট করিয়াই নন্দকিশোরের মনে হইল, তিনি আসিতেছেন, আর কেহ নয়, আর কিছু নয়, তাহারই মনের প্রতিধ্বনি নয়, অর্থাৎ ভ্রম নয়, তিনিই আসিতেছেন, দুর্নিবার হইয়া এ-প্রত্যয় তার তৎক্ষণাৎ জন্মিল। উর্ব্বশী, চির যৌবনা উর্ব্বশী, জগতের মনোমন্দিরবাসিনী চিরবাঞ্ছিতা অনুপমা উর্ব্বশী, অভিসারে নির্গত হইয়া দেবরাজের শয়নমন্দিরে আসিতেছেন, সকল প্রেরণার যা মূল, সকল চৈতন্যের যা ব্যঞ্জনা, সকল প্রাপ্তির যা শ্রেষ্ঠ, সকল বস্তুর যা নির্যাস আর সকল সম্পদের যা শিরোমণি সেই অনন্ত রূপসম্ভার লইয়া তিনি আসিতেছেন, ঐ সতর্ক পদশব্দ তাঁরই, উৎক্ষিপ্ত আত্মা মূর্চ্ছাহত হইয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিবে।

রাখাল তার পর্দার কাছে দাঁড়াইয়া বলিল, স্যার কি ঘুমিয়েছেন ?

নন্দকিশোর শুইয়া পড়িল, সে তখন হাঁপাইতেছে, কণ্ঠস্বর একটু বিলম্বে ফুটিল ; বলিল, না, কেন ? তারপরই জিজ্ঞাসা করিল, চোরের মতো অমন আস্তে আস্তে এলে যে ?

রাখাল আস্তে আসার কারণ যা বলিল তা ন্যায্য ; বলিল, মা বলে দিলেন যে আস্তে আস্তে নামতে। বললেন, মাষ্টার মশায় বিশ্রাম করছেন, দুপ্-দাপ্ করে নামিসনে, শব্দ করলে তিনি বিরক্ত হবেন।

শুনিয়া নন্দকিশোরের জীবনে বীতস্পৃহা ধরিয়া গেল, কি বলতে এসেছ বলো।

রাখাল বলিল, মা বললেন, ঠাকুর আর বলরাম কোথায় যাত্রা শুনতে যাবে, ছুটি নিয়েছে। তারা বেরিয়ে গেলে সদর দরজাটা বন্ধ করে দেবেন। আর, বাবা এসে ডাকলে খুলে দেবেন। কিছু মনে করবেন না যেন।

কিছু মনে না করার ভাণ করিয়া নন্দকিশোর বলিল, না, না, পাগল !

—তারপর দরজার ছিটকিনিটা লাগিয়ে দেবেন। চোরের অসাধ্য কাজ নাই। বলিয়া রাখাল চলিয়া গেল।

নন্দকিশোরের মনে হইল, নাঃ, ভারি কঠিন বস্তু, পাওয়াও কঠিন, ত্যাগ করাও কঠিন। কিন্তু আমি একটা কি ! যেমন নির্ব্বোধ তেমনি নারকী আমি, পাপিষ্ঠ একটা। এত সঙ্কল্প সাধু চিন্তা পদশব্দেই চূর্ণ হইয়া গেল ! অথচ এখন সবে 'সন্ধ্যারাত্রি', কিন্তু আর না।

কিন্তু 'আর না' বলিয়া নিজেকে তিরস্কার আর দু'চারবার পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিলেই অদৃশ্য হইবে এ-দুশমন তেমন অশক্ত ছায়ারূপী নহে, এ আগে পাঠায় দুর্ব্বার ঝঞ্ঝা ; সংসার নিঃশব্দে তোলপাড় করিয়া এ সাড়া দেয়, 'আর না' বলিয়া মুক্তি অন্বেষণ করিলে সঙ্গে সঙ্গেই তা পাওয়া দুষ্কর।

একটা বেদনা অনুভব করিয়া অতিশয় অনিচ্ছাসত্ত্বেও নন্দকিশোর ভাবিতে লাগিল, সে আহত হইয়াছে।

এই আঘাত বিষমুক্ত করিতে পারে মমতা, কাজেই নন্দকিশোর বিশল্যকরণী মমতাকে মনের গভীর আলিঙ্গনের ভিতর টানিয়া আনিল, আর ধরিয়া রাখিল।

বিবাহিত জীবনই শ্রেয়ঃ, যেমন মঙ্গলপ্রদ নিরাপদ, তেমনি ধর্ম্মাচরণের অনুকূল।

মূর্তিমান প্রতিকূল দশার মতো বলরাম আসিয়া জানাইল, বাবু, আমরা চললাম।

নন্দকিশোর উঠিল, তাহারা বাহির হইয়া গেলে সদর দরজা বন্ধ করিয়া দিল, তারপর বাবু আসিলে যাইয়া খুলিয়া দিল।

মণীন্দ্র ক্লান্ত ছিলেন।

নন্দকিশোরের মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিলেন কেবল, কথা কহিলেন না।

বিস্কিট এবং জেলি চায়ের সঙ্গে খাইয়া নন্দকিশোর সকালবেলা রাত্রিব্যাপী উপবাস ভঙ্গ করিল।

রাখাল পড়িতে আসিল।

এবং তারপরই দেখা দিলেন মণীন্দ্রবাবু, বলিলেন, মাষ্টার, ভারি ব্যস্ত হে আমি। যার নাম ল্যাঠা তারই নাম ঠ্যালা। কাল রাত্রে যখন আমি বাড়ী ঢুকলাম তখন চোখ বুজে আছি, এত ক্লান্ত। কমন্ ব্যাঙ্ক লিমিটেড্ বুঝি টেঁসে যায়! আমি আবার তার একজন হর্ত্তাকর্ত্তা লোক, দায়িত্ব নিয়ে বসে আছি। গণেশ যা'তে উল্টে না পড়েন, চেষ্টাচরিত্তির করে তা-ই করতে হ'চ্ছে। আচ্ছা, পড়াও। পড়ছে ত' মন দিয়ে?

—মন দিয়েই পড়ছে।

—অমনোযোগ দেখলেই চাবকাবে, আমার বলা রইলো।

নন্দ সামান্য একটু হাসিল।

—আমি যাই। মাথার ভেতর সর্ব্বদা যেন ব্যাঙ্কটাই ঘুরছে। কাল রাত্রে অযথা পুলিস স্বপ্ন দেখেছি। তোমার অসুবিধে হ'চ্ছে না ত' কিছু?

—আজ্ঞে, না।

—হ'লেই বলবে, একটুও ইতস্ততঃ ক'রবে না। তুমিও এই বাড়ীরই লোক, যেমন আমরা। ঠাকুর চাকর যেমন আমাদের তেমনি তোমারও। আচ্ছা, যাই। শুনলাম, তুমি খাও খুব কম। খুব খাবে, পেটের খোল চুপসে গেলেই মলে'। আচ্ছা, পড়াও। বাড়ীর চিঠি পেয়েছ?

—এখনও সময় হয়নি পাওয়ার।

—ভালই আছে সবাই। আজ কি বার?

—বৃহস্পতিবার।

—শনিবারে বাড়ী যেও।

ব্যস্তভাবে অনেক কথা বলিয়া মণীন্দ্র ব্যস্তভাবেই চলিয়া গেলেন। নন্দ-কিশোরের মনটা বড় ছলছল করিতে লাগিল। বড় ভাল লোক, ভারি সুন্দর, অন্তঃকরণ খুব উচ্চ, সুবিবেচক, স্নেহপরায়ণ। ইহাকে ক্ষুদ্র মনে করা তার ভুল হইয়াছিল। ইহার আশাভঙ্গের কারণ হইয়া যদি ইঁহাকে সে মনঃকষ্ট দেয় তবে তা অমানুষিক হইবে, অমার্জ্জনীয় অপরাধ হইবে, পাপের পরাকাষ্ঠা হইবে।

মণীন্দ্রের কথা সে অনেকক্ষণ ভাবিল। কিন্তু এই বিকারপরবশ নন্দকিশোর নগণ্য প্রাণপুত্তলিটিকে লইয়া বিধাতার পরীক্ষামূলক কৌতুকের, আর, মানুষের কৌতুকমূলক ক্রীড়ার, অর্থাৎ লোফালুফির, যেন অন্তই নাই।

যথাসময়ে নন্দকিশোর স্নান করিল, বলরামের আহ্বানে উপরে গেল; দেখিল, আয়োজন কল্যকার মতোই এবং সেই শুভ্রবসনা স্ত্রীলোকটি, বোধ হয় তার আহারের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হইয়া, অদূরে দাঁড়াইয়া আছে।

নন্দকিশোর আসনে বসিল, কাল সংকোচবোধ হইয়াছিল, আজ তা হইল না, মণীন্দ্রবাবুর অধিকতর হৃদ্যতা আর ভদ্রতায় তার হৃদয় উন্মোচিত হইয়া গেছে; তার মনে হইয়াছে, ভদ্রলোক হিসাবে সে ইঁহাদের সমতুল্য, খাতির আর যত্ন তার প্রাপ্য।

স্ত্রীলোকটি জিজ্ঞাসা করিল, ঠাকুরের রান্না আপনার ভাল লাগে ত'?

নন্দকিশোর বলিল, ঠাকুর মন্দ রাঁধে না ত'।

—আপনি জাত মানেন? ছোট বড়, হাতে খাওয়া যায়, যায় না, এমনি বিচার আপনি করেন?

—আগে করতাম, এখন কেউই করে না দেখে আমিও করিনে।

একালের সৌখিন ঝি কি না; কথাবার্ত্তা গা-ঘেঁষা মতো। বলিল, ভালই করেন। তারপর হঠাৎ সে জানিতে চাহিল, বলুন ত' আমি এ বাড়ীর কে?

নন্দকিশোর ইহাকে ঝি মনে করিয়াছিল; কিন্তু তার অনুমানটা কি তা জিজ্ঞাসা করিতেই কথার স্বরেই নন্দকিশোরের মনে হইল, তার অনুমান মিথ্যা। বলিল, তা জানিনে।

—আমি এ-বাড়ীর কুটুম।

শুনিয়া নন্দকিশোর মুখ তুলিয়া তাঁহার দিকে তাকাইল কৌতূহলবশতঃ নহে, এ-বাড়ীর কুটুম্বিনীকে সম্ভ্রম দেখাইতে; এমনি ঘনিষ্ঠতার পরিচয় পাইয়াও নির্ব্বিকার থাকিলে মানুষকে অগ্রাহ্যের ভাব দেখানো হয়, নন্দকিশোর তা জানে। তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া সে দেখিতে পাইল, তাঁহাকে তিনি গভীরভাবে নিরীক্ষণ করিতেছেন, তাঁর মুখমণ্ডলে যে আভিজাত্যের ছাপ আছে তাহাও নন্দকিশোর এখন হৃদয়ঙ্গম করিল। এই পরিচ্ছন্ন মহিলাটিকে এ-বাড়ীর দাসী মনে করা ভুলই হইয়াছিল। দৃষ্টিশক্তির অভাবের দরুণ নন্দকিশোর নিজের কাছে লজ্জিত হইল।

ঠাকুর তল্লাস লইতে আসিল, ভাত তরকারী প্রভৃতি কোনোটি বাবু আর চাহেন কি না; চাহেন না শুনিয়া সে চলিয়া গেল।

তারপর মহিলাটি বলিলেন, আমি কাছেই একটা বাড়ীতে থাকি। বিপদে-আপদে ডেকে পাঠালে যাবেন। আমি একা মানুষ।

একা মানুষ বিপদে-আপদে কত অসহায়, নন্দকিশোর তা বোধ করিল, খুশীর সঙ্গে সম্মত হইয়া বলিল, নিশ্চয়ই যাবো, খবর পেলেই যাবো।

দেখা গেল মহিলাটি স্নেহপ্রকাশ করিতে বেশ পারেন, প্রচুর আর পরম উপাদেয় বাৎসল্যের সহিত বলিলেন, খুব সুখী হ'লাম শুনে; কিন্তু আপনি অত অল্প খান কেন? জোয়ান মানুষ আপনি, আপনাকে খাইয়ে লোকে পেরে উঠবে না; তা নয়, এ যেন পক্ষীর আহার।

কিন্তু এই অকিঞ্চিৎকর পক্ষীর আহারই সুস্থির চিত্তে গলাধঃকরণ করা নন্দকিশোরের বরাতে নাই; এমন সুন্দর স্নেহশীতল আবহাওয়া সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করিয়া দিয়া হৃদয়হীন বিধিবিড়ম্বনা শুরু হইয়া গেল সেই ক্ষণেই, অতিশয় মৃদু একটু সুঘ্রাণ কোথা হইতে ভাসিয়া আসিয়া ছড়াইতে ছড়াইতে বৃহৎ দু'টি বন্ধু পাইয়া গেল নন্দকিশোরের নাসিকায়, সেখানে সেই ঘ্রাণ অবাধে প্রবেশ করিল।

গন্ধটা গন্ধতেলের, বকুলের গন্ধ এবং কাহারো কেশপাশ হইতেই বাতাস এই সুবাস আহরণ করিয়াছে, আর, বহন করিয়া আনিয়াছে ইহা নিশ্চয়।

সঙ্গে সঙ্গেই নন্দকিশোরের স্মৃতিপট প্রদীপ্ত হইয়া দুলিয়া উঠিল, তার মনের গাঙে ঢেউ উঠিল, তার সম্বিৎ উজান দিকে প্রবাহিত হইয়া দ্রুতবেগে সেই ঘ্রাণের স্রোত বহিয়া চলিয়া গেল আর একদিনের একটা দেখার মাঝে যেদিন সে সাবানের গন্ধের অনুসরণ করিয়া গিয়াছিল নিষিদ্ধ একটা দ্বারে, সেখানে সেদিন সে যাহা দেখিয়াছিল তাহা যেন এই মুহূর্তে অধিকতর সমারোহে সমগ্রতা লাভ করিয়া আর অধিকতর স্ফুট ফুল্ল হইয়া তার পুরোভাগে জাগিয়া উঠিল, সমস্ত স্নায়ু শিরা তাহার নর্তনে আকর্ষণে থরথর করিতে লাগিল, একটা অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল।

নন্দকিশোর পর্দার দিকে চোখ তুলিল, কি করিয়া তুলিল, আর, কেন তুলিল, তাহা জানে না, চোখে দেখিতে পাইল কি পাইল না তাহাও সে জানে না, কিন্তু মনে হইল দৃষ্টি নিঃশেষ হইয়া পৌঁছিবার পূর্ব্বেই যেন একটি চক্ষু, একটুখানি ললাট, এবং কেশের খানিক কৃষ্ণ আভা পর্দার অন্তরালে অন্তর্হিত হইয়া গেল, পর্দাটা নড়িতেছে তা স্পষ্টই চোখে পড়িল।

নন্দকিশোরের এ-হুঁশ থাকার অবস্থা নয় এবং রহিলও না যে, একটি ব্যক্তি তার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে এবং তাহার ভাবান্তর লক্ষ্য করিতেছে, কিন্তু তার হুঁশ হইল সেই ব্যক্তিরই কণ্ঠস্বর কানে যাইয়া, তিনি বলিলেন, এরই মধ্যে হঠাৎ আপনার হল কি? অসুস্থ বোধ করছেন?

নন্দকিশোরের আনত মুখ আকর্ণ আগুন হইয়া উঠিল, "না"। বলিয়া হতচেতনের মতো সে হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল।

কুটুম্বিনী সবিস্ময়ে জানিতে চাহিলেন, উঠে পড়লেন যে?

প্রশ্নটা নন্দকিশোরের কানেও গেল না, কেবল সম্মুখের দিকে অস্পষ্ট দৃষ্টি মেলিয়া সে ধীরে ধীরে নামিযা গেল।

৭

ত্যাগ-ভোগের কোনোটাতেই নিজেকে রাজী করিতে না পারায় অর্থাৎ অচল ভূমির উপর দাঁড়াইবার একটা স্থান করিয়া লইতে না পারায়, নন্দকিশোরের নিজের উপর এত রাগ হইল যে তা বলিবার নয়, সেই রাগে সে ঘরময় ছটফট করিয়া বেড়াইতে লাগিল, এবং নিজেকে যেন কশার আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করিয়া ছাড়িয়া দিতে লাগিল।

তার মনে হইল, আবার পালাই।

এমন ঘোর সংকট আর বিভ্রমের মাঝেও নন্দর সৃষ্টিছাড়াভাবে একটু হাসিই পাইল; সেবার পালাইয়াছিল আতঙ্কতাড়িত হইয়া পরের কবল হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে, এবার সে পলাইতে চায় দোটানায় বিপন্ন হইয়া নিজের কবল হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে। দুটিতে কত প্রভেদ!

নন্দকিশোরের নাক দিয়া একটা অসহায় দীর্ঘনিঃশ্বাস পতিত হইল;

পালানো হয় না ; পুনরায় তার অর্থ দাঁড়াইবে বিশ্রী কদর্য্য, এমন বিশ্রী কদর্য্য যে, মণীন্দ্রবাবু উহাকে বোধ হয় আর আস্ত রাখিবেন না। অপরাধ যাইয়া পড়িবে তাহারই ঘাড়ে, পড়া অনিবার্য্য ; কারণ, মণীন্দ্রবাবু তাহার দ্বারা স্বীকারোক্তি করাইয়া লইয়াছেন যে, অপরাধ নারীরই ; মণীন্দ্র একবার তাঁহাকে ক্ষমা করিয়াছেন, বোধ হয় পায়ে ধরিয়া ভদ্রলোকের নিকট হইতে ক্ষমা আদায় করিয়া লইতে হইয়াছে, হয়তো বাক্যবাণে ক্লিষ্টা আর গলদশ্রুলোচনা হইয়া তিনি অনেক কাঁদিয়াছেন।

তাহারই প্রণয়াকাঙ্ক্ষার অপরাধে শাসিতা হইয়া সুন্দরী রমণী অশ্রুমুখী হইয়াছে, এই চিন্তা হঠাৎ ভারি মনোরম হইয়া উঠিল , এবং তাহারই পাশে কাঁটার মতো খচ্ করিয়া বিঁধিল একটা ব্যথা, উনি লাঞ্ছিতা হইয়াছিলেন তাহারই নিন্দনীয় মানসিক দুর্ব্বলতার কারণে, তাহারই ভয়বিহ্বলতার জন্য। পলায়ন না করিয়াও সেই ব্যাপারটাকে পরিহার করা যাইত, যাহাকে তখন অকারণেই দুঃসহ দুর্ব্বিপাক মনে হইয়াছিল, পলায়ন না করিয়া সোজাসুজি বলা যাইত যে, আপনি দয়া করিয়া আমাকে দেখা দিবেন না এবং ও-হেন প্রস্তাব ভুলিয়াও করিবেন না, আমি উহা আদৌ পছন্দ করি না , দ্বিতীয়ত আমি পেটের দায়ে এখানে আসিয়াছি, তাড়াইবেন না। ঐ কথাগুলি স্পষ্ট বলিয়া দিলেই তিনি সাবধান হইতেন, উদ্ঘাটিত হইতেন না, লাঞ্ছনা বা শাসনের হেতুই দেখা দিত না।

তাঁহাকে ততোধিক এবং যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছিতা হইতে হইবে যদি আবার তেমনি পালাই, তাঁহাকে কেবল খোঁটার উপর রাখিয়া মণীন্দ্র তাঁহাকে চিরজীবনের জন্য দুস্তর কণ্টকশয্যায় তুলিয়া দিবেন ! সর্ব্বনাশ ! যদি বলিয়া কহিয়া যাই তাহা হইলেও পরিণাম তাহাই ঘটিবে, মণীন্দ্র কদাচ তাঁহাকে রেহাই দিবেন না, জীবন দুর্ব্বহ করিয়া তুলিবেনই। নন্দকিশোরের প্রাণে ভারি করুণার উদ্রেক হইল, এবং তাহারই ঘোরে সে খানিক বিভোর হইয়া রহিল।

তারপর তার দেহ কণ্টকিত হইল ইহাই স্মরণ করিয়া যে, তিনি লুকাইয়া, সংসারের একেবারে অগোচরে, তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, খুব ভালো না লাগিলে এবং খুব ভালো না বাসিলে, অর্থাৎ প্রাণসংশয়কর তৃষ্ণা অনুভব না করিলে কেহ অমন করিয়া লুকাইয়া দেখে না। আজ পর্য্যন্ত তাহার মনে তাহারই যে জীবনেতিহাস প্রোথিত হইয়া উঠিয়াছে, এবং পরে ক্রমশঃ গ্রথিত হইতে থাকিবে, সেই ইতিহাসে এই ঘটনাটাই থাকিবে উজ্জ্বলতর গভীরতম মধুরতম আর স্মরণীয়তম হইয়া, জরা-মরণজয়ী হইয়া তাহার জীবন্ত সত্যটি স্থিতিলাভ করিবে, অলোকসামান্যা রূপসীর অতি দুর্লভ আর পরম কাম্য অনিরুদ্ধ তীব্র ভালোবাসা।

ভালোবাসা পাইয়া নন্দকিশোরের সশরীরে স্বর্গারোহণ ঘটিতে লাগিল, তার অর্থ এই যে, পরম উল্লাসকর প্রাপ্তির পুলকে তার অঙ্গ শিহরিত হইল, এবং তার জগৎ কুসুমিত হইল, এবং তার জগৎ প্লাবিত করিয়া পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার মতো সুনির্ম্মল ভালোবাসা তরঙ্গায়িত হইতে লাগিল।

এই ব্যাপারে দীর্ঘশ্বাস খুব প্রাধান্য লাভ করে।

নন্দকিশোরেরও একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল। নারীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রূপ-যৌবন অর্থাৎ নশ্বরত্ব বাদ দিয়া নিরবয়ব এবং নিরুত্তেজক চিরজীবী

ভালোবাসার আবির্ভাব হইতেই তার মনে হইল, সে বড়ো একা, এবং তিনিও তেমনি তাহারই মতো বড়ই একা। ইস্, হৃদয়ে হৃদয়ে সংযোগবশতঃ অনুকম্পার দারুণ প্রকোপে নন্দকিশোরের মুখ দিয়া ঐ ক্লেশসূচক শব্দটি সশব্দেই নির্গত হইয়া গেল; হইবারই কথা, কারণ মণীন্দ্রবাবুর এই গৃহে অধিষ্ঠিত যক্ষ এবং যক্ষাঙ্গনার মাঝে ব্যবধান অতি অল্প, আর, এক-লাফেই পার হওয়া যায় বলিয়া, সংকীর্ণ জলপ্রবাহের মিলনপ্রয়াসী এপার ওপার দু' তীরের যন্ত্রণার মতো এই বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণা সত্যই অপার।

সামান্য বাধাটা পার হইয়া অপার যন্ত্রণা ঘুচানো যায় কি উপায়ে তাহা নন্দকিশোর চিন্তা করিত কি না বলা যায় না, কারণ সেই সময়টিতেই পর্দ্দা ঠেলিয়া প্রবেশ করিল অবাঞ্ছিত বলরাম; বলিল,—ও, জেগেই আছেন। একবার দরজায় আসুন ত'।

—কেন?

—ডাক্ছেন আপনাকে। বলিয়া বলরাম দাঁত বাহির করিল।

ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া আসিয়া কে ডাকিতেছেন?

বলরামের দাঁত দেখিয়া বিরক্ত হইবার অবসর নন্দকিশোরের হইল না, চক্ষের নিমেষে সে লাফাইয়া উঠিল, এবং চক্ষের নিমেষেই পর্দ্দার বাহিরে আসিয়া দেখিল, 'এ-বাড়ীর কুটুম্ব' সেই মহিলাটি দাঁড়াইয়া আছেন, সৌজন্যজনিত প্রফুল্লতার মাঝে তাঁহাকে চমৎকার সৌম্য দেখাইতেছে।

মহিলাটি হাসিয়া বলিলেন,—আমি যাচ্ছি। ডেকে পাঠালে যাবেন, আলাপ করবো; যাবেন কিন্তু।

—যাব বই কি! বলিয়া নন্দকিশোর কৃতার্থ হইয়া রহিল।

'কুটুম' চলিয়া গেলেন।

৮

সেইদিন সন্ধ্যার পর আবার একটি প্রস্থান ঘটিল।

মণীন্দ্রবাবু ঢুকিয়া পড়িলেন, বলিলেন,—এই আসছি হে। ওপরে যাইনি এখনো। কমন ব্যাংক লিমিটেড বোধ হয় টিঁকে গেল। আজ রাত্রেই এলাহাবাদ যাচ্ছি। আরো কয়েকজন যাবেন, ঐ ব্যাংকেরই কাজে। বেশি কথা বলার সময় নেই। তুমি রক্ষক হ'য়ে থাকলে। খুব সাবধানে থেক। কবে ফিরবো জানিনে। তুমি ভক্ষক নও তা জানি। নিমক-হারাম লোককে দেখলেই আমি চিনতে পারি। কিন্তু, আর একটা কঠিন কথা: শনিবার তোমার বাড়ী যাওয়া হল না। শাপবে না ত'? ও-শাপ বড় লাগে। বুড়ো বাল্মীকি নাকি কেঁদে ফেলে ব্যাধ বেটাকে শেপেছিল!

নন্দকিশোর হাসিয়া ফেলিল।

—শাপলে ত' বয়ে গেল। আচ্ছা, চলি। খেয়েই ছুটতে হবে। আর পারিনে। আচ্ছা, বলিয়া মণীন্দ্র প্রস্থানোদ্যত হইতেই নন্দকিশোর দু'হাত তুলিয়া নমস্কার করিল; মণীন্দ্র প্রতিনমস্কার করিলেন না; বলিলেন, বাহ্যাচারের

ধার ধারিনে ; আমার সম্বন্ধে তুমিও ধেরো না। বুঝলে মাষ্টার, ও কেবল কাজ বাড়ানো। আচ্ছা, যাই। এসে যেন দেখিনে, তুমি আবার পালিয়েছ।

শুনিয়া নন্দকিশোর হঠাৎ অধোবদন হইল, মণীন্দ্র চলিয়া গেলেন।

মণীন্দ্রের শেষ কথা ক'টির ভিতর বেদনা ছিল, নন্দকিশোরকে তা আঘাত করিল।

কুটুম্বিনী চলিয়া গেছেন নিকটবর্ত্তী নিজের বাড়ীতে এবং মণীন্দ্রবাবু চলিয়া গেলেন বহু-দূরবর্ত্তী এলাহাবাদে, গৃহ প্রহরীহীন, অভিভাবকহীন, যতটা বাঞ্ছনীয় ততটা জনশূন্য হইয়া গেল এবং পৃথিবী হইতে স্বতন্ত্র হইয়া এমন একটা স্থানে দাঁড়াইয়া গেল যেখানে বাস করায় নন্দকিশোরের পক্ষে সুখ আছে, স্থান যত নির্জ্জন প্রাণিহীন তত প্রাণহীন এ-কথা সব সময়েই সত্য নহে, সত্য যে নহে তাহার প্রমাণ আজ এই বাড়ীটা। নন্দকিশোর মর্ম্মে মজ্জায় চৈতন্যে এই নির্জ্জনতার গভীর সঙ্গসুখ অনুভব করিতে লাগিল ; তার মনে হইতে লাগিল, এই বাড়ীর বায়ু স্বেচ্ছাবিহারী অবাধ প্রাণে পূর্ণ হইয়া গেছে তাহার প্রাণে এবং তাঁহার প্রাণে পরিপূর্ণ হইয়া বায়ু নিঃশ্বাসে উত্তপ্ত, বক্ষঃস্পন্দনে তরঙ্গিত, প্রতীক্ষার আবেগে কম্পমান, আর, বেদনায় আতুর হইয়া উঠিয়াছে, আর, পঞ্চশরের অলক্ষ্য দ্যুতিতে মুহুর্ম্মুহুঃ তাহার ভিতর যেন ফুলের প্রাণ ফুটিয়া ফুটিয়া মিলাইয়া যাইতেছে।

ঐরূপ চঞ্চল কিন্তু উত্তম আবহাওয়ায় বসিয়া থাকিতে থাকিতে নন্দকিশোর হঠাৎ জ্ঞানসঞ্চয়ে মন দিল ; কিন্তু আধুনিক বঙ্গ-ভাষার অভিধান 'চলন্তিকা' তার চিত্তের আক্ষেপ এবং বিক্ষোভ কতটা নিবারণ করিল তাহা সে-ই জানে এবং দ্রুতহস্তে পাতার পর পাতা উল্টাইয়া কতকগুলি শব্দের অর্থ সে চক্ষুগোচর করিল তাহাও সেই জানে।

গৃহকর্ত্তা বাহিরে গেলেন ; তিনি রওনা হইয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত বাড়ীর সবারই একটু ব্যস্ততা ছিল ; কাজেই নন্দকিশোরের লুচি আসিতে আজ রাত্রি বেশি হইয়াই গেল, প্রায় দশটা।

লুচি খাইতে খাইতে নন্দকিশোর ভাবিতে লাগিল মণীন্দ্রবাবুর কথা, বাবু ভাগ্যবান বটে ; অগাধ টাকা, কিন্তু টাকা যাক চুলোয়, অপরূপ নারীরত্ন তাঁর ; সেই আনন্দেই প্রতিমুহূর্ত্তে তাঁর স্বাস্থ্যোন্নতি ঘটিতেছে। ঘটিবে না কেন! উদ্বেগহীন একাধিপত্য যে! অমরবাঞ্ছিত যে রসায়ন তিনি হৃদয়পুটে পাইয়াছেন তার ক্রিয়া অমোঘ, রূপসম্ভোগই মানুষের জীবনের উৎস এবং উৎসব, সুধাময় উপচার। ভালোবাসা তিনি পান নাই, চাহেনও না বোধ হয় ; কিন্তু অনিন্দ্য রূপের স্বর্গ হইতে ক্ষরিত অনাবিল মধুধারা তিনি অহরহ নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে গ্রহণ করিতেছেন। ভালোবাসা গৌণ লক্ষ্য, জীবনের দ্বিতীয় ধারা ; আদিভূত যে-রসের নাম ভোগসুখ তাহা তিনি অপর্য্যাপ্তই পাইয়াছেন এবং পাইতেছেন। গায়ে মাংস লাগিবে না কেন। রঙে জলুস দেখা দিবে না কেন! তাঁর প্রাণে রাসোৎসব এবং মুখে কথার স্রোত চলিবে না কেন!

আলো নিবাইয়া নন্দকিশোর শুইল।

টাকা এবং ভালোবাসা যখন একই সার্থকতা দান করিতেছে তখন টাকার অভাবের দরুণ আপশোস কি আছে! যার টাকা অল্প তার কি সবই অল্প!

তার আয়ু, তেজ, আশা, উদ্যম, শ্রী, স্বপ্ন প্রভৃতি, এবং সর্ব্বোপরি প্রণয়াকাঙ্ক্ষা আর, তা-ই লাভ, এ-দুটো অল্প না-ও হইতে পারে।

অর্থাল্পতার দুঃখ যা মাঝে মাঝে দেখা দেয়, নন্দকিশোর তা তখনকার মতো ভুলিল; কিন্তু কেবল অর্থাল্পতার দুঃখ ভুলাইয়া দিবে, আজকার এই পরিবেশ সে-রকম স্থূল, লৌকিক এবং নিরীহ নহে।

তারপরই পুলকে নন্দকিশোরের অঙ্গ অবয়ব যেন মনের অনুসরণ করিয়া অন্তরীক্ষের দিকে ঠেলিয়া ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল।

এই শয্যা আজ ধন্য হইবে, ইহা সত্য। সুষুপ্তা নিশীথিনী আজ যৌবনসহ যৌবনের রূপের সঙ্গে রূপের, আর, প্রাণের সঙ্গে প্রাণের মিলনোল্লাস আপন বক্ষে চিহ্নিত অক্ষয় করিয়া রাখিবে।

কেন এরূপ অবশ্যই ঘটিবে, প্রতিবন্ধক দেখা দিবে না, নন্দকিশোর নিশ্চয়ই তা বলিতে পারিবে না, কিন্তু তার চৈতন্যে এই বিশ্বাস পুঞ্জীভূত হইল, রক্তে তাহা সঞ্চারিত হইল, আর মস্তিষ্ক ব্যাপিয়া তাহা ধক্‌ধক্‌ করিয়া জ্বলিতে লাগিল।—দৈবী কাণ্ড নিশ্চয়ই, বিপদ যেমন ছায়াময় পূর্ব্বাভাষ নিক্ষেপ করে, সুখ-সম্পদও তেমনি বোধহয় কল্লোলময়ী অলকনন্দার আলোক আর তরঙ্গ প্রেরণ করে।

কতক্ষণ নন্দকিশোর ভাবাবিষ্ট, আনন্দে আত্মহারা, আর 'আসার আশায়' মগ্ন ছিল, কে জানে, কাছেই কোথাও হঠাৎ একটা গুরুভার দ্রব্য পতনের শব্দে সে ভয়ানক চমকিয়া উঠিল।

কঠিন চমকানি; যে-কথাটা আস্তে বলিলেই চলিত, চমকিত নন্দর মুখ দিয়া সেই কথাটাই যেন আর্ত্তনাদের মতো বাহির হইল; নন্দকিশোর জানিতে চাহিল, কে?

উত্তর আসিল, আজ্ঞে আমি, বলরাম।

—শব্দ হ'ল কিসের?

—আজ্ঞে, খাটিয়া ফেললাম।

—কোথায়?

সিঁড়ির মুখ আর আপনার দরজার মধ্যেখানে।

—কেন?

—বাবু বলে গেছেন পই পই করে। চোরের ভয় তাঁর বেজায়। বলিয়া বলরাম শব্দ করিয়া হাসিল, বলিল, বাবু বললেন, তোরা আসার পথ পাবিনে, কিন্তু চোরগুলো ঠিক পাবে। সেইটাই ওদের বাহাদুরী। সিঁড়ির দোতলার দরজায় ডবল তালা লাগিয়ে এসেছি। ভূমিকম্প হলে কিন্তু মুশকিল। বলিয়া বলরাম আবার শব্দ করিয়া হাসিল।

ইহকালীন ধ্বংসজনক দুর্ঘটনা কেবল ভূমিকম্পই নয়। উপস্থিত দুর্ঘটনার প্রথম ধাক্কাটা নন্দকিশোর শুইয়া শুইয়াই সামলাইল; তারপর কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই, সে দুর্ব্বলদেহ রোগীর মতো কষ্টেসৃষ্টে উঠিয়া বসিল। নিষ্পলক চক্ষু যেদিকে সে তাকাইয়া রহিল সে দিকটা অন্ধকার, কেবল আলোকশূন্য বলিয়া অন্ধকার নয় নিষ্প্রাণ বলিয়াও অন্ধকার, আর, অধিকতর সূচীভেদ্য। অসাড়-

প্রাণে অন্ধকারটা সে দেখিল, এবং তারপরই সম্বিৎ উৎক্ষিপ্ত করিয়া, জম্মিল নয়, জ্বলিয়া উঠিল প্রচণ্ড ক্রোধ, মণীন্দ্রের বিরুদ্ধে, নন্দকিশোরের সেই ক্রোধ মণীন্দ্রের উপর নিপতিত হইলে তিনি বাঁচিতেন না।

মণীন্দ্র তখন গাড়ীর ভিতর।

কলিকাতার প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীটের সন্নিকটবর্ত্তী একটা স্থান হইতে প্রয়াগযাত্রার একটি হাতে-মুখে খড়িচূর্ণ মাখা সঙ্গিনী সংগ্রহ করিয়া লইয়া তিনি গাড়ীর দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় বসিয়া আছেন, এবং তাহাকে, সেই সঙ্গিনীকে, মিসেস রায় বলিয়া সম্বোধন করিয়া বিস্তর আনন্দ করিতেছেন এবং সহযাত্রী বন্ধুত্রয়ের বিস্তর আনন্দের কারণ হইতেছেন।

কাজেই নন্দকিশোরের ক্রোধের শিবতাণ্ডব আর যন্ত্রণা চলিতে লাগিল কেবল তাহারই বুকে, এবং আগুনের মূর্ত্তি ধরিয়া আবর্ত্তিত হইতে লাগিল তাহারই মস্তিষ্কে।

—বলরাম?

বলরাম ঘুমায় নাই, সাড়া দিল, আজ্ঞে।

—বাবু ফিরবেন কবে?

উত্তর চাহিয়া নন্দকিশোর অনর্থক ঐ প্রশ্ন করিল। বাবু ফিরিলে সে কি করিবে তাহা সে ভাবেই নাই।

বলরাম বলিল, সঠিক কিছু ব'লে যান নাই, বাবু।

নন্দকিশোরের একটি নিঃশ্বাস পড়িল, এ নিঃশ্বাসটি মামুলী নিঃশ্বাস নয়। তার এই নিঃশ্বাসটি অভিসম্পাতেরই প্রকারান্তর। নন্দকিশোর তাহার এই সর্ব্বনাশকর নিঃশ্বাসটিকে মণীন্দ্রের অদৃষ্টকে লক্ষ্য করিয়া তাঁর পশ্চাতে ছুটাইয়া দিয়া শুইয়া পড়িল।

লোকটা, ঐ মণীন্দ্র, অতিশয় দুশ্চরিত্র, ক্রূর, অতিশয় নির্লজ্জ, অতিশয় অভদ্র, এবং আরো বহু ন্যক্কারজনক দোষের আধার। ঐ লোকটি তাহারই, একটি ভদ্রলোকের স্ত্রীকে উদ্দেশ করিয়া তাহারই সম্মুখে যেরূপভাবে লোলুপতা এবং দুঃসাহস প্রকাশ করিয়াছে তাহাতে মনুষ্যপদবাচ্য কোনো ব্যক্তিরই কোনো কারণেই তাহার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা অনুচিত, এমন কি অসম্ভবই। বলিহারি যাই সেই ধৃষ্টতার। সেই অমানুষের অসাধ্য দুষ্কার্য্য কি আছে!

নন্দকিশোর পূর্ব্বে যাহা সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই, নিজের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া সেই জিনিসটা সে বিশেষভাবেই উপলব্ধি করিল। মণীন্দ্র বলিয়াছিলেন, ঘরে যার যুবতী স্ত্রী আছে তার সুখের অংশ মনে মনে আমি গ্রহণ করি। শুনিয়া তখন সে অবাক হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু এখন নন্দকিশোরের জ্ঞান হইয়াছে যে তা পারা যায়। বর্ত্তমানে তার যত আক্রোশ মণীন্দ্রের প্রতি, তার নিজের প্রতি নয়; কাজেই নন্দকিশোরের পুনঃ পুনঃ মনে হইতে লাগিল, অত্যন্ত লম্পট জঘন্য ব্যক্তি না হইলে পরস্ত্রী সম্বন্ধে মানুষের অত আসক্তি থাকে না, মণীন্দ্র তা'-ই; এবং সেই কারণেই তিনি তাহার মাহিনা বাড়াইয়া দিয়া রাত্রে লুচির ব্যবস্থা করিয়া দিলেও তিনি ঘৃণ্য। তিনি নিজেই অত্যন্ত বেপরোয়াভাবে নিজের স্বরূপ অনাবৃত করিয়া বলিয়াছিলেন যে, নারী

সম্পর্কে তিনি খুব হ্যাংলা। ভদ্রলোক তা কখনো পুত্রের বয়সী গৃহশিক্ষকের সম্মুখে মুখ ফুটিয়া বলে নাকি! তাঁর বাহাদুরির আর-কিছু নাই। গৃহশিক্ষক বলিয়া সে যেন মানুষই নয়! অত্যাচারী, ভণ্ড, কুৎসিত।

মণীন্দ্রকে গালি পাড়িয়া নন্দকিশোর খানিক যেন বেহুঁশ হইয়া রহিল।

তারপর তার কলিজা ক্ষতবিক্ষত আর পুড়িয়া ছাই হইতে লাগিল অন্য কারণে, এবার দোষী সে নিজে।

তাহার জন্যই প্রমোদিত অতুলন এক রাসমঞ্চ রচিত হইয়াছিল, ভাগ্যশ্রী হাসিমুখে তার মুখের দিকে নেত্রপাত করিয়াছিলেন, পাত্র পূর্ণ করিয়া সুধা লইয়া তাহারই উদ্দেশে যাত্রা একজন করিয়াছিল; কিন্তু সে নিজে অন্ধ মূঢ় ভীরু, অনন্ত রূপ আর যৌবন দূরে ঠেলিয়া দিয়া সে পরিত্রাহী ডাক ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছিল ঠিক পাগলের মতো।

তিনি বলিয়াছিলেন, আপনি নির্ব্বোধ, তাই দিশে পান না, পালান।

আতিথ্যগ্রহণ এবং আনন্দদানের জন্য ভোগস্বর্গে আর প্রেম বৈকুণ্ঠে অমৃতময় এই অবারিত আমন্ত্রণের অনিবার্য্যতা আর দুর্লভতা সে অনুভবই করিতে পারে নাই, এমনই সে দৃষ্টিহীন অসাড়, ক্লীব।

আজকার এই শাস্তি তারই কর্ম্মফল, তার প্রাপ্য। সে পলায়ন করিয়াছিল বলিয়া মণীন্দ্র তার কারণ একটা অনুমান করিয়াছিলেন, এবং অনুমান করিয়াছিলেন ঠিকই, ঘটনার সত্যতা সে স্বীকারও করিয়াছিল, তাই তাহাকেই নিরাপদে রাখিবার জন্য মণীন্দ্রের সতর্কতার সীমা নাই।

দুর্লঙ্ঘ্য প্রতিবন্ধক স্থাপন তার বিরুদ্ধে নয়, তাঁরই তথাকথিত প্রণয়িণীর বিরুদ্ধে! তার ক্রুদ্ধ হইবার কারণ কি আছে! নিজের পায়ে এমন করিয়া কুঠারাঘাত আর কেহ কখনো করে নাই, নন্দকিশোরের ইচ্ছা করিতে লাগিল, বুকে কুঠার মারিয়া নিজের ভবলীলা সে এখনই সাঙ্গ করিয়া দেয়। নিষ্ফল অস্তিত্ব, আর, অনুতাপপূর্ণ অতৃপ্ত বেদনাময় জীবন বহন করিয়া কাজ কি! অযোগ্য কাপুরুষের মৃত্যুই মঙ্গল।

স্বহস্তের কুঠারাঘাতে নিজের ত্বরিত মৃত্যু কামনা করিয়া নন্দকিশোর একটা শাস্তি গ্রহণ করিল বটে, কিন্তু বিন্দুমাত্র শান্তি পাইল না, কারণ তাহার সঙ্গে আর একজন জড়িত ও সংশ্লিষ্ট রহিয়াছেন। চক্রবাক নিজেকে বাদ দিয়া চক্রবাকীকে চিন্তা করিতে পারে, কিন্তু চক্রবাক কে বাদ দিয়া নিজের চিন্তা করিতে পারে না; শত্রু অথবা অদৃষ্ট ব্যাঘাত আর বিচ্ছেদ ঘটাইতে পারে, কিন্তু ব্যবচ্ছেদ করা তার সাধ্যাতীত, প্রেম যেখানে প্রাণে প্রাণে মিলিত করিয়াছে সেখানকার নিয়মই তাই!

নন্দকিশোর মানসচক্ষে একটি চিত্র দেখিতে লাগিল, যাহার তুল্য জীবন্ত আর করুণ সংসারে আর কিছু নাই; কাতরা বিপন্না নারী ক্রন্দনবেগ নিরোধ করিয়া ক্লান্তি আর অবসাদে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছেন, নিদ্রার নামগন্ধও তাঁর চোখে নাই, জলে তা ধুইয়া গেছে; লক্ষ্মীছাড়া যমপুরীর অন্ধকারে বন্দিনী বিপন্না নারীর হিয়া কেবলি মথিত হইতেছে, গুমরাইতেছে। তাঁর কম্পিত সঘন নিঃশ্বাসের সাথে তার প্রাণের বেগ আর দেহের সুষমা নিঃসৃত হইয়া যাইতেছে, কখনো স্পন্দন

কখনো শৈত্য সেই দেহে প্রবলতর হইয়া উঠিতেছে—রক্তমাংসে নির্ম্মিত সেই কুসুমকোমল দেহ আর সহিতে পারিতেছে না।

যে-ব্যক্তি ইহার হেতু, এই দুর্ভোগের যে মূল, পারিজাতের বুকে যে শেল হানিয়াছে, সংসারের মর্ম্মস্থলে যে নির্ঘাত আঘাত করিয়াছে, সেই দুর্বৃত্ত দানবকে সংসার ক্ষমা করিবে না।

সংসার সেই দুর্বৃত্ত দানবকে ক্ষমা না করিলে অকল্যাণযুক্ত দশদশার কোনটি সেই দানবকে পীড়িত করিবে তাহা ভাবিবার দরকার বোধ হয় নাই; নন্দকিশোর সংসারের সুবিধার জন্য তা বাছিয়া দিল না। কিন্তু আশ্চর্য্য হইল ইহাই ভাবিয়া যে, সে পীড়িত হইতেছে সংসারের কোন বদখেয়ালে!

কিন্তু তাহার চাইতেও আশ্চর্য্য ঘটনা ইহাই যে, দু' চোখ ভাঙ্গিয়া নন্দকিশোরের ঘুম পাইতে লাগিল, বাহিরে বলরামের নাকে কাঁকর পিষিয়া রথ চলিতেছে, ভিতরে সে, তার রক্ত আর মন ফুটিতেছে, মগজে লাগিয়াছে আগুন! তবু তার ঘুম পাইল।

৯

সকালবেলা নন্দকিশোরের যখন ঘুম ভাঙ্গিল তখন বলরাম তার দুস্তর খাটিয়া লইয়া চলিয়া গেছে এবং তখন নন্দকিশোরের প্রাণে তিলমাত্র সুখ নাই, মনে এমন বিতৃষ্ণা আর আলস্য যে পৃথিবীর দিকে তাকাইতে ইচ্ছা করিতেছে না—

ষড়রিপুর একটিও যখন প্রতাপশালী নহে, তখনও মনে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য ঘোর তিক্ততা দেখা দিতে পারে। বলরাম যখন চা ইত্যাদি লইয়া আসিল তখন তাহার দিকে চাহিয়া নন্দকিশোর তিক্ততা অনুভব করিল এবং রাখাল যখন পড়িতে আসিল তখন তাহার দিকে চাহিয়া সেই তিক্ততা আরো বাড়িয়া গেল।

বেগার ঠেলার মতো সে পড়াইয়া গেল, রাখালের পাঠ-বিষয়ক প্রশ্নের জবাব সে অল্পই দিল।

পড়িতে পড়িতে রাখাল হঠাৎ বলিয়া উঠিল, বাড়ীর চিঠি পেয়েছেন?

—না, কেন?

—মা জানতে চেয়েছেন।

সমস্ত তিক্ততা আর অরুচি ডুবাইয়া অপূর্ব্ব মধুর রস তৎক্ষণাৎ উথলিয়া উঠিল; নিজের সঙ্গে সম্পর্কিত করা ছাড়া এ-জিজ্ঞাসার আর কোনো অর্থই নাই; তার মুখ হইতে একটি জবাব লইয়া তাহাকেই, তার দেহ আর মনকে, তিনি নিজের কাছে স্থান দিতে চান, মনে মনে একটু স্পর্শ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তাঁর।

নন্দকিশোরের স্বর গদগদ হইয়া উঠিল, বলিল,—তাঁকে বলো' যে, চিঠি পাইনি। আর-কিছু বলেছেন?

—বলেছেন।

—কি বলেছেন? নন্দকিশোর উত্তরটা শুনিবার জন্য ঘাড় বাড়াইয়া দিল।

—রাত্রে একা একা ভয়ে তাঁর ঘুম হয় নাই।

শুনিয়া নন্দকিশোর ভাবে মশগুল হইয়া গেল—'একা একা' শব্দ দুটি প্রচুর অর্থ বহন করিতেছে, পার্শ্বে মণীন্দ্রের অভাব নিশ্চয়ই কঠোর হইয়া ওঠে নাই।

বলিল, ঘুম আমারও হয় নাই। প্রায় সারারাতই জেগে ছিলাম।

তাঁর ঘুম হয় নাই—

তারও ঘুম হয় নাই—

নন্দকিশোরের বুকের ভিতরটা কেমন করিতে লাগিল যেন—একবার বেদনায় মুচড়াইয়া উঠিতে লাগিল, একবার আনন্দে নাচিয়া উঠিতে লাগিল, এবং রাত্রিব্যাপী তার সর্ব্বপ্রকার অভিজ্ঞতা নূতন রকমের স্বাদসংযুক্ত, আর সুষ্ঠু হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিল, সর্ব্বোপরি আশার সঞ্চার এত হইল যে, স্বল্পপরিসর মাটির জগতে তাহা রাখিবার ঠাঁই না পাইয়া নন্দকিশোর চক্ষু নিমীলিত করিয়া ধ্যানের অনন্তলোকে তাহা ছাড়িয়া দিল আর ছড়াইয়া দিল।

গাঢ়স্বরে বলিল, ভয়ের কারণ কিছু নেই—তাঁকে নিশ্চিন্ত থাকতে বলো'। আমি আছি, ভয় কি! কাল আমি জেগেই ছিলাম; আজও থাকব। যথেষ্ট ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে মনে করিয়া নন্দকিশোর খানিক যেন বাহ্যজ্ঞানহীন অবস্থায় নিঃশব্দ হইয়া রহিল।

পড়া শেষ করিয়া রাখাল উপরে গেল—

নীচে বসিয়া নন্দকিশোর হাঁটু নাচাইতে নাচাইতে কল্পনা করিতে লাগিল, রাখালের মুখে বাড়ীর চিঠির অনাবশ্যক খবর আর জাগিয়া থাকার অত্যাবশ্যক খরব, দ্বিবিধ খবরই তিনি শুনিতেছেন—রাখালের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া, এবং যাহার খবর শুনিতেছেন সেই অকিঞ্চনকে স্মরণ করিয়া, উৎফুল্লভাবে তিনি তার মুখের ভাষার আবৃত্তি দু'কান ভরিয়া শ্রবণ করিতেছেন।

কিন্তু উহাও তুচ্ছ।

সিঁড়িতে দুমদাম শব্দ করিয়া রাখাল দ্রুতবেগে নামিয়া আসিল, দৌড়াইয়া ঘরে ঢুকিল; বলিল, মা বললে, জেগেই যেন থাকেন, কখন কি ঘটে বলা যায় না। বলিয়াই রাখাল তেমনি করিয়া চলিয়া গেল।

আর নন্দকিশোরের মনে হইতে লাগিল, সে ভূমিসাৎ হইতেছে, নিজেকে ধারণ করিতে সে অক্ষম, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, চন্দ্র, সূর্য্য স্থানভ্রষ্ট হইয়া তাহার সম্মুখে নৃত্য করিতেছে, বসুন্ধরা দুলিতেছে, হৃদয়পিণ্ডের স্পন্দন আর রক্তের গতি স্থগিত হইয়া গেছে এবং তথাপি, হৃদপিণ্ডের আর রক্তের নিরুদ্ধ অবস্থাতেই, তার তেজের অসাধ্য কার্য্য এখন কিছুই নাই।

জাগিয়া সে আছে এবং থাকিবে, গতিশীল কালের প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত এবং তার নেত্রপল্লবের প্রতিটি নিমেষ তাহারই প্রতীক্ষমান সতর্ক জাগরণে উদ্ভিন্ন আর উন্মীলিত হইয়া আছে এবং থাকিবে।

তারপর নন্দকিশোর খুব অন্যমনস্ক হইয়া রহিল, তেল মাখিতে বসিয়া তার তেলমাখা শেষ হয়ই না। শরীরের যে স্থানে একবার তেল দিয়াছে সেখানে সে আরো দু'তিনবার দিল; স্নান করিতে যাইয়াও ঠিক তেমনি অন্যমনস্ক—গাত্র-মার্জনা পুনঃ পুনঃই করিতে লাগিল—গায়ে মাথায় জল ঢালিতে শুরু করিল ত' একঘাই ঢালিতেই লাগিল।

আজও উপরেই আহারের ঠাঁই হইয়াছে। ঠাঁই হইয়াছে শুনিয়া সে উপরের উদ্দেশে পা বাড়াইতেই তাহাকেই চমকিত করিয়া তাহার রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিদ্যুতের তরঙ্গ খেলিয়া গেল। খুব গম্ভীরভাবে সিঁড়ি ভাঙিয়া নন্দকিশোর উঠিয়া গেল—সিঁড়ি ভাঙিতে কষ্টবোধ করিল না; দেখিল, সমুদয় ব্যবস্থা পূর্ব্ববৎ এবং নির্দ্দোষ; পরিবর্ত্তন এইটুকু যে শ্রদ্ধেয়া সৌম্যমূর্ত্তি কুটুম্বিনীর স্থলাভিষিক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে দন্তসুর্ব্বস্ব অপরিষ্কার বলরাম।

প্রথম নজরে দেখা গেল বলরামকে; এবং দ্বিতীয় নজরে দেখা গেল যে, তার দক্ষিণ দিককার দরজায় যে-পর্দ্দা গা মেলিয়া দিয়া ঝুলিয়া থাকিত তাহাকে গুটাইয়া একপাশে সরাইয়া রাখা হইয়াছে, ঘরের ভিতরটার অনেকখানি দেখা যাইতেছে, এবং আরো যা দেখা যাইতেছে তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব গৌরব যথেষ্ট। এ-ঘরেও একখানা প্রকাণ্ড আয়না রহিয়াছে, দরজার দিকেই তার মুখ। নন্দকিশোরের স্মৃতি উদ্দীপিত হইল।

দর্পণে ছায়া পড়ে—এই আছে এই নাই, এমনি ঘটে লক্ষবার। কিন্তু ছায়ার নিকটে ছায়ার পতনে স্বাতন্ত্র্য আছে, সর্ব্বদাই তা নিমেষের ব্যাপার নয়, নিমেষেই তার বিলুপ্তি ঘটে না—তা অমর হইয়া থাকে স্মৃতিপটে, স্মৃতিপথ বহিয়া সে ছায়ার সঞ্চারণ চলিতেই থাকে।

কাজেই, দর্পণের দিকে চোখ পড়িতেই নন্দকিশোরের ক্ষুধার চাইতে চতুর্গুণ প্রবল হইয়া উঠিল স্মৃতি, এবং নন্দকিশোর মনে মনে নিজের গালে কয়েকটা চড় বসাইয়া দিল। মুহূর্ত্তেক সেখানে সে দাঁড়ায় নাই—সদ্যঃধৌত অনাবৃত অতুলনীয় যৌবনব্যাপ্ত দেহ আর সর্ব্বাঙ্গের অবারিত সৌন্দর্য্য, তার ছায়া, পশ্চাতে ফেলিয়া সে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিয়াছিল, যষ্টির ভয়ে সারমেয়ের মতো, আতঙ্কে অন্ধ হইয়া, কিন্তু সেই ক্ষতি আর অতৃপ্তি আজ বুঝি ঘুচিবে, সবারই অজ্ঞাতে ঐ দর্পণের অভ্যন্তরে তিনি দেখা দিবেন এবং দেখিবেন। সেই দর্পণের দিকেই নন্দকিশোর ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল, এই সহজ কথাটা তার মনেই রহিল না যে, তার এই আচরণ বলরামের অদ্ভুত এবং আপত্তিকর মনে হইতে পারে।

গৃহিণী কখন বলরামকে ইঙ্গিতে ডাকিয়াছেন তাহা নন্দকিশোর টের পায় নাই, হঠাৎ একবার চোখ তুলিয়া সে দেখিল, বলরাম ও-ঘরের পর্দ্দার কাছে দাঁড়াইয়া বোধ হয় কর্ত্রীর হুকুম শুনিতেছে।

সম্ভবতঃ উনি বলরামকে স্থানান্তরে পাঠাইতেছেন, সেদিন যেমন ঠাকুরকে মিছরি, যে-মিছরিতে মাছি বসে নাই সেই মিছরি আনিতে দোকানে পাঠাইয়াছিলেন, তারপর তাকে তাঁর মনের কথা বলিয়াছিলেন। সেদিনকার ঘটনার চরম পরিণতির সম্ভাবনায় নন্দকিশোরের বুক দুরু দুরু করিতে লাগিল—তিনি কি বলিবেন, আর সে কি বলিবে! যে-হাতে করিয়া নন্দকিশোর মুখে ভাত তুলিতেছিল তার সেই হাতটা কাঁপিতে লাগিল।

কিন্তু বলিতে বা শুনিতে হইল না কিছুই, এবং হাতের কাঁপুনি হইল অপ্রাসঙ্গিক; কারণ, ঘটনা ঘটিল এই মাত্র যে, বলরাম ওদিককার পর্দ্দার নিকট হইতে এই পর্দ্দার নিকটে আসিয়া গুটানো পর্দ্দা নন্দকিশোরের চোখের উপর সটান করিয়া মেলিয়া দিয়া তার জায়গায় যাইয়া দাঁড়াইল। নন্দকিশোরের মুখ

লাল হইয়া উঠিল, তাহাকে যেন কেউ ইচ্ছা-পূর্ব্বক সহসা অপ্রস্তুতে ফেলিয়াছে। অপ্রস্তুতে পড়িয়া নন্দকিশোরের অল্প সময়ের জন্য অসন্তোষের উদ্রেক হইয়া একটু অশ্রদ্ধাই জন্মিল ; বিবাহিতা স্ত্রী ত' নন। শাসনের ভয়ে প্রেমাস্পদের সম্পর্কে পদ্দা'র অতো কড়াকড়ি না করিলেও চলিত।

কিন্তু সব সত্যের উপর এই সত্যই প্রবল যে, আশা আর আয়োজন করে মানুষ, ব্যবস্থা আর চালনা করেন ভগবান।

যেমন-তেমন করিয়া খাওয়া শেষ করিয়া নন্দকিশোর নামিয়া গেল অত্যন্ত অন্যমনস্কের মতো—পান হাতে লইয়া গালে দিতে তার ভুল হইয়া গেল, এবং গালে দেওয়া হইলই না, মমতার চিঠি আসিয়া তার হাতে পেঁাছিল—

মমতা লিখিয়াছে—

শ্রীচরণেষু,

কয়েক দিন যাবৎ পত্র লেখ নাই। কেমন আছ জানিবার জন্য আমরা বড় উতলা হইয়াছি, মা বড় ভাবিতেছেন। পোষ্টকার্ডে একখানা পত্র লিখিতে বেশী সময় লাগে না। সে সময়ও কি নাই? এত ব্যস্ত কোন কাজে জানি না। পত্রপাঠ তোমার সংবাদ দিবে।

আমরা ভালই আছি। ইতি—

সেবিকা মমতা।

যথাবিহিত ভৎ'সনা মমতার ঐ পত্রে ছিল, নন্দকিশোর পত্রের দিকে চাহিয়া একটু অপ্রতিভ হইয়া রহিল ; কাজটা অন্যায়ই হইয়াছে, খবর না দেওয়া উচিত হয় নাই। মা উৎকণ্ঠার যন্ত্রণা সহ্য করিতেছেন, মমতাও করিতেছে। উহাদের সে সর্ব্বস্ব, মনে হইতেই নন্দকিশোরের কোমল অন্তঃকরণ কাহার উপর অভিমান করিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল, এবং কেন চোখে জল আসিল, তাহা সে জানে না। তৎক্ষণাৎ সে ডাকঘরে ছুটিল ; ডাকঘরে দাঁড়াইয়াই পেনসিলে পত্র লিখিল মাকে ; লিখিল, সে ভালোই আছে ; পত্র না লেখার অপরাধ তিনি যেন মার্জ্জনা করেন ; আর কোনদিন এরূপ ভুল হইবে না। পত্র পাইতে দু একদিন দেরী হইলেও তাঁহারা যেন ভাবিত হইয়া কষ্ট না পান। শরীর খারাপ হইলে সে অবশ্যই সংবাদ দিবে।

পত্র ডাকে দিয়াই নন্দকিশোরের মন হালকা হইয়া গেল ; ক্ষমা প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গেই কর্ত্তব্যচ্যুতির অপরাধ এমন বাষ্পের মতো লঘু হইয়া গেল যে, অনুভব করার উপযুক্ত অস্তিত্বই তার রহিল না।

নন্দকিশোর ঘুমের আয়োজন করিতে লাগিল, অচিরেই ঘুমাইল এবং তিনটার পর ঘুম ভাঙিয়া আলস্যবশতঃ খানিক বিছানাতেই সে বসিয়া রহিল।

চাকরির চেষ্টা করা হইতেছে কই! কর্ত্তব্যকর্ম্মে এত অবহেলা ত' ভালো নয়! ভবিষ্যৎ আছে। এখানকার পনর' টাকা আজ আছে কাল নাই, পদ্মপত্রে বারিবিন্দুর মতো ; এটা ত' উপায় মাত্র, লক্ষ্য নয়। কিন্তু সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতেছে।

যে-লক্ষ্যের উপর ঝাঁপাইয়া পড়া উচিত ছিল, তাহাকে ত্যাগ করিয়া সে পলায়ন করিয়াছিল। মনস্তাপ সহিতে হইতেছে কত! মণীন্দ্র তাহাকে রক্ষা করিতে

যাইয়া বন্দী করিয়াছেন, হত্যা করিতেই উদ্যত হইয়াছেন। তবু উভয়ের চেষ্টায় পথ পাওয়া যাইবেই।

এখানে আসিয়াছিল বলিয়াই ত'।

ঠোঁট মুচড়াইয়া নন্দ একটু হাসিল, হাসিটুকু মুখে লইয়াই সে ঘরের বাহির হইয়া কল-ঘরে মুখ ধুইতে গেল, যাতায়াতে কল-ঘরটা একটু দূরেই পড়ে, প্যাসেজের মোড় ঘুরিয়া সেখানে ঢুকিতে হয়, কিন্তু শব্দ ঢোকে সোজা পথে! নন্দও ঢুকিল শব্দও উঠিল, সিঁড়িতে হিলউঁচু জুতার অতি-পরিচিত খটখট শব্দ, শব্দ দ্রুতবেগে নামিতেছে, নন্দকিশোর চমকিয়া উঠিল, তার সর্ব্বাবয়ব শক্ত হইয়া উঠিল, মন হইল সূচাগ্রের মতো তীক্ষ্ণ, একটা কিছু করিবার জন্য সে সচেষ্ট হইবার পূর্ব্বেই শব্দ মিলাইয়া গেল।

নন্দকিশোর ভাঙিয়া-চুরিয়া একবারে বসিয়া পড়িল। একি নিম্মর্ম দৈব! অদৃষ্টের প্রবঞ্চনা ইহার চাইতে সাংঘাতিক কেমন করিয়া হইতে পারে! দু'মিনিট পূর্ব্বে নয়, দু'মিনিট পরে নয় ঠিক যে-সময়টিতে অনুপস্থিত থাকিলে সে দর্শনে বঞ্চিত হইবে, সেই সময়টি দেবতা তাঁহাকে জানাইয়া দিয়াছেন, কি কৌশলে জানাইয়াছেন তাহা সেই দেবতাই বলিতে পারেন। বিধাতা সত্যই বাম। অভিমানে নন্দকিশোরের ভারি কান্না পাইতে লাগিল, পৃথিবী শুষ্ক, বাসের অযোগ্য হইয়া গেল, এবং সে নিজে যে একজন পরম ভাগ্যহীন ব্যক্তি, তাহাও সে বিশ্বাস করিল।

আর, মুখ ধুইয়া আসিয়া দেখিল, তের-চৌদ্দ বছরের একটি সুখদর্শন কান্তিযুক্ত বালক তার দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে, তাহাকে দেখিয়াই ছেলেটি পকেটে হাত ভরিল; একখানা ক্ষুদ্রায়তন কাগজ বাহির করিয়া তার হাতে দিল।

—কি এ?

—চিঠি।

উৎসুক হইয়া নন্দকিশোর চিঠির ভাঁজ খুলিল এবং পড়িল;

"কল্যাণীয়েষু,

> ডাকিয়া পাঠাইলেই আপনি আসিয়া দেখা করিবেন, এরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। আজ ৫টা হইতে ৫॥টার মধ্যে আসিবেন। কথাবার্ত্তা কহিব। ইতি।"

নিম্নে ঠিকানা ও তারিখ দিয়াছেন, কিন্তু নাম বা এমন কোন পরিচয় দেন নাই যাহাতে সেই কুটুম্বিনীকে পত্রলেখিকা মনে করা যায়।

'পুনশ্চ' দিয়া লিখিয়াছেন, "এই ছেলেটি ঐ সময়ে আমার দরজায় থাকিবে।"

নন্দকিশোর ছেলেটির মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল, আচ্ছা।

—নমস্কার। বলিয়া ছেলেটি কপালের কাছ বরাবর হাত তুলিয়া চলিয়া গেল এবং নন্দকিশোরের মনে হইতে লাগিল, ইহাকে কোথায় যেন সে দেখিয়াছে, ইহাকেই কিংবা অনুরূপ চেহারার কোন বালককে। কিন্তু কোথায় দেখিয়াছে, গাড়ীতে না পথে না কারো বাড়ীতে তাহা মনে করিতে পারিল না। চোখ বুজিয়া নন্দকিশোর একটা স্থানকাল হাতড়াইতেছে এমন সময় কণ্ঠস্বরে তার মনোযোগ আকর্ষণ করিল বলরাম: "এমন আর দেখি নাই।"

নন্দকিশোর ধীরে ধীরে চোখ খুলিয়া দেখিল, বলরাম স্বাভাবিকভাবে দাঁত মেলিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে।

জিজ্ঞাসা করিল, কি হ'ল?

—যা মুখে এল তাই বলে গেলেন, গাল দিলেন খুব।

—কে?

—কর্ত্রী।

—কেন?

—বারান্দার রেলিং-এ শাদা কি লেগে ছিল; বললেন, তুই চুন মুছেছিস্ এখানে। আমি বললাম, না। তিনি বললেন, মিছে কথা ফের যদি বলবি তবে অপমান হবি। মুছে ফ্যাল্ এখুনি। কিন্তু সেই শাদা জিনিসটা কি তা জানেন?

—কি?

—চড়ুইয়ের গু।

—কিন্তু তিনি ত' বাড়ীতে নেই। বেরিয়ে গেলেন বলে মনে হ'ল।

—এখন নেই, তখন ছিলেন। আমি তখনকার কথাই বলছি।

—কোথায় গেলেন?

—বাবুর খবর জানতে, বাবুরই এক বন্ধুর বাড়ী, সে-বাবু এ-বাবুর সঙ্গেই গেছেন। সেখানে যদি খবর এসে থাকে মেয়েদের কাছে। বাবু ত' এখানে খবর দেন নাই।

ও। বলিয়া নন্দকিশোর নিঃশব্দ হইয়া রহিল। এঁর পরিচয় সেখানে অজ্ঞাত নাকি! যে-মেয়েদের কাছে খবর জানিতে গিয়াছেন সে মেয়েরা কেমন ঘরের? এদিকে ত' বাবুর টানও আছে দেখ্‌ছি।

বলরাম বলিল, ঘুম পাচ্ছে। ঘরে ঘরে বড় বড় তালা লাগিয়েছেন আমি লাগালাম সিঁড়ির দরজায়। গু তুলতে ঝাড়া একটি ঘণ্টা লেগেছে। অনেক ছিল জায়গায় জায়গায়। সব তুলেছি। দেখুন দেখি মজা, দোষ করবে চড়ুই, আর গাল খাব আমি।

—আচ্ছা, এস। বলিয়া নন্দকিশোর মুখ ফিরাইয়া হাই তুলিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১

কাঁটায় কাঁটায় সোয়া পাঁচটার সময় আহূত নন্দকিশোর সুসজ্জিত হইয়া স্নেহপূর্ণ আহ্বানের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে বাহির হইল। তিনি যে-বাড়ীর 'কুটুম' নন্দকিশোর সেই বাড়ীরই প্রিয় গৃহশিক্ষক; তাহার সঙ্গে আত্মীয়তা অনুভব করা কিংবা তাহাকে সহায় গণ্য করা কিছুই বিচিত্র নয়। সুতরাং নন্দকিশোর বাহির হইল। আগে একদিন সে টেলিগ্রাম লইয়া বাবুর সন্ধানে যাত্রা করিয়াছিল সেই নিয়তির বশে যে-নিয়তির বশে খাদ্যান্বেষণে নির্গত ব্যাং লাফাইতে লাফাইতে

গিয়া পড়ে সাপের একেবারে মুখে! আজ সে-রকম কোন দুর্দৈবের আশঙ্কা নাই।

নিঃশঙ্ক নন্দকিশোরের পত্রোক্ত ঠিকানায় পৌঁছিতে পথ ভুল হইল না, দেরীও হইল না; এবং সুস্থচিত্তে সেই নম্বরের দরজায় উপস্থিত হইয়া সে দেখিল, কুটুম্বিনী কথা রাখিয়াছেন, সেই ছেলেটিকে দরজায় রাখিয়া দিয়াছেন।

"আসুন"! বলিয়া সে ব্যগ্রভাবে অভ্যাগতকে অভ্যর্থনা করিল, সঙ্গে সঙ্গেই অগ্রসর হইল, নন্দকিশোর অসঙ্কোচে তার অনুসরণ করিল এবং কিছুতেই নিঃসন্দেহ হইতে পারিল না। ইহাকে কিংবা ইহার প্রতিরূপ আগে সে দেখিয়াছে কিনা।

নীচেকার যে ঘরটা দেখা যাইতেছে তাহাকে দুই দিকে বেষ্টন করিয়া প্রশস্ত দরদালান, সেই দরদালানের অপর প্রান্তে দ্বিতলে উঠিবার সিঁড়ি। ছেলেটি তাহাকে সিঁড়ির মুখে আনিয়া বলিল,—আপনি ওপরে উঠে যান্। সদর দরজা খোলা আছে, দিয়ে আসি। বলিয়া সে ব্যস্তভাবে চলিয়া গেল।

নন্দকিশোরের ব্যস্ততার কারণ নাই।

এ-বাড়ীতে আসা যেন তার ব্যক্তিগত অবিরোধী অধিকার, এমনই একটা অকম্পিত ভাব লইয়া নন্দকিশোর সিঁড়ি ভাঙিতে লাগিল, কষ্টবোধ করিল না। উপরে উঠিয়া সে বারান্দায় পা দিতেই দরজা ছাড়িয়া সেই মহিলাটি প্রফুল্ল মুখে তাহার দিকে আগাইয়া আসিলেন; সাগ্রহে বলিলেন, আসুন, আজ কি ভাগ্যি আমার! আমি পথ চেয়ে বসে' ছিলাম।

কণ্ঠস্বরের অকপট কোমলতায় তাঁর স্নেহের স্পর্শ পাইয়া নন্দকিশোর মুগ্ধ হইয়া গেল; বলিল,—আমাকে 'আপনি' বললে আমাকে খুব লজ্জা দেয়া হয়।

—তুমিই বলব এখন থেকে। তোমাকে সত্যিই পর মনে করিনে। ছেলের ওপর মায়ের যেমন তেমনি তোমার ওপর আমার মমতা জন্মেছে।

তাঁর স্নেহস্নিগ্ধ চোখের দিকে চাহিয়া নন্দকিশোর ভাবিতে লাগিল, এই অতুলনীয়া মাতৃমূর্ত্তির পদধূলি লইবে কি না! মায়ের ত' জাতিবিচার নাই, সন্তানের কেন থাকিবে! পদধূলি লইবার উদ্যম মনে হইলেও হাতের অবসর হইল না, যে হাতে পদধূলি লওয়ার নিয়ম তিনি তার সেই ডান হাতখানাই খপ্ করিয়া চাপিয়া ধরিলেন: বলিলেন, এস, বসবে। বলিয়া তিনি নন্দকিশোরকে এক রকম টানিয়াই ঘরে লইয়া গেলেন।

হাত ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, বসো' চেয়ারে।

কিন্তু বসিবার পূর্ব্বে নন্দকিশোর খুব অবাক হইয়া গেল, ঘরের আসবাব প্রভৃতি যাবতীয় দ্রব্যের প্রশস্ততা আর উচ্ছল সৌন্দর্য্য আর কারুকার্য্যের যেন অন্ত নাই, চেয়ার রহিয়াছে, টেবিল রহিয়াছে, আলনা রহিয়াছে, আয়না রহিয়াছে, পালঙ্ক রহিয়াছে, সবগুলিরই চাকচিক্য যেন চোখ ধাঁধাইয়া মুহুর্মুহুঃ ঠিকরাইয়া উঠিতেছে, কেবল শোয়া-বসার আরামের জন্য টাকাকে টাকা জ্ঞান না করিয়া কাঠের উপর ঢালা হইতেছে!

কিন্তু সকলের চাইতে দ্রষ্টব্য ঐ পালঙ্ক, আড়ে-বহরে বিপুল ব্যাপার; আর তদুপরি বিস্তৃত শয্যা আরো দেখিবার মতো, যেন ফুলকাটা দুধের ফেনা ঢেউ

খেলিতেছে ! বালিশ চাদর ওয়াড় এমনই বাহারের যে, আর গদি তোষোক এমনই পুরু যে, লাফাইয়া পড়িতে ইচ্ছা করে, শখ মিটাইতে একবারের জন্য নয়, চিরদিনের জন্য ।

লাফাইয়া নন্দকিশোর সে-বিছানায় পড়িল না ; বলিল, আপনিও বসুন। বলিয়া সে চেয়ারে বসিল, তার শরীরের চাপে চেয়ারের গদি চার ইঞ্চি বসিয়া গেল ।

—না, বাবা, বসুব না এখন। সারাদিন এত বসে থাকি যে, মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে থেকেই ভারি আরাম পাই। বলিয়া মহিলাটি দাঁড়াইয়া থাকার কারণ দেখাইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন ।

নন্দকিশোর বলিল,—তা বটে। এবং তারপরই সে দেখিল, তিনি হঠাৎ গম্ভীর হইয়া গেলেন ; যেন একটা উৎকণ্ঠা লইয়া তাহার দিকে খানিক্ একদৃষ্ট তাকাইয়া থাকিয়া বিষণ্ণস্বরে বলিলেন,—একটা কথা বলি তোমাকে।—না, থাক, এখনই বলুব না। একটু মিষ্টিমুখ করো আগে, তারপর শুনো। আগে শুনুলে মিষ্টি মুখে দিতে তোমার ইচ্ছে হবে না। চা খাও ত' ?

—আগে খেতাম না ; ও-বাড়ীতে এসে এখন অভ্যাস হয়েছে ।

কিন্তু কথাটা কি ! শুনিলে আহারে অরুচি জন্মিবে, এমন কি-কথা ও'র থাকিতে পারে ! অমঙ্গলের ভয়ে নন্দকিশোরের বুকে একটু কাঁপুনি দেখা দিল ।

—বস একটু। একা থাকুতে সংকোচ ক'রো না। আমি শীগ্গিরই আসছি। বলিয়া তিনি দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন ।

তারপর এক মিনিটও যায় নাই, নন্দকিশোর শুনিল, তার পিছন দিক্কার দরজা হইতে কে বলিতেছে : "মাষ্টার মশাই দেখুন, কে এসেছে ?'

শিশুসুলভ সুকোমল নির্ম্মল কণ্ঠস্বর, কোনো শিশু যেন লুকাইয়া থাকিয়া আনন্দভরে তাহাকে কৌতুক-ক্রীড়ায় আহ্বান করিতেছে।—কিন্তু তা নয় ।

সুকোমল নির্ম্মল কণ্ঠস্বর কানে যাইয়া নন্দকিশোর মনের কোণে একটু হাসি ভাব লইয়া চোখ ফিরাইতেই বিদ্যুতের ঝলক লাগিয়া তার চোখ মুহূর্ত্তের জন্য যেন দৃষ্টিহীন হইয়া গেল ।

তাহারই বাঞ্ছিতা, সেই রূপ, যে-রূপ সম্মুখে আসিলে চক্ষু রূপ দেখিতে দেখিতে রূপ দেখা বিস্মৃত হইয়া রূপের দিকেই নিষ্পলক হইয়া থাকিতে চায়।—নন্দকিশোরের চক্ষু যত অল্প সময়ের জন্যই হোক, নিষ্পলক ত' হইলই, তার উপর এমন কিছু বিপর্য্যয় ঘটিল যা যন্ত্রণা ভোগ করিতে অনিচ্ছুক মানুষের অদৃষ্টে যত কম ঘটে ততটা ভালো ; তার নাসিকা ও কর্ণযুগল সমেত সমগ্র মুখমণ্ডল লাল হইয়া আগুন ছুটিতে, আর, জ্বালা করিতে লাগিল, ত্বকের নিম্নভাগ রক্তপ্রদাহে ফাটফাট করিতে লাগিল, হৃদপিণ্ডের অবস্থা যা হইল তা অবর্ণনীয়, শরীরের সমুদয় রক্ত ঢেউয়ে ঢেউয়ে ছুটিয়া যাইয়া আছাড় খাইয়া পড়িতে লাগিল তাহাতেই ।

দেহাভ্যন্তরের ঐ ক্ষিপ্ত-উন্মাদমতা সহ্য করিতে করিতে একরকম অচেতন অবস্থাতেই নন্দকিশোর তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে নতচক্ষে উঠিয়া দাঁড়াইল ; কিন্তু নন্দকিশোরের ওঠা তাঁর মনঃপূত হইল না, হাসিয়া হাসিয়া আপত্তি প্রকাশ করিলেন ; বলিলেন, উঠে দাঁড়ালেন যে হঠাৎ ? পালাবেন নাকি ?

নন্দকিশোর ধপ করিয়া বসিয়া পড়িল, চেয়ারের গদি এবার চার ইঞ্চিরও বেশি বসিয়া গেল ; নন্দকিশোর তা টেরও পাইল না।

—হ্যাঁ, বসুন। বলিয়া তিনি অদূরবর্ত্তী একখানা চেয়ারে যাইয়া বসিলেন ; ঈষৎ ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিলেন, একবার পালিয়ে যে শাস্তি দিয়েছেন আমাকে !

নন্দকিশোরের সংকট হইল বেজায়। যে রূপ নিষ্কম্প-প্রাণে প্রাণ ভরিয়া এবং নিষ্কম্প চক্ষে চক্ষু ভরিয়া দেখিয়া আত্মাকে তৃপ্ত করিবার লালসায় সে মাকে প্রণাম না করিয়া এবং মমতার কাছে বিদায় লইতে বিস্মৃত হইয়া ছুটিতে ছুটিতে মণীন্দ্রবাবুর গৃহে আসিয়া উঠিয়াছিল সে রূপ এখন সম্মুখে বিরাজিত।

কল্পনার অংকুশতাড়না চলিয়াছিল তখন, এখনও একটা অংকুশতাড়না চলিতে লাগিল তার মনে, কিন্তু নন্দ চোখ তুলিতে পারিল না, তার সমস্ত উদ্যম আর অভীপ্সা যেন স্পষ্ট সত্য জাগ্রত জগতে নিস্তেজ হইয়া গেছে।

উঁহার অভিযোগ শুনিয়া নন্দকিশোরের আনত দৃষ্টি আরো ম্লান হইয়া গেল।

উনি বলিতে লাগিলেন, বাবু আমাকেই সন্দেহ ক'রে কত যে সাবধান হয়েছেন তা ত' দেখেইছেন। বাবুর ঘটে বুদ্ধি বড় কম।—আপনি যদি আমার দিকে চোখ তুলে না তাকান্‌ তবে আমি কথা বলব না। চোখ তুলুন, হুকুম শুনুন।

নন্দকিশোর নিষ্কম্প চক্ষু তুলিয়া তাঁর মুখের দিকে চাহিল, দৃষ্টি নিবিষ্ট হইয়া রহিল, সত্যই প্রাণ জ্যোৎস্নায় অমৃতে পূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল।

তাকিয়ে থাকুন, আমি কথা বলি। বাবু বলেন, "তুমি যখন কথা বলো তখন তোমাকে আরো সুন্দর দেখায়, এত সুন্দর যে স্থির থাকতে পারিনে।" আপনারও কি সেই মত ! স্থির থাকা কঠিন ?

নন্দকিশোরের মুখ ফুটিল ; বলিল, হ্যাঁ।

—কিন্তু অস্থির হলে ত' চলে না।—বলছিলাম বাবুর কথা। আমাকে না ধমকে, তাড়ানো উচিত ছিল আপনাকে, আপনি যখন ফিরে এলেন। আমার লোভেই ফিরে এসেছিলেন, নয় ? বলিয়া মুখ টিপিয়া হাসিলেন, এমনি ভঙ্গীতে সে-হাসি ফুটিল যে, নন্দকিশোর ভয় পাইয়া গেল, সেই হাসির আকর্ষণ ছিন্ন করিতেই হঠাৎ চোখের পাতায় পাতায় মিলাইয়া তাহাকে যেন সে তার জীবনের বাহিরে একটা অন্ধকারে রাখিয়া দিল, নিজেকে তার বিশ্বাস নাই।

তবু নন্দকিশোরের মুখ পুনরায় ফুটিল ; বলিল, হ্যাঁ।

অর্থাৎ সত্যই তাঁহারই লোভে সে ফিরিয়া আসিয়াছিল।

—কিন্তু বাবু তা মোটেই বুঝতে পারেননি ; তিনি কেবল পাহারা বসাতে আর তালা লাগাতেই ব্যস্ত।—বলিয়া তিনি অতি মনোহর অনুচ্চ একটু হাসির লহরী তুলিলেন। উঠিয়া যাইয়া পালংকে বসিলেন, তাকিয়া টানিয়া লইয়া শুইয়া পড়িলেন।

নন্দকিশোর তাকাইয়া তাকাইয়া তা দেখিল ; আর দেখিল যে, তাঁর দেহ অলস, বাহুযুগল স্কন্ধ পর্য্যন্ত অনাবৃত, অত্যন্ত শিথিল, আর, অত্যন্ত সুগঠিত, শয়নভঙ্গী স্বচ্ছন্দ।

মদিরচক্ষে দৃষ্টি হানিয়া তিনি বলিলেন, আগের দিনে ছিল ভালো ; মুনি ঋষিরা বনে জঙ্গলে বাস করতেন, আর দরকার বোধ করলে কুয়াশা কি অন্ধকার সৃষ্টি করে নিতে পারতেন। তা-ই না ?

নন্দকিশোর বলিল, পারতেন।

—আপনি যদি তা পারতেন তবে এখন কি সৃষ্টি করতেন, কুয়াশা না অন্ধকার ? বলিয়া তিনি এবার খিল্‌খিল্‌ করিয়া হাসিলেন।

নন্দকিশোরের মুখমণ্ডল অসহ্য রক্তের চাপে যেন টাটাইয়া উঠিল।

—উঠি। আপনাকে সামনে ক'রে শুয়ে আছি দেখলে মা আবার ভাববে বেয়াদপি করছি।

—কৃষ্ণা ?—ভৎ'সনায় কঠিন হইয়া অতি নিকটেই সেই মায়েরই কণ্ঠ ধ্বনিত হইল।

নন্দকিশোর এতদিন পরে জানিতে পারিল, মেয়েটির নাম কৃষ্ণা।

কৃষ্ণা অস্থিরভাবে উঠিয়া বসিল, কিন্তু ভৎ'সনায় লজ্জিত হইয়া কি ভয় পাইয়া নয়, হাসিতে হাসিতে পালঙ্কের ধার হইতে পা ঝুলাইয়া দিয়া ছেলেমানুষের মতো মনের সুখে পা দুলাইতে লাগিল।

মুহ্যমান অবস্থায় চোখ নামাইয়া নন্দকিশোর বসিয়াছিল—দোদুল্যমান পদপল্লব দু'টি তার চোখে পড়িল. দু'টি লীলায়িত অপরূপ শ্বেতপদ্ম যেন এই পায়েই সে স্বপ্নে পুষ্পাঞ্জলি দিয়াছিল।

"শয়তান মেয়ে. তোমাকে এ-ঘরে আসতে আমি বারণ করিনি"—বলিতে বলিতে কৃষ্ণার মা একহাতে খাবারের থালা এবং অপর হাতে চা লইয়া নন্দকিশোরের সম্মুখে আসিলেন। তাঁর মন যে অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে তাঁর মুখ চোখ দেখিয়া তা স্পষ্টই বুঝা গেল ; খাদ্য এবং পানীয় তিনি ধীরে ধীরে টেবিলের উপর নামাইয়া রাখিলেন : বলিলেন, বাবা এস. একটু মিষ্টিমুখ করো ; আমার ইচ্ছা পূর্ণ করো, অনুরোধ রাখো।

কোথায় যেন একটা অথই পাথারে নিমজ্জিত দিশেহারা নন্দকিশোর মুহূর্ত দুই নিজেকে, অর্থাৎ নিজের কোনো অংশকেই সঞ্চালিত করিতে পারিল না ; তারপর বলিল,—দিন্‌।

কৃষ্ণা হঠাৎ নামিয়া দাঁড়াইল।

কৃষ্ণার মা কঠোর কণ্ঠে বলিলেন,—যাও। যাও এখান থেকে।

কিন্তু কৃষ্ণা মায়ের আদেশ ভ্রূক্ষেপও করিল না ; চমৎকার আনন্দের সঙ্গে নন্দকিশোরের ডান হাতখানা দুই করতলের ভিতর তুলিয়া লইয়া অসীম আগ্রহের সঙ্গে সে বলিল, আমাকে ক্ষমা করতে হবে। আপনার এই তরুণ বয়েস। আপনাকে আমি ভালোবাসি। কিন্তু তা জানাবার সুযোগ কই।—বলিয়া নন্দকিশোরের হাত নন্দকিশোরের দিকেই ছুড়িয়া দিয়া সে চলিয়া গেল, দরজার কাছে যাইয়া বলিল—এখানে মা, ওখানে মণিবাবু।

তারপর আর কৃষ্ণাকে দেখা গেল না।

মণীন্দ্রের মুখে শোনা গল্প নন্দকিশোরের সমক্ষে স্বচ্ছ চাক্ষুষ বৃত্তান্তে

দাঁড়াইয়া গেল ; কৃষ্ণা যার মারফৎ মণীন্দ্রের খুড়তুতো ভগিনী তিনিই ইনি, কৃষ্ণার গর্ভধারিণী। অতর্কিতে তার ইহাও মনে পড়িল যে, সে বেশ্যালয়ে বসিয়া আছে।

নন্দকিশোর ধীরে ধীরে খাবারে হাত দিল, খাবার মুখেও তুলিল।

কৃষ্ণার মা বলিলেন,—"আমি কৃষ্ণার মা বটে, কিন্তু কৃষ্ণার আচরণে তাকে আমি প্রাণের ভেতর থেকে মেয়ে বলে স্বীকার করতে পারিনে, বড় বাধে। সে লোক ভালো নয়। তোমাকে দেখে অবধি তোমার ওপর কি যে একটা মায়া পড়েছে তা বলতে পারিনে। তোমার মুখখানা নেহাত ছোটছেলের মতো কাঁচা আর সরল। আমি মণির বাড়ীতে গিয়ে তোমাকে সেখানে দেখেই ভারি ভয় খেয়ে গেলাম। আমার মেয়ে কৃষ্ণা ঐ বাড়ীতেই থাকে, আমার ভয়ের কারণ হল তাই। তোমাকে বলবো কি বাবা, মেয়েটা চিরকাল শয়তান। মণির বাড়ীতে যাবার আগে সে অবশ্য এখানে আমার কাছেই থাকত—তা হবে না, খাবার সবগুলো তোমাকে খেতে হবে : মাথার দিব্যি আমার।"

নন্দকিশোর খাবার খাওয়া বন্ধ করিয়া চায়ের দিকে হাত বাড়াইতেছিল, 'মাথার দিব্যি' শুনিয়া সে হাত ফিরাইয়া আনিয়া নিমকি একখানা তুলিয়া লইল।

কৃষ্ণার মা বলিতে লাগিলেন,—"ওকে আয়ত্তে রাখতে গিয়ে কত যে নাস্তানাবুদ হয়েছি তা বলবার নয়। ভারি নিষ্ঠুরের মতো স্বভাব ওর। রূপ আছে, রূপের জোরে মানুষকে ক্ষেপিয়ে তুলে মজা দেখা ওর মজ্জাগত অভ্যাস। কতজনকে যে মিছি-মিছি পাগল করেছে তার ইয়ত্তা নাই। মনে হয়, কাউকে ভালোবাসে না, বাসতে পারেই না, ঈশ্বর ওকে সে ক্ষমতা দেন নাই। তোমাকে মণির বাড়ীতে দেখে আমার তৎক্ষণাৎ মনে হ'ল, আর, ভারি ভয় হ'ল যে এই ভালো ছেলেটাকে বজ্জাত মেয়ে আমার কষ্ট না দিয়ে কিছুতেই ছাড়বে না। কষ্ট যে তুমি পাচ্ছ তোমার ধরণ দেখে তা-ও কতকটা আঁচ করতে পারলাম। তোমাকে সাবধান করতেই তোমায় ডেকেছিলাম। কিন্তু দৈব তোমার বিপক্ষে ব'লেই মেয়ে এসে হাজির হয়েছে, তুমি আসার কিছু আগেই তোমার যন্ত্রণার কারণ যা ও হয়েছে তা বলবার নয়। কিন্তু সব ভালো যার শেষ ভালো, এর পর আর তুমি যন্ত্রণা পাবে না, তোমার মন ফিরে গেছে, তুমি বুঝেছ সব, মণির ছেলেকে পড়াতে থাকো, আর তোমার ভয় নেই, দুঃখও থাকবে না। কেমন করেছি চা টা ?"

নন্দকিশোর বলিল, ভালোই লাগছে।

—"আমাদের পরিচয় যে তুমি জানো তা আমি জানি। তুমি ও-বাড়ী থেকে পালালে মণীন্দ্র যা সন্দেহ করেছিলেন তা ঠিকই। তিনি কৃষ্ণাকে ধমকে বলেছিলেন, সে-ভদ্রলোক যদি আসে তবে তাকে আমি বলবই তুমি কে এবং কি, তাহ'লে আর তাকে নাচাবার আর কাঁদাবার সুবিধা হবে না। সে-লোকটা প্রকৃতে সৎলোক, পরিচয় শুনলে ঘেন্নায় সে মুখ দেখতে চাইবে না ; কিন্তু।"

তিনি চুপ করিতেই নন্দকিশোর আবার তাঁর মুখের দিকে তাকাইল। তিনি বলিলেন, "কিন্তু তুমি তা পারো নাই। পারা কঠিনই। কৃষ্ণাকে বিশ্বাস করে তুমিকষ্টই পেয়েছ।"

চা পান শেষ করিয়া নন্দকিশোর উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, আমি এখন যাই।

—আচ্ছা, এস। চেনাশোনা হয়ে গেল, এস মাঝে মাঝে। আমাকে ঘেন্না করো না ত'?

—না। আপনি আমাকে রক্ষা করেছেন, শৃঙ্খলমুক্ত করে নবজীবন দান করেছেন, সুখী করেছেন। ঘেন্নার ভাব মনে রাখলে আমার চরম অকৃতজ্ঞতার পাপ হবে। বলিয়া নন্দকিশোর দরজার দিকে অগ্রসর হইল।

তখন তার প্রাণে একমাত্র সত্য হইয়া উঠিয়াছে তাহারই মমতা, মমতার মুখচ্ছবি অত্যন্ত উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া আছে, তার কণ্ঠ জিহ্বা হৃদয় ব্যাপিয়া নিঃশব্দে ধ্বনিত হইতেছে মমতারই স্নিগ্ধ নামটি।

———

রোমন্থন

পরিচ্ছেদ—১

সত্যেন্দ্র দত্তের ষ্ট্রীটের ১৭ নং বাড়ীতে সাজ সাজ রব পড়িয়া গেছে···

রামহরি, লছমন আর কেদার উপর্যুপরি একতালা হইতে তেতালায় অধিরোহণ করিয়া তখনই অপর ফরমাইসে একতালায় অবতরণ করিতেছে।

রাশিকৃত চট কিনিয়া চেয়ার প্রভৃতি কাষ্ঠাসনগুলি মুড়িয়া সেলাই করান হইয়াছে—'লরি' ডাকিয়া সেগুলিকে রেলওয়ে ষ্টেশনে লইয়া 'বুক' করিয়া দিলেই হয়।

সঙ্গে কোন কোন দ্রব্য লইতে হইবে তিন ভাই তার তিনটি স্বতন্ত্র ফিরিস্তী করিয়া পরস্পর মিলাইয়া লইতেছিলেন ···

বড়বাবু বলিলেন—পিন-কুশনটা আমাদের কারো ফর্দ্দেই নেই—ও একটা দরকার।

ছোটবাবু বলিলেন, -নিশ্চয়। ওরে—

তৎক্ষণাৎ লছমন আসিয়া দাঁড়াইল। ছোটবাবু বলিলেন,—একটা পিন-কুশন নে আয়, আর এক সেট পিন।

"যো হুকুম" বলিয়া পয়সা লইয়া লছমন পিন-কুশন আর পিন আনিতে গেল।

কাচের গ্লাস, তোয়ালে, ফাউণ্টেন পেন, কালির দোয়াত 'হাফ এ ডজন', বুরুশ (মাথার, জুতার আর দাঁতের) —তিনখানা করিয়া, স্নো, হেয়ার অয়েল, রেজর, টুথ পেষ্ট, পিয়ার্স' সোপ জুতার কালি প্রভৃতি খুচরা জিনিষ গুছাইয়া দিবার ভার বড় বউয়ের উপর আছে।

তিনি ফর্দ্দের সঙ্গে মিলাইয়া প্রত্যেকটি দফায় ঢেঁরা দিয়া দিয়া তিনটি এ্যাটাচিতে সমস্ত জিনিষ তুলিয়া দিয়াছেন ; ও-দিকটায় একরকম নিশ্চিন্ত হওয়া গেছে।

ইঁহাদের উদ্যোগ উদ্বেগ আড়ম্বর দেখিয়া মনে হয়, কোথাও যুদ্ধ বাধিয়াছে—ইঁহারা তিন ভাই সেই যুদ্ধে চলিয়াছেন, এবং বরফ ও আইসক্রীম সদ্যঃই সঙ্গে লওয়া যাইতেছে না বলিয়া ইঁহাদের মনস্তাপের অন্ত নাই :

মা আসিয়া বলিল,—সঙ্গে নিচ্ছিস কাকে ?

বড় পুত্র বলিলেন,—রামহরি যাবে।

—ও আবার নড়াচড়ার কাজে তেমন পটু নয়। শিল নোড়া দিয়ে ওকে বসিয়ে দাও, তিন-সের তেজপাতা পিষে তুলবে।

—সেখানে ত' ছুটোছুটির কাজ বিশেষ থাকবে না।

মা বলিলেন,—ঝিকে মসলা বাছতে বসিয়ে দিয়েছি। ধুয়ে বেছে দেবে।

বড়বাবু হাসিয়া বলিলেন,—ও-সব থাক, মা , ওতে ত' আমাদের শেষ পর্য্যন্ত চলবে না।

—ফুরুতে ফুরুতে সরকার-মশাইকে দিয়ে আবার পাঠিয়ে দেব। যে নোংরা ডালপালা সমেত জিরে-মউরীগুলো বিক্রী হয়, তা খেলেই অসুখ করবে।

ছোটবাবু বলিলেন,—কিছু মাখন নিলে হ'ত।

অমনি রামহরিকে ডাক পড়িল—

কাহারো ইচ্ছা এখন অপূর্ণ থাকিলে যেন একটি দুঃখের দহন আমরণ সহ্য করিতে হইবে…

রামহরি টাকা লইয়া কৌটার মাখন আনিতে গেল…তখন-তখনই আনিতে হইবে—বিলম্বে বিস্মৃত হওয়া আশ্চর্য নয়।

মেজবাবু বলিলেন,—বিছানার চাদর, রুমাল আর বালিসের অড়গুলো ধুয়ে এসেছে ত', মা?

মা বলিলেন,—এসেছে; বড় বৌমার হাতে দিয়েছি। বড় বৌমা ত' তার বায়না এখনো থামায়নি রে। সে যাবে বলছে।

বড়বাবু বলিলেন,—পরে। আমরা গিয়ে রকম-সকম বুঝি, তারপর লিখব; গিয়ে কিছুদিন থেকে আসবে।

—তোদের খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট হবে। ছোটর ত' বিছানার চাদর শোবার আগে ঝেড়ে না দিলে সে রাত্রে আর ঘুম হয় না। তুই কেন যাচ্ছিস—তুই থাক। বলিয়া গৃহিণী ছোট ছেলের দিকে আকুল নেত্রে চাহিয়া রহিলেন।

ছোটবাবু গম্ভীর হইয়া বলিলেন,—ঐ করেই ত' তোমরা মায়েরা বাঙালী ছেলের মাথা খাও…

যেন সে মাথা খাইবার চেষ্টাকে চিরকাল প্রতিবাদ করিয়া আসিয়াছে, অর্থাৎ আদর লইতে চাহে নাই।

গৃহিণী হাসিতে লাগিলেন; বলিলেন,—ভাল করে ভেবে দেখ—কিছু দরকারি জিনিষ নিতে ভুল হ'ল না ত'। সেখানে গিয়ে আবার মুসকিলে পড়বি।

তিন ভাই-ই সমস্বরে বলিলেন,—কিছু ত' মনে পড়ছে না।—

বড়বাবু স্বতন্ত্রভাবে বলিলেন,—সেবার—বলিয়া সুরু করিয়া তিনি যাহা বলিলেন, তাহার সারাংশ এই যে, সেবার শিলং-এ যাইয়া যাত্রার পূর্ব্বকালীন তাঁহারই দূরদর্শিতাবশতঃই কিছুমাত্র অসুবিধা হয় নাই, সেই সূত্রে বড়বাবু কিছু আত্ম-প্রশংসাও করিলেন—

কিন্তু তাঁর দর্পহারী ভগবান ছিলেন তাঁর মায়ের মনে, মা বলিলেন,—সানলাইট সোপ নিয়েছিস?

বড়বাবু জিব কাটিলেন—

মা বলিলেন,—ঐ দেখ…রুমাল তোর দু'বেলা কাচতে হয়—কি মুসকিলেই পড়ে যেতিস।

তৎক্ষণাৎ দু'ডজনের দাম দিয়া কেদারকে দোকানে পাঠান হইল।

এই ভুলটা ধরা পড়ায় তিনজনেই চিন্তান্বিত হইয়া বৈঠকখানায় নামিলেন—তবে এখনও ছত্রিশ-ঘণ্টা সময় হাতে আছে।

ব্যাপার যৎসামান্যই—

কিন্তু হুলস্থুল তোড়জোড় দেখিলে তাহা বুঝিবার উপায় নাই।

বাবু-তিনটির পিতৃদেব জীবিত নাই; জ্যেষ্ঠতাত আছেন এবং তিনি আজ একযুগ—বার বৎসরে একযুগ—ইংলণ্ডে প্রবাসী। পত্রযোগে তিনি কুশল সংবাদ

প্রদান এবং গ্রহণ করেন। পূর্ব্বের ডাকে তাঁহার যে পত্র পাওয়া গিয়াছে তাহাতে তিনি জানাইয়াছেন যে, তিনি পার্লামেণ্ট মহাসভার আসন প্রার্থী হইতেছেন।

এবং সেই পত্রেই, কি কারণে কে জানে, ভ্রাতুষ্পুত্রগণকে তিনি আদেশ করিয়াছেন—"পল্লীগ্রামে ফিরিয়া যাও।" সেখানে যাইয়া কি করিতে হইবে তাহার "প্রোগ্রাম অর্থাৎ খসড়া এবং ছক" তিনি গ্রামের ঠিকানাতেই পরে পাঠাইবেন লিখিয়াছেন।

কলিকাতা হইতে বিয়াল্লিশ মাইল দূরে মাননগর গ্রামে ইঁহাদের আদি নিবাস, ইঁহাদের পিতামহ সেই পল্লীভবনের মাটিতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি এবং তাঁহার পত্নীও চিতায় ওঠেন কলিকাতায়—কৃতী পুত্রের গৃহে কর্তৃত্ব করিতেন তাঁহারাই।

যাহা হউক, চিরকুমার এবং অত্যন্ত ধনবান জ্যেষ্ঠতাত বিলাত হইতে যে আদেশ করিয়াছেন তাহা অমান্য করা যায় না।

কলিকাতা কম্পিত করিয়া তাই এই আয়োজন আর দৌড়াদৌড়ি, আর তার সঙ্গে এই জগদ্ব্যাপী দুশ্চিন্তা।

তিন ভাই বৈঠকখানায় নামিয়া দেখিলেন, কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে পাঁচটা, আর ডাক্তার মনোজবাবু এবং 'বাস-ওয়ালা' ক্ষিতিনাথবাবু আসিয়া বসিয়া আছেন, প্রত্যহই তাঁরা সাড়ে-পাঁচটায়, যেখানেই থাকুন, এইখানে আসেন।

ডাক্তারের সাইকেল দেখিয়াই ছোটবাবুর মনে পড়িয়া গেল, তাঁহাদের সাইকেল তিনখানা 'ওভারহল' করিতে দোকানে দেওয়া হইয়াছে।

লছমনকে ডাকিয়া তৎক্ষণাৎ তিনি দোকানে পাঠাইয়া দিলেন; বলিয়া দিলেন, কড়া তাগিদ দিয়ে আসবি—কাল বিকেলেই চাই।

মনোজবাবু বলিলেন,—যাচ্ছ ত' আশা করে আর আড়ম্বরে করে, আবহাওয়া জান কি দেশের?

বড়বাবু চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন,—কেন, কি রকম আবহাওয়া সেখানকার?

--জানিনে তা, তাই জিজ্ঞাসা করছি; সে দিকে খোঁজে নিয়ে যাচ্ছ কি না! "লুক্ বিফোর ইউ লিপ।"

মেজবাবু বলিলেন,—মায়ের ভুল হবার যো নেই। তিনি সরকার-মশাইকে পাঠিয়ে খোঁজ নিয়েছেন, সেখানকার স্বাস্থ্য ভালই চলছে।

মনোজবাবু বলিলেন,—কিন্তু 'জাম" লোকের বিছানাতেই বজবজ করছে—বিছানা ত' কাচে না, রোদে দেয় না কোনো কালে!—আত্মীয়তা করে হঠাৎ তাদের বাড়ীতে গিয়ে উঠো না যেন।

বড়বাবু বলিলেন,—না, তা উঠবো না।

—কিছু ওষুধ নিয়ে যেও; পিত্তনাশক আর মৃদু-বিরেচক ওষুধ দিয়ে কুইনিনের কয়েকটা পিল করে দেবখন, নিয়ে যেও।

বড়বাবু বলিলেন,—তা যাবো।

—মশারি নিতে ভুলো না— পাড়া-গাঁয়ের মশা খুব সেয়ানা! খুব শক্ত মশারি নিও, যেন সুতো ঠেলে ঢুকতে না পারে।

বড়বাবু বলিলেন,—আচ্ছা।

—চানও করো গরম জলে, জল ফুটিয়ে।

বড়বাবু বলিলেন,—হ্যাঁ।

ক্ষিতিনাথ বলিলেন,—শুনেছি পাড়াগাঁয়ে এমন ইঁদুর আছে যার ন্যাজের রোঁয়ায় রোঁয়ায় বিছুটির বিষ—ন্যাজটা যদি একটিবার মানুষের গায়ে ছোঁয়াতে পেরেছে তবে গা চুলকেই মানুষ বেচারা মারা যাবে।

ডাক্তার মনোজবাবুর ডাক্তারী কথায় বড়বাবু অবোধের মতো সায় দিয়া চলিতেছিলেন—যেন বৃহত্তর ব্যক্তির নিকট বালক প্রথম শিক্ষালাভ করিতেছে—কোনো কথায় 'না' বলিলেই শিক্ষক চোখ রাঙাইবেন।

কিন্তু ক্ষিতিনাথবাবুর ইঁদুরের কথায় বড়বাবু হাসিয়া ধমক্ দিয়া প্রতিবাদ করিলেন; বলিলেন,—ধেৎ।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার অভিজ্ঞতা তোমাদের মতো নয়; তোমাদের পশ্চিম তো লিলুয়া আর পাড়াগাঁ বিদ্যেসাগর বাটী। আমার মামার শালার বাড়ী যজ্ঞিনগর—আমি গিয়েছি সেখানে, দেখেছি সে ইঁদুর। বর্ণনা নেও না আমার কাছে—সমস্ত গা কটাসে—পিঠের ওপর তিনটে কালো দাগ, ন্যাজ এই ঝাঁকড়া···তার চোখের তারা কপালের সিকি ইঞ্চি ওপরে—

মনোজবাবু বলিলেন,—তুমি কাঠবেড়ালী দেখেছিলে—তাদেরই পিঠের ওপর কালো তিনটে দাগ থাকে।

ক্ষিতিনাথ কিছুমাত্র দমিলেন না—বলিতে লাগিলেন,—তা ছাড়া বুনো বেড়াল আছে আবার একরকম, চিড়িয়াখানায় সে 'স্পিসিস্' নেই—তার থাবার এমনি জোর যে, কাঁটাল গাছের গুঁড়ি ধরে নাড়া দেয় আর এঁচড়গুলো বোঁটা ছিঁড়ে ধপ্ ধপ্ করে মাটিতে পড়ে।

বড়বাবু শুষ্কমুখে বলিলেন,—মানুষ মারে তারা?

—বাগে পেলে ছাড়ে কি! আমার মামার শালার আট বছরের ছেলে ন্যাড়াটাকে তাড়া করেছিল। বলিয়া ক্ষিতিনাথ বাঘ লাফাইয়া শিকারের উপর যেমন করিয়া পড়ে তাহারই একটা অক্ষম অনুকরণ করিলেন।

ছোটবাবু বলিলেন, বন্দুকটা নিতেই হবে।

চা আসিয়া পড়িল। এবং দু'-এক মিনিট অগ্রপশ্চাৎ গণনাথ, ক্ষেত্রমোহন, সতীভূষণ প্রভৃতি আসিয়া পড়িলেন, চায়ের সভায় নিত্য তাঁহারা উপস্থিত থাকেন।

গণনাথ চায়ের কাপ তুলিয়া লইয়া বলিলেন,—তোমার জ্যাঠামশায়ের উদ্দেশ্যটা কি?

ভ্রাতুষ্পুত্রগণ কি জবাব দিতেন তার ঠিক নাই।

তাঁহাদের হইয়া মনোজ ডাক্তার বলিলেন,—পার্লামেন্টে সিট্ না পেলে তিনি দেশে ফিরবেন; ইণ্ডিয়ায় এসে কলকাতায় তিনি বাস করবেন না, দেশের বাড়ীতে থাকবেন; ভাইপোদের দিয়ে আগে তার স্বাস্থ্য পরখ করে নিচ্ছেন; আর বাড়ীটাতে বহুদিন লোক বাস করেনি, তারও একটা ঠেকা আছে, তাই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে কিছুদিন মানুষ বাস করিয়ে নিচ্ছেন। শুনিয়া তিন ভাইয়ের তাক লাগিয়া গেল।

বড়বাবু বলিলেন,—তাই কি !

—কিম্বা এখানকার খবরের কাগজের হুজুগটা তিনি ধরে নিয়েছেন ; দেশের উপর তাঁর দরদ আছে যথেষ্ট জানি। বলিয়া সতীভূষণ পুনরায় বলিলেন, পল্লীগ্রামে নিরিবিলি আরাম কত ! তবে টেকা কঠিন, সহরের লোক পাড়াগাঁয়ে গিয়ে কেবল তুলনা করে কষ্ট পায়, তার অর্ধেক আত্মা পড়ে থাকে সহরে। তার অসুখ বিসুখে।

—কলকাতা থেকেই ডাক্তার চালান দেয়া যেতে পারে, এই ত' বিয়াল্লিশ মাইল রাস্তা ! আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক যে সংকটে আছে তার অংশ দেখেই অত ভয় পাওয়া ঠিক নয়। বলিয়া ক্ষেত্রমোহন হাসিতে লাগিলেন।

জ্ঞানচন্দ্র বলিলেন,—আমি একবার গিয়েছিলাম কলকাতার বাইরে একটা কাজে, অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম, সকাল বেলা পেঁছে বৈঠকখানায় বসে আছি, গৃহকর্ত্তাও আছেন, তিন চারটে ছেলে-মেয়ে এল, বোধ হয় আমাকেই দেখতে ; কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করলেন, ওরে পিলু খেয়েছিস্ ? তারা কেউ বললে, একটা খেয়েছি, কেউ বললে, দুটো খেয়েছি। "এখন মুড়ি খেগে যা"—বলে কর্ত্তা তাদের ভেতরে পাঠিয়ে দিলেন।

ছোটবাবু বলিলেন,—আপনি জ্বর নিয়ে ফিরে এসেছিলেন বুঝি ?

-হ'ত, কিন্তু দৈবাৎ বেঁচে গিয়েছিলাম। কর্ত্তা বললেন, আপনি চান করবেন না, আমি বললাম, চান না করে আমি খেতে পারিনে। চান করতে গেলাম, খুব ঘটা করেই যাওয়া গেল ; ভদ্রলোক তাঁর চাকরটাকে আমার সঙ্গে দিলেন। আমার টাওয়েল আর ধুতি আর চটি বগলে করে সে আমার সঙ্গে এল। পুকুরের ঘাটে দাঁড়িয়ে খানিক কি ভাবলাম জানিনে, জল টল্‌টল্ করছে দেখলাম, আর গা সির্‌সির করছে বোধ হ'ল, কিন্তু জলে পা-নামাতেই তলা থেকে কি উঠতে লাগল জানিনে, জলে নামার নিষেধ জলের তলাতেই ছিল। প্রথম জলের নীচের একটা বিজ্‌বিজ্ শব্দ হ'ল, তারপর খানিকটা কালো রংএর পাঁক উঠে জলটা ঘুলিয়ে গেল, আর এমন একটা গ্যাঁজা-গন্ধ নাকে এল।

বলিয়া জ্ঞানচন্দ্র নাক সিট্‌কাইয়া রহিলেন।

—তারপর ?

—চান করা আর হ'ল না পরের ট্রেনেই দে দৌড়।

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, জলের কথায় আর একটা কথা মনে পড়ে গেল, পাড়াগাঁয়ে আর একটি উৎপাত আছে।

ছোটবাবু—কি উৎপাত ?

—তোমাদের বাড়ী কি নদীর ধারে ?

—হুঁ।

—জলে নেম না খবরদার ! এক চাষী কোথায় যেন পাট ধুয়ে জল থেকে উঠে দেখে একটা জোঁক তার নাইয়ে এক মুখ লাগিয়ে কোমর বেড়ে ও-মুখটাও নাইয়ে লাগিয়াছে, আর এত রক্ত খেয়েছে যে, লোকটা অল্পক্ষণ পরেই অজ্ঞান হ'য়ে গেল।

মেজবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—ড্যাঙায় ওঠে না তারা।

—না।

সতীভূষণ বললেন,—ঘাসে ঘাসে বেড়ায় এক রকম জোঁক ; তারা অত মারাত্মক নয়, গরু-বাছুরের নাকে থাকে খুব।

মনোজ ডাক্তার বলিলেন, বেতো-রুগীর ব্যথার জায়গায় জোঁক লাগায় শুনেছি, সে বোধ হয় ঐ জলের জোঁক, যত টানো তত সে লম্বা হবে।

—আহা, কেন ভয় দেখাচ্ছ ওদের ! বলিয়া ক্ষিতিনাথ হাসিতে লাগিলেন।

বড়বাবু বলিলেন, না না ; আর কি কি বিষয়ে সাবধান হ'তে হবে, যার যা জানা আছে বলো। বলিয়া বড়বাবু উপদেশের জন্য সকলেরই মুখের দিকে চাহিলেন।

গণপতি বলিলেন, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা ক'রো। তবে সেখানকার মানুষ কেমন তা কারুরই জানা নেই, তারা উল্টে কোৎকা না হ'য়ে ওঠে এইটে দেখো।

ছোটবাবু বলিলেন,—মানুষকে আমাদের ভয় নেই।

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন, তোমরা এগোও, আমরা সদলবলে গিয়ে পড়ব একদিন শিকার খুব মেলে শুনেছি, বালুহাঁস, চকা, জংলা-শুয়োর।

ছোটবাবু বলিলেন,—বন্দুক আমি নিচ্ছি।

মনোজ ডাক্তার বলিলেন, থার্ম্মমিটার নিয়েছ ত' একটা ?

—ইস্ !—কেদার ? লছমন ? রামহরি ? লছমন ছিল না।

কেদার আর রামহরি দুদিক হইতে দৌড়াইয়া আসিল।

ছোটবাবু বলিলেন,—মাকে বল্ গিয়ে, একটা থার্ম্মমিটার নিতে হবে।

বড়বাবুর সেই শিলং যাত্রার পূর্ব্বকালীন দৃষ্টি-কুশলতা নাই। তিনি মনস্থ করিলেন, আর একবার তিনজনে মিলিয়া ধীরচিত্তে ভাবিয়া দেখিতে হইবে।

চা-পান শেষ করিয়া এবং 'বিভু'য়ে' উহাদের খুব সাবধানে থাকিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়া বন্ধুগণ প্রস্থান করিলেন।

রাত্রে বড়বৌ বড়বাবুর কাছে ধন্না দিয়া ফল পাইলেন না, তাঁর আয়ত চক্ষু দুটি জলপূর্ণ হইয়া রহিল, এবং বড়বাবুর রাক্ষস-প্রকৃতি জোঁকের গল্পে তিনি কর্ণপাতও করিলেন না।

বড়বৌ, বড়বৌ হইলেও তাঁর বয়স মাত্র সপ্তদশ বৎসর।

পরিচ্ছেদ—২

"লোক্যাল" ইন্দ্রালয় ইষ্টকালয়ে রাজমিস্ত্রী এবং উঠানে মজুর লাগিয়াছে দেখিয়া অভয় ভিতরে গেল ; দেখিল, একখানি বহুমূল্য পালঙ্কে বার্ণিস্ লাগান হইতেছে। দেখিয়া অভয়ের ঠোঁটের কোণে একটু হাসি ফুটিল, কিন্তু হাসি সেটা নয় ; হাসির আভা থাকে, প্রবাহ থাকে, বিস্তৃতি থাকে ; কিন্তু অভয়ের ঠোঁটের সেই আন্দোলনে সে সব কিছু নাই, যেন ভিতরের একটি অনির্ব্বচনীয় ভাব-নির্গমের একটা নির্ব্বিকার পথ সেটা ; বিকার যা তা ভিতরে।

অভয়ের পিতা অঘোর প্রথম বয়সে হাসিয়াছিল, তাহাকে হাসি বলা যায়। সুকুমার ঋজু স্বচ্ছ রেখাপাত করিয়া সে হাসি ফুটিত, আয়াসহীন অথচ প্রচুর, সে হাসি বিকশিত হইয়া মানবাত্মার চিরন্তন সন্তোষের মাঝে একটি কল্যাণের মূর্ত্তিতে মুদ্রিত হইয়া যাইত। জগৎলক্ষ্মীর হাসি সেই হাসির অঙ্গে প্রতিফলিত হইত; সে হাসিতে কপট কলাবত্তা ছিল না, কিন্তু উন্মোচিত বক্ষের অহৈতুকী উদারতা ছিল।

সে হাসি তার প্রৌঢ়াবস্থায় বক্র হইয়া উঠিয়াছিল। হাসির শৈশব আছে, যৌবন আছে, বার্দ্ধক্য আছে; কিন্তু হাসি যখন অসহায় হইয়া আতঙ্কে বাঁকিয়া চুরিয়া দেখা দেয়, হাসির তখন মুমূর্ষু অবস্থা, অঙ্গুরীর মতো চতুর্দ্দিকে নিরন্ধ্র কারায় বেষ্টন করিয়া অন্ধকার যখন দীপশিখাটিকে বায়ুর তীর মারিয়া মুহুর্মুহুঃ আঘাত করিতে থাকে, এ হাসি তখনকার সেই দীপশিখাটির মতো, মৃত্যুর দিকে চলিয়াছে।

চিতার অঙ্গারে একবিন্দু অগ্নির মতো নির্জীব এবং করুণ একটি হাসি পুত্রকে প্রদান করিয়া অভয়ের পিতা স্বর্গারোহণ করিয়াছিল—ঐটিই ছিল তার উন্মথিত জীবনের সার বস্তু।

পিতার দেওয়া হাসিটি অভয় ধারণ করিয়াছে। এই হাসিটি বহুদিনের, প্রায় পঁচিশ বৎসরের পুরাতন। অভয়ের পিতা সত্তর বৎসর বয়সে পরলোকগমন করে; কিন্তু নিজের এই দীর্ঘায়ু করুণাময়ের শুভ-দান বলিয়া আদরের চক্ষে অঘোর তাহাকে দেখে নাই। অভয় দেখিত কেবল বাপের মুখের তীব্র হাসির ভঙ্গীটি, যমের কর্ণে কুণ্ডলের দ্যুতির মতো ভয়াবহ সেই হাসি।

এরা চাষী পরিবার। মাটিই ইহাদের লক্ষ্মী, জননী। জননীর স্তন্যের মতো মাটির বুকের শ্যামল রস-উৎসই উহাদের জীবন, যখন আনন্দ আসে তখন মাটির স্বর্ণোজ্জ্বল মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া আসে—যখন লুটাইতে হয় তখনও এই মাটির উপরেই বুক চাপিয়া লুটায় তারা, মাটি তাদের চোখের জল, বুকের আগুন শুষিয়া লয়। ত্রাসে অন্ধকার দেখিয়া চোখের পাতা যখন অবশ হইয়া বুজিয়া আসে তখনও মাটির জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তিরই তারা ধ্যান করে।

জগন্মাতাকে মনে করিতে তাদের মাটিকেই মনে পড়ে। দশভুজা প্রতিমা মৃত্তিকার, কালী, তিনিও মাটির, সব একাকার—মাটি ছাড়া আর কিছু নাই।

প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিলে মাটির রূপে স্বর্গ আলোকিত হয়; দশভুজার দশহস্ত দশদিকে প্রসারিত হয়। কিন্তু সেদিন আর নাই, সেদিনের কথা ভাল করিয়া স্মরণই হয় না; মাটির ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইয়া তার রুক্ষ মূর্ত্তিই দিগন্ত পর্য্যন্ত ধ্বক্ ধ্বক্ করিতেছে, তাহাতে প্রাণ নাই।

অভয়ের পিতা পৃথিবীর এই মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া কেমন করিয়া একটু হাসিত, দেখিয়া লোকে ভয় পাইত; কিন্তু অভয় মানুষকে ভয় দেখাইতে বাপের স্মরণীয় হাসিটি আপন ওষ্ঠে স্থাপিত করে নাই, ভিতর হইতে সে হাসি আপনিই আসিয়াছে।

বাপ যখন মারা যায় তখন অভয় বুঝিত সবই; পয়সার অভাবে রোগীর চিকিৎসা হয় নাই, রোগী উপযুক্ত পথ্য পায় নাই।

অভয় শুনিয়াছিল, বাবুরা তিনভাই তাঁহাদের পল্লীভবনে আসিবেন।

যে লোকটি পালঙ্ক বার্ণিশ লাগাইতেছিল সে একবার মুখ ফিরাইয়া অভয়কে দেখিল; তারপর নিজের কাজের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল,—বস, শুয়ে একটু ঘুমোবে কেবল, তারই জন্যে খরচ কত, তার তোয়াজ কত।

অভয় চৌকাঠের উপর বসিয়া বলিল,—হবে না। ও'রা ভাবেন কত।

অভয়, গুজব নয়, ভুক্তভোগীর মুখেই শুনিয়াছিল, বাবুরা কলিকাতায় থাকিয়াও পল্লীর কথা ভাবিয়া একদিকে গলদ্‌ঘর্ম্ম অন্যদিকে দিশেহারা হইয়া যান—হামেসাই তাঁদের বিশ্রামের প্রয়োজন হয়।

রঙের মিস্ত্রী বলিল,—ভাবেন বই কি। মাথা আছে ভাবেন; পা থাকলে ছুটতেন, হাত থাকলে লুফতেন···

—কি?

—কদলী। বলিয়া লোকটি অভয়ের দিকে ফিরিয়া চাহিয়া একটু মুচ্‌কি হাসিয়া বলিল,—ভাল করে বস। তামাক খাই।

কিন্তু অভয়ের আর বসিবার ইচ্ছা রহিল না। বাবুদের প্রতি তার বিশেষ পক্ষপাতিত্ব না থাকিলেও এমন অন্ধ-আক্রোশ নিশ্চয়ই ছিল না যে, প্রকাশ্যে তাঁহাদের উদ্দেশ্যে সে কদলী প্রদর্শন করিতে পারে। তার ভদ্র-অন্তরের কাছে বেতনভোগী মিস্ত্রীর এই অকারণ কটূক্তি অমার্জনীয় অপরাধ বলিয়া মনে হইল, বলিল,—তুমি খাও, আমি আসি। বলিয়া সে উঠিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

—চল্লে? এই গ্রামেই বুঝি তোমার বাড়ী?

—হুঁ। তোমার? আমার বাড়ী গোয়াড়ী। এই জঙ্গলে আমায় পাঠিয়েছে খাটে বার্ণিশ আর কাঠে রং করতে! তাতেই ত' রাগ করছি। না আছে খাবার দিশে, না আছে শোবার সুখ। মশা কত! দিনমানেও—সত্যি সত্যিই উঠলে যে হে!

—হ্যাঁ, যাই। বাবুরা আসছেন কবে?

মিস্ত্রী মুখে কিছু বলিল না; রং-মাখা হাত নেড়ে সমেৎ উল্টাইয়া দিশেহারার ভঙ্গী করিল···তারপর জিজ্ঞাসা করিল,—এ বাড়ী কতদিনের জান?

—একশ' বছরের হবে।

দৃষ্টি ঊর্দ্ধদিকে একবার উৎক্ষিপ্ত করিয়া মিস্ত্রী বলিল,—সেকেলে কাঠ কিনা—কড়ি বরগা ঠিক আছে। এ বাড়ীতে লোক ঢোকেনি কতদিন?

—বছর দশ-বার হবে।

এবার যে বড় দয়া হ'ল! গরজ আছে বুঝি! বলিয়া চতুর ঠাট্টার সাড়া না পাইয়া মিস্ত্রী উঠিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল, আগন্তুক চলিয়া গেছে।

বাবুদের আসিবার কথাটাই ভাবিতে ভাবিতে অভয় বাড়ীর দিকে চলিল··· কাহারও দরদ কেহ যাচিয়া চায় না, কেহ কাহারও উপকার যাচিয়া করিতে আসে না।

অভয় হাঁটিতে হাঁটিতে যাইয়া নদীর ধারে দাঁড়াইল। দক্ষিণে বামে দুইদিকে ও তার সম্মুখে যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর ব্যাপিয়া ব্যর্থ কৃষিকার্য্যের অখণ্ড শূন্যতা

ধু ধু করিতেছে···যে ফসল জন্মিয়াছিল তাহা পণ্ডশ্রম করিয়া কাটিবার প্রয়োজন হয় নাই ; গরু লাগাইয়া দিয়া লোকে তাহা কাঁচাই খাওয়াইয়া দিয়াছে—ভোজনাবশিষ্ট শুষ্ক ডাঁটা আর লতা ক্ষেত্রের উপর লুটাইয়া আছে—অভয়ের চোখ ছলছল করিতে লাগিল—পাছে আশাহত সন্তানের সঙ্গে চোখোচোখি হইয়া যায় এই ভয়েই যেন ভূমিলক্ষ্মী সর্ব্বাঙ্গের উপর আবরণ টানিয়া দিয়াছেন।

কিন্তু আগে এমন ছিল না—ভূমিলক্ষ্মীর মুখ লুকাইবার হেতু ঘটিল না··· সর্ব্বসম্পদের পুরোভাগে আর সর্ব্বসুখের সমষ্টির কেন্দ্রে তিনি প্রধানতম স্থানটিতে অধিরোহণ করিয়া বিরাজ করিতেছে।

বাল্যকালে নদীর ধার—এপার আর ওপার—তাদের অতি প্রিয় ছিল

এখনও হাতে কাজ নাই, তখনও হাতে কাজ থাকিত না। অভয় ও-পারের দিকে চাহিয়া রহিল।

ওই খানটিতে জলের ধারে বরাবর উজান দিকে রসিকপুরের বাঁকের মুখ পর্যন্ত ঝাউয়ের বন ছিল, বর্ষার জলের কাদা গাছের সরু ডাঁটায় শুকাইয়া থাকিত···ঘাটে বাঁধা পরের নৌকায় অকারণেই নদী পার হইয়া সেই ঝাউ বনে তারা বিচরণ করিত ; তার ভিতর লুকোচুরি খেলা বেশ চলিত···সিরু সিরু শব্দটা যে উঠিত, কোথাকার একটা ম্রিয়মাণ স্বরের সঙ্গে তার মিল থাকিত···নদীর ধারে বসিয়া জলের স্রোতের ভিতর হাঁটু পর্যন্ত ডুবাইয়া দিয়া বসিয়া থাকা—অশেষ কৌতুক তাতে···স্রোতের টানে পায়ে টানু লাগিয়া রক্তে যেন সুড়সুড়ি লাগিত···ভাবিতে ভাবিতে আসিয়া কোথাকার আবর্জনা পায়ের সঙ্গে জড়াইয়া আটকাইয়া পড়িত···একটা লম্বা খড় পা বেড়িয়া দুই মুখ স্রোতের দিকে ভাসাইয়া দিয়া থরুথরু করিরা কাঁপিত। সে ঝাউবন নাই—

অভয়ের মনে হইল পল্লীর ক্রোড় নিঃস্ব করিয়া যত কিছু সামগ্রী একে একে বিচ্যুত হইয়া গেছে, তাহাদের সকলের বড় বাল্যকালের সেই ঝাউবনটি।

স্মৃতি কত আসে, কিন্তু তারা নিরীহ ; নির্জীব বাহু বাড়াইয়া আলিঙ্গন করিতে চায়—প্রেতমূর্ত্তির সে মূক মুখে তার ভাষা নাই—মনকে সে বিচলিত করে না।

তখন কত ইচ্ছা ছিল ; কিন্তু ইচ্ছার কল্পলোক এখন অন্ধকার, অচঞ্চল—যখন সুখের দেবতা মৌনাবলম্বী হইয়া একেবারে মুখ ফিরান নাই, তখন কৈশোরের স্মৃতি এতটুকু হাসির আকারে, গানের দুটি কলির সুরে চমকু দিয়া যাইত—একটি রেখায় জীবনের এই দুটি যুগ যুক্ত ছিল—উষার সঙ্গে অপরাহ্ণের যেমন দৃষ্টির যোগ থাকে। তখন সে স্মৃতির শক্তি ছিল।

কিন্তু আজ তার মূল্য নাই ; মৃতের আত্মা যেমন দূর হইতে পরিত্যক্ত দেহটাকে দেখে তেমনই নিরর্থক দৃষ্টি লইয়া মাঝে মাঝে স্মৃতির জগতে চিত্ত ধাবিত হয়। সেদিন আবার যদি ফিরিয়া আসে ! মনে হইতেই অভয় শিহরিয়া উঠিল···সেই রৌদ্র আর নদীতীর চিরদিন নীরব ; হঠাৎ সেই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া মানুষের হাহাকার নদীর দুই তীর হইতে নদীর বুকে আছড়াইয়া পড়িল···তার নির্গমের পথ নাই—উপরে আকাশ, নিম্নে মাটি—মধ্যবর্ত্তী স্থানটি পরিপূর্ণ করিয়া সেই হাহারব অভয়ের চক্ষের সম্মুখে আবর্ত্তিত হইতে লাগিল—

অভয়ের মনে হইল, সেদিন ফিরিয়া আসিলেও তার নাগাল পাওয়া যাইবে না —মধ্যে একটি শুষ্ক হাহাকারের মরুভূমি রহিয়াছে। প্রকৃতি গতায়ুঃ—তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মনে হয়, মৃতের ছবি দেখিতেছি ; সে-ই অবয়ব ; কিন্তু তাহার সঙ্গে হৃদ্যতা চিত্তবিনিময় ঘটে না—

ইহার স্বকীয়ত্ব আর সৌন্দর্য্যের অনুভূতি মনকে তখন বিজড়িত করিত না-- করিত ইহার সাহচর্য্যের পরিবেশন ; কিন্তু ভূমিলক্ষ্মীর সঙ্গে সঙ্গে এ-ও কৃপণ হইয়া অমৃতের পাত্রপুট টানিয়া লইয়াছে—সেকালের সঙ্গে একালের গ্রন্থি তখনই কাটিয়া গেছে—ইহার আন্দোলন আর ধ্বনির সঙ্গে একাকার হইবার পথ মানুষ খুঁজিয়া পাইতেছে না।

যেদিন আকাল আসিল, সেদিন সে কেবল অতৃপ্ত ক্ষুধারই যন্ত্রণা দিল না — অন্তরস্থ আশ্রয় বস্তুকে সে কাড়িয়া লইল—যে ধারাবাহী চিন্তায় থাকিয়া থাকিয়া শিহরণ ফুটিত তাহা আগে আলোড়নে পল্বলের মতো কর্দ্দমাক্ত, পরে শুকাইয়া কঠিন হইয়া গেল—তার ফাটল দিয়া এখন বাসুকীর বিষের জ্বালা ওঠে।

অভয়ের বয়স এই বত্রিশ—

এই বয়সেই সে পুরাতন জগতের দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেছে। কেন এমন ঘটিয়াছে এ প্রশ্নের শেষ উত্তর কোথাও বোধ করি আছে ; বালকে যেমন করিয়া ধুলা ছিটায়, একটা অস্বাভাবিক অস্পষ্টতা অদৃষ্ট তেমনি করিয়া ছিটাইয়া রাখিয়াছেন ; তাহার উর্দ্ধে প্রশ্নের সমাধান হয় তো আছে—

পূর্ব্বপুরুষগণের কর্ম্মক্ষেত্র ছিল, স্বার্থ ছিল, অভিমান ছিল, অহঙ্কার ছিল, - এই বিস্তীর্ণ পশ্চাৎপটের উপর তাঁরা লীলা করিয়া গেছেন—

কিন্তু আসল কথা এই যে অভয় সংসারে যখন প্রবেশই করে নাই—দ্বারের নিকট হইতেই বিতাড়িত হইয়াছে—

তখনও বিপদ আসিত ; কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন জীবনের পথে প্রাচীরের মতো নয়—একটি অকিঞ্চিৎকর উপলসৃষ্ট বাধার মতো— আর এখন ?

অভয় চোখের উপর কাপড় বুলাইয়া কি মুছিল কে জানে, কিন্তু চোখে তার জল ছিল না।

পথে দেখা কালোশশীর সঙ্গে—

ধড় বড় পা ছোট কালোশশী তড়্‌বড়্‌ করিয়া চলিতেছিল ; অভয়কে দেখিয়া সে দাঁড়াইল ; স্ফূর্ত্তির সহিত বলিল,—চলেছি রামমোহনের কাছে ; গেট্ করবো —তার দুটো বাঁশ চেয়ে রেখে আসিগে।

অভয়ের চোখে বিস্ময় দেখিয়া কালোশশী না থামিয়াই বলিল,—বাবুরা তিন ভাই আসছেন যে।

অভয় বলিল,—জানি, শুনেছি।

—জানবে বৈ কি, না জানার ত' কথা নয়। বলিতে বলিতে টপ্ করিয়া অভয়ের হাত ধরিয়া কালোশশী বলিল—এস, এস, এ আমারও কাজ, তোমারও কাজ। বলিয়া অভয়কে সে গন্তব্য স্থানের দিকে টানিতে লাগিল।

অভয় বলিল,—যাচ্ছি, ছাড়।

কালোশশী তৎক্ষণাৎ তার হাত ছাড়িয়া দিয়া বলিল,—এখন পেলে বাঁচি ; রামমোহনটা যে কঞ্জুষ !

—তোমার নিজেরও ত' ঝাড় আছে।

কালোশশী চোখ মট্‌কাইয়া বলিল,—তুমিও যেমন ! দাতার ডাব, বাঁখলের বাঁশ। ··· যা শত্রু পরে পরে।

অভয় কালোশশীর শত্রু-বিদায়ের সঙ্গী হইল বটে ; কিন্তু তেমন উৎসাহ তার দেখা গেল না ; বলিল,—দুটো টাকা দেবে ধার ?

—দেব ; দিন বেছে যাত্রা আর লোক বেছে উপকার আমি করিনে। তবে সে পরের কথা পরে হবে।

দু'চার পা যাইয়াই অভয় বলিল,—আমার যে এখনই চাই।

—এ খ-ন ই ! চলো দিচ্ছি গিয়ে—এই বাঁশের কথাটা বলে যাই। তুমি না হয় ফেরো, বাড়ী হ'য়ে এস গে।

কালোশশী নিতান্ত পরিচিত লোক, অভয় ইঙ্গিতটা তাই এক নিমেষেই বুঝিয়া ফেলিল ; বলিল,—কিছু পাট দিতে পারি—আর কিছু নেই।

কালোশশী যেন হঠাৎ আহত হইয়া চমকিয়া উঠিল ; পরম দুঃখের সঙ্গে বলিল, —কেবল তোমার নয় কারো ঘরেই কিছু নেই, রইল না। ···এ বছর পাট কেনা আর টাকা জলে ফেলা সমান হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। ···আর কিনবই বা কত ! কিনে রাখিই বা কোথায় !·· গাঁয়ের পনর আনা লোক কেবল পাটই আনছে মাথায় করে করে। তা তুমি যাও, পাট পাটই সই। বলিয়া দাক্ষিণ্যের একশেষ দেখাইয়া কালোশশী অভয়ের দিকে চাহিয়া ছাঁটা গোঁফ নাকের দিকে তুলিল ; তারপর সুমধুর একটু হাসিল।

এত সংক্ষেপে টাকা পাওয়া যাইবে অভয় তা ভাবে নাই ; সে-ও কালোশশীর মুখের দিকে চাহিয়া সত্যিকার হাসিই একটু হাসিল—এবং নিজের হাসি দেখিয়া সে নিজেই বিস্মিত হইয়া গেল।

বাঁচিবার আকাঙ্ক্ষার একাগ্রতাই পশুর যথার্থ পরিচয়। কল্যকার অনাহার যন্ত্রণা অভয়রা ভুলিয়া যায় বলিয়া মনে হয়, কিন্তু তা ভোলে না ; গত দিনটি পাথরের মতো পশ্চাতের পাথারে তলাইয়া যায়। তাহাকে চোখের সম্মুখে উত্তোলিত করিয়া পুনরায় নিরীক্ষণ করিতে কেবল সাহস তাদের নাই। শুধু বর্ত্তমানই তাদের কাছে সজীব, সে-ই আসিয়া 'দাও' বলিয়া হাত পাতিয়া দাঁড়ায় ; যে-কোনো দক্ষিণা দিয়া তাহাকে বিদায় করিতে পারিলেই ভার নামিয়া যায়। স্বাভাবিক মানুষের মতো দিকে দিকে সে তার সত্তার শিখা প্রধাবিত করিয়া দেয় নাই ; একটি মাত্র বিন্দুর উপর সকল রশ্মি নিপতিত হইয়া তাহাকেই অসাধারণ উত্তপ্ত আর উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। আর সব শীতল ও অন্ধকার।

মরিব না, বাঁচিব। এই সংস্কারের প্রভাব দিন দিন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছে বলিয়াই ওদের জীবনের গতি বাহির হইতে এমন সহজ আর সরল মনে হয়। যাহা হইলে হইতে পারিত তাহার একটি প্রতিবিম্ব বাষ্পাচ্ছন্ন দর্পণের অভ্যন্তরস্থ ছায়ার মতো অস্পষ্ট চোখে পড়ে। ক্রিয়ারত সাবলীল যে

বস্তুটিকে জীবন বলা হয় সে এমন কারাবরুদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে। ইহা আশ্চর্য্য বটে ; তার আর সব অভিব্যক্তি নিদ্রিত ; কেবল প্রহরীর দৃষ্টির মতো একটি চৈতন্য একই দিকে নিবদ্ধ হইয়া আছে। আজিকার দিনটি।

চিন্তার অসাড়তা আনিয়া দিয়া প্রকৃতি তার উপকার করিয়াছে। উদ্বুদ্ধ মস্তিষ্ক জীবনের এই বিভীষিকা সহ্য করিতে পারিত না ; সম্বিৎ একই দিকে একাগ্র হইয়া তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। সে আত্মহত্যা করে না।

অতি কষ্টে কালোশশীর বাঁশের যোগাড় হইয়াছে ; বাঁশ কাটিয়া ঝাড়েই রাখিয়া আসিয়াছে, দু'তিন জন লোককে ধরিয়া কঞ্চি ছাঁটিয়া বাঁশ ঝাড়ের ভিতর হইতে টানিয়া বাহির করিতে হইবে।

অভয় যখন ত্রিশ সের পাট লইয়া কালোশশীর বাড়ীতে উঠিল, তখন বেলা দেড়টা আর কালোশশীর মেজাজ প্রফুল্ল হইয়া আছে।

কিন্তু পাট দেখিয়া সে মুখ সিটকাইল ; বলিল, তোমার পাটের "কোয়ালিটি" খারাপ হে। আঁশে "প্লেজ" কই ! দালালে সঙ্গে সঙ্গে "রিজেক্ট" করে দেবে। সাতসিকের বেশী দিতে পারিনে।

কালোশশী ভাবিয়াছিল, খানিক টানা-হেঁচড়া করিতে হইবে, কিন্তু অভয় সঙ্গে সঙ্গেই বলিল, তাই দাও, সাতসিকেই দাও।

কালোশশী অবাক হইয়া গেল ; মনটা তার তিরতির করিতে লাগিল। দেড় টাকাতেই দিত বোধ হয়। বলিল,—ডাঁহা লোকসান হইয়া গেল, আনা চেরেক ত' বটেই। বলিয়া কিছুক্ষণ ভ্রুভঙ্গী করিয়া থাকিয়া যেন লোকসানটা সে সহ্য করিয়া লইল। তারপর, কেবল এই বৎসরের জন্যই পুরাতন টিন দিয়া নূতন নির্ম্মিত পাটের গুদামের দিকে চাহিয়া সরল হাস্যের সহিত কালোশশী বলিল,—যাক গে, আর ভাবি কেন !

সাতসিকার চারসিকির দরুণ পুরা একটি টাকা আর তিনসিকির দরুণ কয়েকটি রেজকি দিয়া কালোশশী অভয়কে বিদায় করিল, কিন্তু দেখিয়া লইলেই অভয়ের চোখে পড়িত, রেজকির একটি সিকি খারাপ।

পরিচ্ছেদ—৩

বাবুরা আসিয়েছেন।

বাড়ীর চারিদিকেই বড় বড় গাছ ; তাদের হরিৎ-আলিঙ্গনের মাঝে অট্টালিকার শ্বেত-মূর্ত্তিটা কতকটা নির্লজ্জ দম্ভের মতো দেখাইলেও ফুটিয়াছে বেশ।

এদিককার আয়োজন, অভয় জানিত না, কালোশশী বলিল, "কম্‌প্লিট" গেট প্রস্তুত। বাবুদের "বেয়ারা" আর বসিবার চেয়ার আসিয়া পৌঁছিয়াছে। বেতের তিনখানি, তার উপর প্রায় শোয়া যায়। দুই পা দুইদিকে টানা টানা করিয়া মেলিয়া দিবার সুবন্দোবস্ত আছে : ছোট-খাট তিন চারিটি মানুষকে তার

আয়তনের ভিতর ডুবাইয়া রাখা যায়। কালোশশী বেতের বয়ন-কৌশল দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। টিপিয়া দেখিল, নোয়ান কঠিন।

তারপর কাপড় লাগান চেয়ার, তাতেও অর্ধেক শোয়া যায়। ইচ্ছা করিলে দোল খাওয়াও যায়।

অভয় বলিল,—বাবুরা কেবল শুতেই আসছেন।

—না, না; বলিয়া কালোশশী প্রতিবাদ করিয়া তৃতীয় প্রকারের চেয়ার দেখাইয়া দিল, যাহার উপর কেবল বসা যায়, পিঠ খাড়া বলিয়া শুইবার উপায় নাই। তারপর বলিল,—বাবুরা শুয়ে-শুয়ে যে মেহন্নৎটা করে, তোমার আমার ভুঁই চষার চেয়ে তা আকাশপ্রমাণ বেশী।

—তা হবে।

—তা-ই হয়েছে। মজুর আর বাবুতে তফাৎ ত' ঐখানেই। তুই সারা দিন খেটে ছ'-আনা পাবি, বড় জোর সাত আনা, বাবুরা মাথা খাটিয়ে হাকিমের সামনে একটি কথা বলে দেবে, তার দাম দিতে হবে তোকে চারটি টাকা।

কালোশশীর মনে মহকুমার বড় উকিল নারায়ণবাবুর চিত্র উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; তিনি কথা বলেন কম, দু'টি কি একটি; তাতেই কিন্তু মামলা ফয়সালা হইয়া যায়। সে কথার নড়চড় নাই। কালোশশী দেখিয়াছে, নারায়ণবাবু ঐরকম একটা চেয়ারে প্রায়ই শুইয়া থাকেন। শায়িত মানুষের ওপর অভয়ের মতো কালোশশীর তাই অশ্রদ্ধা নাই। অভয়ের ছোট উকিলের শুইবার অবসর নাই।

কালোশশীও আগে চিনিত না এমন অনেক জিনিষের সঙ্গে বাবুদের "বেয়ারা" রামহরি তাহাদের পরিচয় করাইয়া দিল। গ্যাস ষ্টোভ, ইকমিক কুকার, হ্যাট-র‍্যাক, টয়লেট টেবিল, শেভিংষ্টিক, সলটেড্ বাটার, এবং আরো অনেক।

কিন্তু কালোশশী তাহাদের একটি নামও দুই মুহূর্তের বেশী মনে রাখিতে পারিল না।

তার অবাক মুখের দিকে চাহিয়া রামহরি পুনশ্চ বলিল, বাবুদের টিফিনে খাবার পাঁউরুটী ইংরেজের দোকান থেকে রোজ ডাকে আসবে।

কালোশশী এমন কি অভয়ও এ শুভ-সংবাদটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল। পুলকে মুখ উজ্জ্বল করিয়া কালোশশী অভয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বাবুরা যেন তাহারই স্বত্বকৃত সম্পত্তি? সম্পত্তির শ্রীবৃদ্ধি দেখ!

কালোশশী জিজ্ঞাসা করিল,—বাবুরা কি সস্ত্রীকই আসবেন?

বাজে লোক হইলে এই প্রশ্নে দাঁতে জিব কাটিত, কিম্বা কৌতুক করিত; কিন্তু বাবুদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া রামহরির চিত্তসংযম আসিয়াছে; শুধুই বলিল, না, তাঁরা আসবেন না।

শুনিয়া গ্রামের অযোগ্যতা সম্বন্ধে অভয়েরও সন্দেহ রহিল না, এবং কালোশশীর সেদিনের তদ্বির ঐখানে শেষ হইল।

কালোশশী উপযাচক হইয়া কেন এত সমারোহ করিতেছে তার কারণ মানুষের তেমন চোখে পড়ে না। কেহ তাহাকে সে ভার দেয় নাই; নিজের স্কন্ধে অভ্যর্থনার দায়িত্ব লইয়া বাবুদের প্রীতিলাভ-করিয়া বিশেষ লাভবান হইবে এ সম্ভাবনাও নাই—তবু সে মাতিয়াছে।

বাবুদের সমকক্ষ সে কোনো দিক দিয়াই নয়। বাবুরা ছাড়া-কাপড় যাহার উপর ফেলিয়া রাখেন, সে বস্তুটার নাম সে জানে না। কাঠের পালিশ দেখিয়াই তার চমক লাগিয়া গিয়াছিল। বাবুদের কুকুর যাহা খায় সে গুরুপাক দ্রব্য কালোশশীর পেটে গেল চোঁয়া ঢেঁকুর উঠবে বার ঘণ্টা দমসম ঠেকিবার পর।

তবু বাবুদের সঙ্গে তার ঐক্য আছে। একটা আলাহিদা স্থানে উভয় পক্ষের মনে মনে ধর্ম্ম সমন্বয় ঘটিয়াছে; সেই একটি মাত্র দৈবজ আবহাওয়ার মাঝে বাবুদের সঙ্গে কালোশশী একত্র অবস্থান করে।

দুই পক্ষই তুচ্ছ কারণে স্ফূর্ত্তি পায়। যে ভাগ্যহীনের দল জীবনের এই স্ফূর্ত্তিটুকু জন্মের মতো হারাইয়াছে, কালোশশী তাহাদের সঙ্গে বাস করিয়াও তাহাদের নয়! তার সুর স্বতন্ত্র। মানুষ সবাই এক-একটি অস্তিত্বের বিন্দু; এই বিন্দুটি বিস্তৃতি লাভ করিতে মানসিক যে স্ফূর্ত্তির প্রয়োজন তাহা কালোশশীর আছে অভয়ের বিলুপ্ত হইয়া গেছে। কালোশশীর ভ্রমও মনে হয় না যে, পৃথিবীর বুকের উপর তার সংস্থাপন বিধাতার নিয়মের ব্যতিক্রম, পরন্তু সৃষ্টিশৃঙ্খলার একটি সম্যক দৃষ্টান্ত সে; নিজের জীবনের বাহিরের রূপ যাহা নিত্য নিয়মিতভাবে তার চোখের সম্মুখে লীলায়িত হইতেছে, কালোশশীর মনে হয়, সে তার আত্মার দিব্য-দ্যুতিরই রূপ।

তার ঐ দিব্য-বস্তুটি প্রাণ-প্রবাহের বিপরীত মুখে দাঁড়াইয়া অভয়কে যেমন, তাহাকে তেমন করিয়া অধঃপতিত করে না। কালোশশীর চোখের উপর একটা বীভৎস অভিনয় নিয়তই অনুষ্ঠিত হয় না।

পৃথিবীর গর্ভাবাস লুণ্ঠন করিয়া ছায়ামূর্ত্তি দলে দলে তীরের মতো ছুটিয়া দিগন্তের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে; তাহাদের কাহারো হাতে অপহৃত স্বর্ণপিণ্ড, ছায়ামূর্তির নাসিকাগ্রে শ্বতচন্দনের তিলক রেখার মতো সোনার আভা পড়িয়াছে।

তাহাদের কাহারো হাতে রসপূর্ণ পাত্র,—"গেল গেল" রব তুলিয়া মানুষ যে আর্ত্তনাদ করিতেছে, তস্করেরা তাহাতে কর্ণপাত করিতেছে না।

দেখা যায়, দুঃসাহসী কে একজন তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিল, ছুটিতে ছুটিতে দুই বাহু ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া মাটি ছাড়িয়া সে লাফাইয়া উঠিল, মুখ হা, তাহার ভিতর গোঙানি। মাটিতে পেঁাছিয়া দাঁড়াইয়া টলিতে টলিতে সে পড়িল। খানিক কাঁপিয়া স্থির হইয়া রহিল, মরিয়াছে।

কালোশশীর এমন দূরদৃষ্ট নয় যে, এসব তার চোখে পড়িবে। তাই স্ফূর্ত্তি আছে, বাবুদের সঙ্গে মিল আছে।

বাবুদের বিশ্রাম আছে, কালোশশীরও আছে, অভয়ের নাই। দিনের পর দিন অভয় চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, না হয় লক্ষ্যহীন হইয়া পথে পথে ঘাটে মাঠে ঘুরিয়া বেড়ায়। কিন্তু কাজ নাই বলিয়া বিশ্রাম তার নাই। পলে পলে যাহার সঙ্গে দূরত্ব বাড়াইয়া এই অবসর মুহূর্ত্তগুলি - স্বতঃসিদ্ধ, সহজে অনুভূত হয় এমন আর কিছুই নয়, কেবল একটানা সূক্ষ্ম একটি মৃণাল-তন্তু প্রসব করিয়া চলিয়াছে, সেই বিলীয়মান বস্তুটির বিচ্ছেদ-বেদনায় তাহার তিলমাত্র বিশ্রাম নাই।

তন্তুটি কাটে না।

দেহ দুর্ব্বহ; দেহ যেন পাতলা একটা আবরণ। প্রাণান্তকর নিঃশব্দ আর্ত্তনাদের উপর বিছান রহিয়াছে; এই বহনক্লেশ আর যাহাই দিক, বিশ্রাম দেয় না।

কালোশশী তার বিশ্রামকে ভূষিত করিতে চায়। তা নইলে তার চলে না।

পরিচ্ছেদ—৪

বাবুরা বৈকালে আসিয়া পৌঁছিলেন।

মাইল দুই রাস্তা "সাইকেলে" আসিতে হইয়াছে বলিয়া তাহাদের কাটা-কাপড়ের পোষাক—আর তা এমন মজবুৎ করিয়া আঁটা যে, তাঁহাদের প্রকৃষ্ট উপকরণ সম্বন্ধে সন্দেহ করা যায় না।

গাড়ীর সময় ধরিয়া কালোশশী গেটের সম্মুখেই ওৎ পাতিয়া ছিল—তিন ভাইকে পর পর নমস্কার করিয়া সে সাইকেলত্রয়ের পশ্চাদ্ধাবন করিল—

বাবুরা বুঝিলেন, এই ব্যক্তি তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিল—

কালোশশী দেখিল, তিন ভাইই সুপুরুষ, নধর গঠন, ধনীর দুলাল বটে।

প্রাণনাথ ঠাকুর আশীর্ব্বাদ করিতে আসিয়াছিলেন; বাবুদের বহিঃপ্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া টেবিল চেয়ারের বাহুল্য দেখিয়া তাঁর অসন্তোষ জন্মিতেছিল; তারপর বাবুদের দেখিয়া তাঁর হতশ্রদ্ধার অন্ত রহিল না—এটা কি সুন্দরবন! বাঘের ডাক শুনিয়া গাছে উঠিতে হইবে নাকি যে কাছ-কোঁচা ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে।—প্রাণনাথের আরো মনে হইল, ইহারা আহ্নিক করে না, গায়ত্রী ইহাদের মুখস্থ নাই—যদি থাকে তবে—আমার এই টিকি—

কিন্তু পারত্রিক টিকিটি কঙ্কালী-দেবীর দুয়ারে বাঁধা দিবার পূর্ব্বেই প্রাণনাথ শিহরিয়া পিছাইয়া দাঁড়াইলেন—

রামহরি বাক্স খুলিয়া বন্দুক বাহির করিতেছে।—যাহাদের সংস্পর্শ হইতে শত হস্ত ব্যবধানে থাকিতে হইবে বলিয়া সৎপরামর্শ দেওয়াই আছে, আগ্নেয়াস্ত্র তাহাদের তালিকাভুক্ত না হইলেও জনৈক শিকারীর মুখে শোনা কথাটা প্রাণনাথের মনে ছিল—বন্দুকের গুলী নাকি সার্দ্ধদ্বিশত হস্ত দূরবর্ত্তী বস্তুকেও বিদ্ধ করিতে পারে।

কিন্তু রামহরি কেবল একটি ফাঁকা আওয়াজ করিল—ইটি ছোটবাবুর সখ; পারিলে আওয়াজের সংখ্যা বাড়াইয়া বোধ হয় গেজেট করিয়া দিতেন। আগে হইতেই আদেশ দেওয়া ছিল; ছোটবাবু চেয়ারে বসিয়াই রামহরিকে ইঙ্গিত করিলেন- রামহরি করিল "ফায়ার"।

প্রাণনাথ আওয়াজটার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন, কিন্তু চমকিয়া উঠিতে হইল; এবং তারপরই তিনি মৃদু মৃদু হাস্য করিতে লাগিলেন।

আগমনবার্তা লোহমুখে বিঘোষিত হইল, কিন্তু প্রাণনাথ ভয়ে ব্যস্ত—শব্দে বায়সকুল শঙ্কিত হইয়া কা কা রবে ইতস্ততঃ পলায়নপর হইয়াছে দেখিয়া তিনি মনে মনে বলিলেন, উহারা দুর্জনকে পরিহার করিতেছে ; প্রাণ বাঁচাইবার জন্মগত বুদ্ধিবলে উহারা সর্ব্বদাই সতর্ক ; উহারা তাই চিরজীবী, কিন্তু মানুষের সে সাধ্য নাই—আমি, আসিয়া দাঁড়াইয়াছি একেবারে নিকটে কিঞ্চিৎ প্রণামীর আশায়, কেঁড়ে ধরিতে কালোশশী আসিয়াছে ; ওদিকে যে-শব্দে বায়সের ত্রাসের সীমা নাই সেই শব্দেই আকৃষ্ট আর কৌতূহলী হইয়া কয়েকটি বর্ব্বর বালক আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। মূলতঃ কথাটা ইহাই যে, বাবুদের 'ধরণ-ধারণে' তাঁর মনে হইতে-ছিল, প্রণামী প্রাপ্তির আশা পনর আনা নাই, মাত্র এক আনা আছে—তাই তাঁর এই রাগ।

কালোশশী দ্বিচক্রের পশ্চাতে খানিক ছুটিয়া হাঁটিয়াই আসিতেছিল ; বন্দুকের শব্দে আবার দৌড়াইয়া সে শীঘ্রই পেঁছিয়া গেল। তখন গতির সম্মুখে প্রণামটা চলনসই গোছের হইয়াছিল—এবার বাবুদের অন্যমনস্ক দৃষ্টির সম্মুখে কালোশশী ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণত হইল।

বাবুরা স্মিত-মুখে প্রণাম গ্রহণ করিলেন ; অসরল চিত্ত প্রাণনাথ ভাবিলেন, উভয় পক্ষই কপট। বাবুরা টেবিলের ধারে চেয়ারে চেয়ারে বসিয়া গেলেন—

বড়বাবু রামহরিকে দিয়া বেঞ্চি আনাইয়া অভ্যাগতকে বসিতে বলিলেন ; প্রাণনাথের রাগটা একটু কমিল অর্থাৎ আশা জন্মিল—এবং কালোশশী অল্প অল্প হাসিতে লাগিল—যেন না হাসিলেই বাবুরা তাহাকে গেঁয়ো স্বভাবের অপ্রতিভ লোক বলিয়া ভুল করিয়া বসিবেন।

বড়বাবু বলিলেন —আপনাদের এখানে দেখে বড় খুশী হ'লাম।

কালোশশী প্রত্যুত্তরে কৈফিয়ৎ দিল ; বলিল,—আজ হাটবার, সবাই হাটে গেছে : ফিরলেই সবাই এসে দর্শন করে যাবে ; আপনারা আজই পদার্পণ করবেন তা সবাই জানে।

মেজবাবু প্রশ্ন করিলেন,—কেমন করে জানলে সবাই ?

—গেট প্রস্তুত যখন করি—

—আপনি করেছেন ?

কালোশশী কিশোরী-সুলভ লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশিয়া গেল ; কোনো রকমে উত্তর একটা উচ্চারণ করিল,—না, না, ও কিছু নয়।

বড়বাবু আর মেজবাবু হাসিয়া কালোশশীকে আরো কুণ্ঠিত করিয়া ছাড়িয়া দিলেন—

কিন্তু ছোটবাবুর মেজাজ যেন কেমন। তিনি বলিলেন,—দলে দলে লোক আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসুক এ আমরা চাইনে, আমরা অপার্থিব কিছু নই, হট্টগোল আমরা পছন্দ করিনে। কথাগুলি রুক্ষ শুনাইল—

বড়বাবুর মনে পড়িয়া গেল, এখানে আসিবার পূর্ব্বে বন্ধু গণপতি তাঁদের বলিয়াছিলেন, মানুষগুলি উল্টাইয়া কোৎকা হইয়া না দাঁড়ায়, ইহা দেখিও। তিনি পিঠাপিঠই হাসিয়া বলিলেন,—আমরা তাদের ভালবাসি তাই জানাতেই এসেছি—

তাদের কাছে গিয়েই আমরা তা জানিয়ে আসব—অরা এসে বিব্রত হবে এটা ঠিক নয়। তাই নয় কি ?

প্রাণনাথ আর কালোশশী এক সঙ্গেই বলিয়া উঠিল,—আপনি কি আর ভুল বলবেন।

প্রাণনাথকে স্বীকার করিতেই হইল যে, বড়বাবু মিষ্টভাষী ও মেজবাবু প্রভৃতি সকলেই হৃদয়বান সন্দেহ নাই।

মেজবাবু বলিলেন,—কাল সকাল বেলাই ঘুরে আসতে হবে একবার।

শুনিয়া কালোশশীর দেহে রোমাঞ্চ জাগিল ; বলিয়া উঠিল,—যাবেন একবার : আমি আপনাদের দেখিয়ে শুনিয়ে আনব। কিন্তু বলব কি বাবু, পরিচয় করিয়ে দিতে লজ্জা বোধ হয়।

যেন গ্রামটি কালোশশীর পেটের সন্তান—সন্তানের অপরিচ্ছন্ন হতশ্রীতে তার লজ্জা আছে।

কোঁচার খুঁটটি গায়ে জড়াইয়া অভয় আসিয়া দাঁড়াইল।

প্রাণনাথ পৈতা মাজিয়া আসিয়াছিলেন—সাবানের জলে ভিজা পৈতা শুকাইয়া চাদরের নীচে খরখর করিতেছিল। "পৈতে কালো, বামুন ভালো, পৈতে সাদা, বামুন গাধা"—লোকে এককালে বলিত বটে, কিন্তু সেদিন আর নাই। কাহাকেও বুঝিতে না দিয়া গায়ের চাদরটা সাবধানে সরাইয়া যজ্ঞোপবীত গুচ্ছ বাবুদের চোখের সামনে উদ্ঘাটিত করিয়া দিবার আয়োজন প্রাণনাথ তলে তলে করিতেছিলেন, এমন সময় অভয়ের আগমনে তিনি ছাড়া আর চারিজনের চোখ অভয়ের দিকে পড়ায় ব্রাহ্মণের বিলম্বিত কর্ম্মটি সংক্ষেপে শেষ হইয়া গেল—এবং ফলও ফলিল—

বড়বাবু উপবীত দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন ; সসম্ভ্রমে বলিলেন,—আপনি ব্রাহ্মণ। প্রণাম হই ; বয়োজ্যেষ্ঠ আপনি। বলিয়া হাত জুড়িয়া কপালে ঠেকাইলেন ; বলিলেন,—আপনার সঙ্গে এতক্ষণ কথা বলিনি,—ভারি অন্যায় হ'য়ে গেছে। আর আমাদের এমন বেবন্দোবস্ত যে তামাকের যোগাড় নেই। ওরে ?

রামহরি শুনিতেছিল ; তামাকের কথা বলিয়া সাড়া দিল না।

প্রাণনাথ বলিলেন,—থাক, ব্যস্ত হবেন না ; আমি তামাকে তেমন অভ্যস্ত নই।

কিন্তু তাঁহার পাশ হইতে ব্যস্ত হইয়া লাফাইয়া উঠিল কালোশশী ; বলিল, আমি তামাকের যোগাড় দেখছি। অতিশয় ভদ্রব্যক্তি ও'রা ; আমাদের মতো তো নয়। একটু ত্রুটিতেই ও'দের।

'মাথায় বজ্রাঘাত হয়' না বলিয়া কালোশশী বলিল, মনে হয়, বুঝি মানী ব্যক্তিকে অপমান করা হ'ল. তামাক আমি দেখছি। বলিয়া সে চক্ষের পলকে কোন দিকে অন্তর্হিত হইল কে জানে।

ভুলের দরুণ আক্ষেপ ছিল, বড়বাবু তাই ঘোরতর সমাদর করিয়া অভয়কে বসিতে বলিলেন, এবং মাটিতে তাহাকে কিছুতেই বসিতে দিলেন না ; উপরন্তু চেয়ার হইতে প্রায় অর্ধেক উঠিয়া অভয়কে ভড়কাইয়া দিলেন। অভয় বেঞ্চেরই একধারে বসিল।

প্রাণনাথের দিকে চাহিয়া বড়বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন. ক'ঘর আছেন আপনারা ?

প্রাণনাথের মনে হইল, যত বেশী বাস ব্রাহ্মণের তত কল্যাণ দেশের, এইরূপই বাবুর মনোভাব। বলিলেন, ছিলাম পাঁচঘর ; বর্ত্তমানে টিকে আছি আমরাই একঘর ; আমরাও আর বেশী দিন নেই। আগে পৌরোহিত্য করতাম, দিন ভালই চলত, পাওনা ছিল ; এখন আমি ভিক্ষোপজীবী। কঠিন আত্ম-পরিচয়টি ব্যক্ত করিয়া প্রাণনাথ ভাঙিয়া পড়িতে পড়িতে কায়ক্লেশে রহিয়া গেলেন।

আপশোষের কথাই, এবং বিবিধ আকারেই তাহা প্রকাশ করা যাইত ; কিন্তু অপরে কেহ কিছু বলিবার পূর্ব্বেই ছোটবাবু বলিয়া বসিলেন,—উঃ। ব্রাহ্মণকে কিছু দেওয়া উচিত, বড়দা।

শুনিয়া প্রাণনাথের প্রাণ গোপনে নৃত্য করিতে লাগিল. কিন্তু বড়বাবু হঠাৎ লাল হইয়া উঠিলেন। কথাটা বলা অবিবেচনার একশেষ হইয়াছে, ভিক্ষোপজীবী বলিয়া নিজেকে পরিচিত করিলেই তাহাকে তখনই ভিক্ষা দিবার প্রস্তাব করা। ব্রাহ্মণ হয়তো অপমানিত বোধ করিয়াছেন।

বড়বাবু বিজ্ঞ, তিনি উচ্চবাচ্য করিয়া ছোট ভাইকে লজ্জিত আর ব্রাহ্মণকে আরো অপমানিত করিলেন না। অতিশয় কুণ্ঠিত দৃষ্টিতে প্রাণনাথের চোখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

প্রাণনাথ তাহা দেখিলেন ; ভাবিলেন, এই যাইবার সময়. উঠিয়া দাঁড়াইয়া সহাস্য-মুখে বলিলেন, যাই এখন, আহ্নিকের সময় হয়েছে। যতদিন থাকবেন এখানে, আপনাদের যথাসাধ্য সেবা করব। সেবা মানে কেবল হাত-পা টিপে দেয়া কি তামাক সাজা তা ত' নয় ; মানুষের সঙ্গও ত' আপনাদের চাই—যদিও কথা বলতে জানিনে, আর কথা বলবার বিষয়েরও তেমন সম্বল নেই, তবু আসব।

বাবুরা তিনজনেই হাত তুলিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন ; কিন্তু কালোশশীর প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত তাঁহাকে বসিতে বলিতে কাহারও হুঁস হইল না। বড়বাবু অভয়কে বলিলেন,—তোমার নামটি কি ?

—আমার নাম শ্রীঅভয়চরণ দাস, জাতিতে মাহিষ্য।

কালোশশী "ব্যস্ত-সমস্ত" হইয়া আর হুঁকো কল্‌কে এবং কল্‌কের উপর আগুন লইয়া রাস্তার মোড় ঘুরিতেই অভয়ের কথা তার কানে গেল। বাবুরা অভয়ের সঙ্গে আলাপ করিতেছেন !

কালোশশী রাস্তার মোড় হইতেই বলিল, ভারি সৎলোক বাবু ! গ্রামের ইতর-ব্রাহ্মণ সবারই অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়ে গেছে, কেবল ও-ই খাঁটি আছে। বলিতে বলিতে হুঁকা হস্তে কালোশশী সভাস্থ হইল।

একাদিক্রমে ইতর ব্রাহ্মণ জনসাধারণের স্বভাব নষ্ট হইবার সংবাদে বাবুরা ক্ষুণ্ণ হইয়া গেলেন ; কিন্তু কালোশশী ইঙ্গিতজ্ঞ লোক ; বলিল, ধার নিয়ে না শোধা, দোকানীকে তার প্রাপ্য মূল্য না দেয়া, মিথ্যে কথা, প্রবঞ্চনা, এ সবও নষ্ট-স্বভাবের কাজই, বাবু ! তারপর চমকিয়া উঠিয়া বলিল, কই, ঠাকুর কই ? বলিয়া পিছন দিকেও চাহিয়া দেখিল।

মেজবাবু বলিলেন,—ঠাকুর চলে গেছেন। কি মনে করে গেলেন কি জানি ! হয়তো আমাদের অসভ্যই ঠাউরে গেলেন !

ঘোরতর প্রতিবাদ নিশ্চয়ই করা উচিত—মনে করিয়া হুঁকোটাকে কোথায়

নামাইবে কালোশশী তাহা ভাবিয়া পাইতেছে না এমন সময় যে সায়াহ্ন-শান্তি পল্লীভবনে নিবিড় হইয়া উঠিয়াছিল, ভাঙ্গিয়া তাহা খান খান হইয়া গেল।

সমুদ্রে যেমন জলস্তম্ভ ওঠে, একটা আর্ত্তকণ্ঠ সন্ধ্যার অন্ধকারের উপরে সহসা তেমনি সচল হইয়া উঠিয়াছে। কালোশশী হুঁকা হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, বাবুরা আঁৎকাইয়া উঠিলেন—অভয় মাথা নোয়াইল।

পরিচ্ছেদ ৫

ক্রন্দন স্বর বহিতে লাগিল।

একটা অনৈসর্গিক গ্রামে উপনীত নারী-কণ্ঠের অনতিতনু দীর্ঘ সেই স্বর সূক্ষ্ম ছন্দে আনত উন্নত হইয়া গড়াইয়া চলিল—মনে হইতে লাগিল, একই নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে নহে। মাটি হইতে আকাশে উঠিবার ঊর্দ্ধ অধঃ দক্ষিণে বামে যেখানে যে রন্ধ্র দিয়াই শব্দ উঠিতেছে- মুহুর্মুহুঃ নিঃসৃত বহুশব্দ একটা নিরবচ্ছিন্ন নিনাদে স্ফীত হইতেছে।

কান্নার শব্দ মাঝে মাঝে কর্কশ শুনাইতেছে,কে যেন তাহাকে ভাঙ্গিয়া নামাইতে চায়, তবু তার বিরাম নাই।

বাবুরা ইহার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না।

রোদনরোল তাঁরা শোনেন নাই এমন নয়; কিন্তু এমন স্বতন্ত্র করিয়া কদাচ শোনেন নাই, সহস্র জাতীয় শব্দের মধ্যে সে ও একটি শব্দ, ঐ শব্দ মাত্রই।

কিন্তু এখানে ঐ একটি মাত্র নক্ষত্র; দূরে কাহার কুটীরে একটি মাত্র প্রদীপ জ্বলিতেছে। নয়নপল্লবে আগত নিদ্রার মতো সুনিবিড় স্পন্দনহীন অন্ধকার পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে তাহারই মাঝে হঠাৎ এ কি কে যেন সূচীতীক্ষ্ম শরবর্ষণ করিয়া ভয়কম্পিত অন্ধকারের প্রতি রোমকূপে প্রবেশ করাইয়া দিতেছে।

হঠাৎ মনে হয়, এই রোদনধ্বনি নিষ্ফলে যাইবার নয়, কেহ না কেহ ঐ শব্দের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তার বেগসম্বরণের চেষ্টায় থর থর করিয়া কাঁপিতেছে, তার চক্ষুর পল্লবান্দোলন বন্ধ হইয়া আছে।

বিপন্নের ক্রন্দন এ নহে, সাহায্য করিতে কাহাকেও সে ডাকিতেছে না, কোথায় গেল সে, এই তার প্রশ্ন কেবল '

পল্লী 'দ্রুমদলশোভিনীং' বটে, কিন্তু সেই দ্রুমদল যে পরলোকের ছায়ায় সুন্দরের ছদ্মবেশ ছাড়িয়া ফেলিয়া হঠাৎ গ মেলিয়া দিয়া এমন নিরালম্ব নির্ম্মম রূপান্তর গ্রহণ করিতে পারে তাহা কে জানিত! কপট বন্ধুর ভয়াবহ মূর্ত্তির সম্মুখে বাবুদের গায়ে কাঁটা দিল।

ইহা সত্যই যে, বাবুরা দেশের অবস্থাটা 'সরজমিনে' স্বচক্ষে দেখিতে আসেন নাই; কোনো বিষয়ে পল্লীকে তাঁর নাম ধরিয়া জানেনই না, এবং মানুষ কতস্থানে আহত হইতে পারে এ ধারণা তাঁহাদের নাই!

স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ এইরূপ ছিল যে. সিকি-পাঁচেক যা পাওয়া যাইবে তাহাতে দু'চার পয়সার মাছ, আট আনার চাল ; মেয়েটির পেটের অসুখ, তার জন্যে দু' পয়সার বার্লি, লঙ্কা আর তরকারী কিছু, আর নুন সওয়া সের ; বক্রী পয়সা সে ফেরৎ লইয়া আসিবে।

কিন্তু অভয় লইয়া আসিল এক টাকা দিয়া একটি ইলিশ মাছ, টুকটাক তরকারী, সামান্য চাল, যা'তে এক বেলা কষ্টেসৃষ্টে হয়, আর লবণ আর লঙ্কা, পাঁচ সিকাই খরচ হইয়া গেছে, একটি আধলাও ফেরে নাই।

দাওয়ায় তরকারীর পুঁটুলী আর মাছ নামাইতেই অভয়ের স্ত্রী মাধবী জিজ্ঞাসা করিল, মাছটা কত হ'ল ?

—এক টাকা।

—ফেরৎ পয়সা ?

—নাই।

মাধবী একবার স্বামীর মুখের দিকে চাহিল ; তরকারী প্রভৃতি চালের সঙ্গে গামছায় বাঁধা ছিল, খুলিয়া দেখিয়া মাধবী স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

মেয়ে ক্ষেণী আসিয়া মাছের কাছে থপ করিয়া বসিয়া পড়িয়াছিল ; বলিল, মা, আমি মাছ দিয়ে বার্লি খাব। মায়ের মুখে উত্তর না পাইয়া সে বাবাকে ডাকিয়া বলিল, বাবা, আমি মাছ দিয়ে বার্লি খাব ; এবং বাপের মুখেও উত্তর না পাইয়া বলিল, আমি খাবই।

ছেলে রসময়ও মাছ দেখিতে আসিয়াছিল ; সে বলিল, তোর যে অসুখ।

ক্ষেণী ঝঙ্কার দিয়া বলিল, তবে কি তুই একা খাবি ? হাবাতে ছোঁড়া।

—বাবা খাবে, মা খাবে, আমি খাব। তুই--

ক্ষেণী ছুটিয়া যাইয়া দাদার হাত কামড়াইয়া ধরিল, একটা ছেঁড়া-ছেঁড়ি লাগিয়া গেল।

দাওয়ার মাটিতে মাছটা পড়িয়া আছে, তার সম্মুখেই অন্যান্য সওদা, চাল আর তরকারী, আর নিস্তব্ধ মাধবী।

ততক্ষণে অভয়ের ঘোর কাটিয়া গেছে ; মনে পড়িয়াছে আজকার মতো অন্যায় কাজ জীবনে সে আর করে নাই, ইহার বাড়া কাণ্ডজ্ঞানহীনতার কাজ মানুষের দ্বারা সম্ভবে না।

কিন্তু সত্য কথা এক যে, টাকা দিয়া একটা ইলিশ মাছ অভয় ঠিক সজ্ঞানে কেনে নাই।

আধ মণ পাটের বোঝাটা মাথায় করিয়া হাটের পথে হাঁটিবার সময় অকারণেই হঠাৎ তার মনে পড়িয়া গিয়াছিল, মানুষের "যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ।"—অভয় তাদেরই দলের একজন যারা অতীত দিনটিকে অলীক মনে করে, আর আগামী দিনটির প্রতি সন্ধানী-দৃষ্টি নাই, রাত্রে শুইবার সময় মনে হয় একটা দিন কাটিল, এই অতি সুলভ সুখটিই তাহাদের দিনের অর্জন। অভয়ের স্ত্রী আছে, সন্তান আছে, স্বার্থও আছে, জীবনকে ফুটাইবার আর খেলাইবার পটভূমি তাহার সম্মুখে সুবিস্তৃত, তবু সে কোথাও মূল প্রেরণ করিতে পারে নাই, মাটির উপর আলগোছে দাঁড়াইয়া সে কোনো দিকেই চাহিয়া নাই।

মনেও পড়ে না, ইহার সুরু করে।

দুর্নিবার দুঃখের প্রথম শায়কটির স্পর্শ কবে তার স্বাভাবিক চেতনায় বিষ ঢালিয়া দিয়া তাহাকে মূর্চ্ছিত করিয়া দিয়াছিল তাহা স্মরণ নাই। তখন হয়তো মনে হইয়াছিল, পটের ঈষৎ বদল ঘটিতেছে, এমন ঘটিয়া থাকে, সংগ্রামে মাতিয়া উঠিতে হইবে ভাবিয়া হয়তো তখন চূড়ান্ত করিয়া দেখিবার সহিবার উৎসাহে তার অজ্ঞাত স্নায়ুকেন্দ্রগুলি উন্মত্ত হইয়া গিয়াছিল, হয়তো সর্বান্তঃকরণ পুনঃ পুনঃ উৎক্ষিপ্ত হইয়া দুনিয়ার সঙ্গে একাকার হইয়া অপরিসীম চাঞ্চল্যে থরথর করিত।

তারপর একদিন বিস্মিত হইবার দিন আসিল।

অনশনের অহরহ সুরু হইল, দুঃখের প্রথম স্পর্শটি ক্রমাগত ঠেলিয়া ঠেলিয়া পথ করিয়া গভীর হইতে গভীরতর স্থান খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া অগ্রসর হইতে লাগিল, কিন্তু তখনও মনের সেই বিদ্যুৎ প্রবাহ একেবারে নিঃশেষিত হইয়া যায় নাই, মুক্ত বায়ুর শীতল স্পর্শ থাকিয়া থাকিয়া অনুভূত হইত, মন অচিন্ত্যনীয়ের অভিমুখে ছুটিত, পৃথিবীর ভাষা দুর্বোধ্য কাকলীর মতো কানে আসিত।

কিন্তু সে কতক্ষণ!

তারপর সুরু হইল সম্বিতের চতুরতা, মস্তিষ্ক পর্যন্ত কিছুই পৌঁছায় না, তবু পাশ কাটাইতে পারে, প্রস্তুত না হইয়াই পারে, প্রস্তুত হইতে হইবে এই সতর্কতা মনে জাগিবার পূর্বেই পারে। সঙ্কট পার হইয়াই সে বিস্মিত হইয়া যাইত, ধ্বংস এবার অপরিহার্য হইয়াছিল, কেমন করিয়া উত্তীর্ণ হইলাম! দিনগুলি স্বতন্ত্রভাবে সাড়া দিয়া যায় না, একটা অনভিব্যক্ত মিছিলের মতো কুয়াশার ভিতর দিয়া বহিয়া যায়, কোনো আকর্ষণেরই বশীভূত সে নয়; স্পষ্টতঃ কিছু দিয়া যায় না, স্পষ্টতঃ কিছু হরণ করে না।

সুবৃষ্টির দিনে হঠাৎ এক একটা মুহূর্ত বিচ্ছিন্ন হইয়া প্রবাহের বাহিরে আসিয়া দাঁড়ায়, সে-ও অনিশ্চিত কিন্তু পরিস্ফুট, জীবনের আদ্যন্ত মণ্ডিত করিয়া সে ছড়াইয়া পড়ে, সুখস্বপ্নে কানের কাছে কার মৃদু মধুর আশ্বাস-বাণী গুঞ্জরিত হইতে থাকে, মন দোলায় শুইয়া দোল খায়।

কিন্তু সুদিনের সে অনতিদান ভোগ করে উত্তমর্ণ।

এখন সে কথাও মিথ্যা হইয়া গেছে।

সে নিজের কাছে বিদায় লইয়াছে, সংসারের রূপের, চাঞ্চল্যের, প্রগতির, বিশ্বাসের, প্রয়াসের বিরুদ্ধ দিকে তাহার যাত্রার শেষ আসে নাই, দেহ-আধারে প্রাণ আছে তাই চলিতে ফিরিতে হয়, চলিতে চলিতে বিভ্রান্ত হইয়া যায়, মনে হয়, দৈবাৎ বাঁচিয়া আছি!

যে দিনটি প্রথম তার অনাহারে কাটিয়াছিল, সেদিন রাত্রিও তার অনিদ্রায় কাটিয়াছিল, ক্ষুধার জ্বালায় নহে, ততোধিক কঠিন একটা অনুভূতিতে। সে কি অদ্ভুত উদ্বেগ, তার বর্ণনা নাই; সমস্ত স্নায়ুশিরা টানিয়া ধরিয়া তার মেরুদণ্ডটিকে দুই হাতে দুমড়াইয়া কে যেন তাহাকে জ্যা-যুক্ত করিয়া ছাড়িয়া ছাড়িয়া দিতেছিল, সেই উৎক্ষেপের শ্রমে একাসনে বসিয়াই ঘামে তার গা ভিজিয়া উঠিয়াছিল।

তখন তার চোখ যদি কেহ দেখিত তবে সে চমকিয়া উঠিত।

দেহ নিশ্চেষ্ট ; কিন্তু দুঃসহ-ত্রাসে দৃষ্টি এখন পলায়নপর, যেন দেহটাকেও উপড়াইয়া সে সঙ্গে লইতে চায়।

সময়ে সময়ে কোলাহল করিয়া যে হরিনাম হয় তাহার আশ্রয়ে সে শান্তি পাইত, মনে হইত, গা গুটাইয়া কোথায় সে নিরুদ্দেশ হইয়া গেছে, পৃথিবী তার সন্ধান জানে না, সে নিরিবিলি স্থানে আছে, কিন্তু এ আশা অর্থহীন।

পৃথিবীকে লেহন করিয়া তার পৃষ্ঠের উপর করাতের মতো কর্কশ জিহবার চিহ্ন অঙ্কিত খনিত করিয়া যে স্রোতটি তাহাকে অবিরাম প্রদক্ষিণ করিতেছে; সে অভয়কে ছুঁইয়া ফেলে, তাহাকে লেহন করে।

কিন্তু কাহার অভিশাপে এমন ঘটে কে জানে ; এই ক্ষত এমন গুরুতর নহে যে প্রাণ দেহ-বিযুক্ত হয়, এমন লঘু নহে যে সয় তবু তাহাকে বহন করিতেই হয়।

সে একা নয়। কিন্তু তাহারা কেহ কাহারও নির্ভর নহে, সহায় নহে, কেবল পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া মনে করে, কি ঘটে যদি ও মুখ খুলিয়া চীৎকার করে।

পাটের বোঝাটা মাথায় করিয়া হাটের দিকে যাইতে যাইতে অভয় দেখিতে পাইল, তাহাদের কেউ কেউ, এবং দু'চারজনকে দেখিয়াই তার মনে হইল, তারা সবাই একটি করিয়া ইলিশ মাছ হাতে ঝুলাইয়া লইয়া যাইতেছে।

দাম ?

কেহ বলিল, এক টাকা ; কেহ বলিল, আঠার আনা ; কেহ বলিল, তারও বেশী—পাঁচ সিকি। অভয়ের শ্রান্ত মন ক্ষত-যাতনা ভুলিয়া প্রবাহিনীর স্রোতে গা ভাসাইয়া দিল, অন্তরের আদি-মধ্যহীন যে ক্ষুধাকে অমনোযোগের অভ্যাসে সে ভুলিয়া গিয়াছিল, জনস্রোতের মাঝখানে তাহাকে হঠাৎ তার মনে পড়িল, কিন্তু হাহাকার করিয়া উঠিল না ; সমষ্টির সঙ্গে একাকার হইয়া এমন একটা প্রশান্ত প্রফুল্লতা আসিল যাহার স্বাদ জীবনে আর সে পায় নাই, মন বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, মুক্তিস্নানের পর যেন সে নাসারন্ধ্র পূর্ণ করিয়া টানিয়া টানিয়া নিঃশ্বাস লইতে লাগিল।

মনের বিন্যাস নষ্ট হইল সত্য, কিন্তু সন্তান গর্ভচ্যুত হইয়া আসিলে জননীর উল্লাসের কাছে গর্ভের বিন্যাস শৃঙ্খলা অতি তুচ্ছ।

কিন্তু মাধবীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া এখন তার মনে হইতে লাগিল, মানুষের দেখাদেখি সে অতীব কুকার্য্য করিয়াছে, হঠকারী দুষ্কৃতিব সংস্পর্শে তার দুষ্কার্য্যে মতি জন্মিয়াছিল।

পাটের দাম এক টাকা চারি আনা মুঠার ভিতর লইয়া সে মাছের দোকানে ছুটিয়া আসিয়াছিল ; দেখিয়াছিল, গন্তব্য স্থানটি দুষ্প্রবেশ্য, তার চারিদিকে লোকের পর লোক ঝুঁকিয়া পড়িয়া জমাট বাঁধিয়া আছে, মাছ একটি হাতে লইবার ব্যাকুলতায় তাহাদের গামছা-কাছার ঠিক-ঠিকানা নাই ; সবুর সহিবার যন্ত্রণায় কাহাকেও পদদলিত করিতেছে কি না সে কাণ্ডজ্ঞানও তাহাদের লোপ পাইয়া গেছে।

অভয়ের আজন্মের অভ্যাসে বশীভূত মনের বাঁধন শিথিল হইয়া গেল, সে ভিড় ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

কিন্তু এত ব্যাপারের মাধবী কি জানে! সে জানিবেই বা কেমন করিয়া! সে জানে না যে, মানুষের মন দিগ্বলয়ের দিকে চাহিয়া মহাকালের হস্তান্দোলন দেখিতে দেখিতে একবার তার ছেদের অবসরে সূর্যাস্তের আলোক-প্লাবন দেখিয়া মোহের আবেশে মৃত্যুকে বিস্মৃত হইতে পারে, সলিলাবর্ত্তের মাঝে ঘুরিতে ঘুরিতে তলাইয়া যাইবার সময় মন চাঁদের দিকে চাহিয়া সে পথের কথা মুহূর্ত্তের জন্য ভুলিয়া যাইতে পারে, যে-পথে মৃত্যু তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে, রাক্ষসের মুষ্টির ভিতর হইতেও মানুষ প্রিয়জনের মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিতে পারে, সব অভিমান আর অনুভূতি নিষ্ক্রান্ত হইয়া মানুষ যখন কেবল পশুর ধর্ম্ম পালন করিয়া চলে, তখন লুপ্ত-চৈতন্য যদি একবার ফিরিয়া আসিতে পায় তবে দানবীয় অন্ধ-উল্লাসে একটি তরঙ্গ আসে! মাধবী কখনো ভাবিয়া দেখে নাই, দৈবের উপর অনন্ত নির্ভরতা মানুষকে কত নিঃস্পৃহ করিয়া তোলে, যে মরিলেই চুকিয়া যায়, দৈবক্রমে বাঁচিয়া সে একই লক্ষ্যের দিকে অনুক্ষণ দৃষ্টি রাখিতে পারে কি না, পলক-পাতের দৃষ্টি হঠাৎ বেঁকিয়া যাইতেও পারে! মাধবীর মনে হয় না, নিজেকে আর নিজস্বকে নির্নিমেষে আগুলিয়া থাকিতে থাকিতে প্রহরায় দৈবাৎ শৈথিল্য আসিলে তাহা মার্জ্জনীয়, যে মানুষ দৈবের হাতে আর মানুষের হাতে পুনঃ পুনঃ লঞ্ছিত হইয়াও অন্তরের জ্বালার ফেণভার রক্ত-লিপ্সায় মুক্ত করিয়া দেয় নাই সে বরণীয়।

আকুঞ্চিত হৃদপিণ্ডের যন্ত্রণায় যে ছটফট্‌ করিতেছিল, সে যদি হঠাৎ-বওয়া একটু হাওয়া পাইয়া তাহাতে অবগাহন করে সে ত' ভালই! জাগরণের ক্লান্তিতে একটুখানি অন্যমনস্ক হইয়াছে বলিয়াই কি রক্ত-মাংসের মানুষেরপক্ষে দুর্নিবারণীয় সেই অপরাধের জন্য মানুষকে প্রাণদণ্ড দিতে হইবে!

স্বামীকে মাধবী ধীর স্থির দেখে।

কিন্তু বুঝিতে পারে না, বসিয়া থাকিতে কেন সে হাত বাড়াইয়া ঘরের খুঁটি চাপিয়া ধরে। নিশ্চয়ই মাধবী জানে না, নিস্তরঙ্গ জলাশয়ে পঙ্কের উদ্‌গার, বুদ্‌বুদের মতো স্বামীর মনের উপর অতিশয় স্বচ্ছ একটি ইচ্ছার উদ্ভব হয়, তাহাকে ইঙ্গিত করে, আঁধার-নিমজ্জিত দূরান্তবর্ত্তী তটের দিকে পুনঃ পুনঃ তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সংজ্ঞা অলস হইয়া আসে, রক্ত চনচন্‌ করে, ভূতগ্রস্ত হইয়া ছুটিতে যাইয়াই সে কাঠের খুঁটি দু'হাতে চাপিয়া ধরে।

মাধবী তাহা জানে না। মাছ লইয়া সে ঝগড়া বাধাইয়া দিল।

পুরুষ বলবান এবং সমর্থ, এই কারণে তার কর্ত্তৃত্বের অনুগমনের সঙ্গে করুণা মিলিত করিয়া যাহারা স্বামীকে একান্ত বিশ্বাস করে, আর তার উপর বেপরোয়া নির্ভর করে, অভয়ের স্ত্রী মাধবী অভয়ের তেমন ধারা স্ত্রী নহে, স্বামী বলিয়া স্বামীর উপর তার ভক্তি আছে, কিন্তু রক্ষক হিসাবে আস্থা নাই, সব জানিয়াও নাই; প্রথম পুত্রটির মৃত্যুর পরই তাহা নিরবশিষ্ট হইয়া বিলুপ্ত হইয়া গেছে, প্রতিপালক হিসাবে স্বামীর কতটা 'মুরদ' তাহা প্রতিদিনই দেখা যাইতেছে। প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে যুঝিয়া স্বামীর দেহ ক্ষয় হইতেছে, তাহা মাধবীর চোখে পড়ে; কিন্তু বুঝিয়াও নিজেদের মনের যন্ত্রণার তাড়নায় নিরুপায়ের প্রতি তার ধৈর্য্য থাকে না।

মাধবী জানে, স্ত্রী-পুত্রের ভরণপোষণে অক্ষমতার মার্জনা স্ত্রী-পুত্রের কাছেও নাই।

রত্নাকর তাই ঠ্যাঙাইয়া মানুষ মারিত। হাত পা জড় করিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া সে ভাবিতে বসিয়া যায় নাই।

এদিকে হঠাৎ একটি কৈফিয়ৎ অভয়ের মিলিয়া গেল।

অভয় দেখে, ঘরে খাদ্য থাকিতেও ক্ষুধার সময় সন্তানের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য মাধবীর মোটেই ব্যগ্রতা নাই। যতক্ষণ তারা ক্ষুধা সহ্য করিয়া থাকিতে পারে, ততক্ষণই যেন তার সময়ের লাভ। স্ত্রীর সন্তানপালনের এই পদ্ধতিটাকে মনে মনে কোনোদিনই সে অনুমোদন করিতে পারে নাই। স্ত্রীকে নির্ম্মম মনে হইলেও সে কথা বলে নাই। তারপর দেখিতে দেখিতে সহিয়া যাইয়া ভাল-মন্দ কিছুই মনে হইত না। যেন স্বভাবের গতিই এই। ছেলেটি আর মেয়েটি মৎস্য ভক্ষণের উল্লাসে নাচিতেছে। সেই দিকে চাহিয়া অভয় তৃপ্তিভরে কহিল,—দেখ!

মাধবী চাহিয়াও দেখিল না।

অতিশয় তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের সুরে বলিল,—দেখেছি! তুমিও ওদের মতো একজন নাকি! তুমি আমাকে ওই দেখাতে মাছ এনেছ সাড়ে ষোল আনা দিয়ে!

অভয় তবু হাসিল; বলিল,—তা বৈ কি! ওদের তুমি খেতে দিতে পার না তা ত' আমি চোখেই দেখি। ক্ষিধের সময় ওরা তোমার পিছু পিছু কেঁদে কেঁদে বেড়ায়।

—ইলিশ মাছ খেলেই ওদের ক্ষিদের কান্না জন্মের মতো থেমে থাকবে—নয়? এর বদলে চারটি মুড়ির চাল আনলে অনেকদিন ওদের কান্না শুনতে হ'ত না।

অভয়ের মনে হইল, ইহার আর উত্তর নাই। মাধবী অতিশয় সত্য কথাই বলিয়াছে। আপশোষে তার মন পুড়িতে লাগিল।

মাধবী বলিতে লাগিল,—ঐ কংগাছা পাটের অংশ নিয়ে ভেবেছ ওতেই তোমার চিরকাল যাবে! পাগল কি-গাছে ফলে! ভগবান দেন না শুনি, যা দিয়েছেন তারই এই গতি। বেশী দিলে আরো কত দেখতে হ'ত!

ভুলু দাস রাস্তার উপর হইতে হাঁকিল,—অভয় আছ?

—আছি।

—কিছু দেবে?

—না।

—বেশ। বলিয়া প্রত্যাখ্যানে কিছুমাত্র দুঃখিত না হইয়া ভুলু দাস চলিয়া গেল।

ভুলু দাস প্রত্যহই একবার করিয়া হাঁকিয়া যায়। প্রতিদিনই উত্তর পায়—"না।" বলে—"বেশ।"

বড় ছেলেটির চিকিৎসার জন্য পঁচিশ টাকা কর্জ দিয়া ভুলু দাস অভয়কে অসময়ে আসান দিয়াছিল। এখন সুদের টাকা "আসলে" গণ্য হইতেছে। ভুলু দাসের টাকার জন্য বাড়াবাড়ি তাগিদ কিছু নাই। অভয়কে সময় দিয়া অভয়ের বাড়ীখানির চারিদিকে সে জাল ফেলিতেছে। জালের রশি টানিতে সুরু করিলেই আঠার কাঠা মাটি সহ "মায় সাজসরঞ্জাম" ঘর দু'খানা অমনি উঠিয়া আসিবে।

মাধবী বলিল,—দাও না বাড়ীখানা ওকেই লিখে। রাস্তায় দাঁড়াই গে; একদিন ত' দাঁড়াতেই হবে; তুমি থাকতে থাকতে দাঁড়াতে পারলে চোখে দেখেই যেতে পারতে।

শুনিয়া দুরন্ত-ক্রোধে অভয়ের মাথায় রক্ত ঝমঝম করিতে লাগিল। মনে হইল, মাধবী তার বিশ্বাসঘাতিনী স্ত্রী। যে প্রাণান্তকর সমস্যা লইয়া সে কালাতিপাত করে, তার বিশ্বাস ছিল, তার অর্ধেক মাধবীর—কিন্তু তা নয়, স্ত্রী-সম্পর্ক সে যেন স্পষ্টই অস্বীকার করিতেছে।

বলিল,—মানুষ বিয়ে করে এই জন্যে না কি?

—কি জন্যে?

—আমি যে খেতে দিতে পারিনে এইটে আমায় মনে করিয়ে দিতে?

—এই কথা! সব লোকের কথা বলছ কেন তা হ'লে? ঢাকাঢাকির ত' কোনো কথা নেই; পার না এ ত' তুমিও জান, আমিও জানি, সবাই জানে—এরাও। বলিয়া মাধবী ছেলে-মেয়েকে দেখাইয়া দিল।

মায়ের অঙ্গুলি তাহাদের দিকে উঠিল দেখিয়া অবোধ মেয়েটি সহসা যাইয়া অভয়ের হাত ধরিল, বলিল,—বাবা, মাছ আমি খাবই; দাদা—

কিন্তু কথা তার শেষ করা হইল না।

স্ত্রীর মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইতেই অভয়ের মনের ততখানি শূন্য আবহাওয়ায় ঝড় বহিতেছিল তাহার বেগে সে কাঁপিতেছিল। নিজেই বোধ হয় মাটিতে পড়িত, কিন্তু মেয়েরই কণ্ঠস্বরে পতন সম্বরণ করিয়া সে হঠাৎ দু' পা পিছাইয়া আসিল, আসিয়া মেয়েটির গালে প্রবল একটা চড় বসাইয়া দিল।

তাহারই দিকে উত্তোলিত কৃপাপ্রার্থী চক্ষু দু'টি নিমেষের জন্য নিমীলিত হইয়া গেল। রোগে ক্ষুধায় মেয়েটির দুর্ব্বল দেহ অবশ হইয়া পড়িতে পড়িতে একবার খাড়া হইবার চেষ্টা করিয়াই জ্ঞান হারাইয়া মাটিতে পড়িল এবং পরক্ষণেই সেই আঁধা অন্ধকার অপরিসর উঠানে, ক্ষুধার রোগের চিন্তার যাবতীয় জড়তা মর্দ্দিত করিয়া যে কোলাহল উত্থিত হইল তার বর্ণনা নাই।

মাধবী চীৎকারের পর চীৎকার করিতে লাগিল,—মেরে ফেললে মেয়েটাকে, মেরে ফেল'লে, মেরে ফেল'লে।

ছেলেটি ভয় পাইয়া ততোধিক উচ্চকণ্ঠে কাঁদিতে লাগিল,—খুকীকে মেরে ফেল'লে বাবা। ওগো তোমরা কে আছ দেখে যাও।

এই অবিশ্রান্ত আর্ত্ত চীৎকার চারিদিককার ঘন জঙ্গলে ধাক্কা খাইয়া সেই উঠানেই ফিরিয়া আসিতে লাগিল। তাহাদের কাছাকাছি কাহারও ঘর-বাড়ী নাই, কেহ সাহায্যার্থে দৌড়িয়া আসিল না।

রাস্তা দিয়া কান্ত বিশ্বাস যাইতেছিল। সে মিনিট খানেক রাস্তাতেই দাঁড়াইয়া কান পাতিয়া শব্দগুলি শুনিল। তারপর সে কি ভাবিয়া চেনা পথেই অন্ধকারেই উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে লাগিল।

অভয় তখন মেয়ের মাথায় জল দিতেছে।

পরিচ্ছেদ—৭

বাবুরা কাল বৈকালে আসিয়াছেন ; তখন গ্রামের সবাই হাটে। মাঝে একটি রাত্রি মাত্র অতিবাহিত হইয়াছে।

খুব ভোরে উঠিয়া গ্রামের প্রান্তে যাইয়া সূর্যোদয় দেখিবার অভিলাষ তাঁহাদের ছিল ; পরস্পর তাঁরা শুনিয়াছিলেন যে, ঘোর রক্তবর্ণ একখানা থালার মাতা অতিশয় জাঁকাল চেহারা লইয়া সূর্য্য প্রথমে উদিত হন। তখন তাঁহার দিকে চাওয়া যায়। কিন্তু অভ্যাসবশতঃ উঠিতে দেরী হইয়া গেছে।

ছোটবাবু বলিলেন,—এ্যালার্ম টাইম্-পিস্‌টা আনতে ভুল হ'য়ে গেছে।

মেজবাবু বলিলেন,—আমার ঘুম ঠিক সময়েই ভেঙেছিল ; কিন্তু উঠতে কেমন ভয় করতে লাগল ; চারিদিক এমন কালো।

বাবুরা কালি আর কাজল ছাড়া ব্যাপক কালোর সঙ্গে পরিচিত নন।

বড়বাবু বলিলেন,—শুনেছে বাবুরা এসেছেন, টাকাকড়ি নিশ্চয়ই কিছু সঙ্গে আছে। বাইরে বেরোওনি ভালই করেছ।

ছোটবাবু বলিলেন,—বন্দুক আমার শিয়রে হাতের কাছেই ছিল। পল্লীগ্রামে চোরের উপদ্রব, তাহার প্রতিকার বন্দুক এবং বিলাতী দস্যুর তুলনায় এখানকার চোর-ডাকাত কত অকিঞ্চিৎকর সেই সম্বন্ধে আরো কিছুক্ষণ আলোচনার পর চা-পান শেষ করিয়া বাবুরা উঠিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় বাহিরে কালোশশীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল—বলিতেছে,—দাঁড়াও এখানে তোমরা ; গোল ক'রো না, বাবুদের বিশ্রামের ব্যাঘাত না হয়।

শুনিয়া বড়বাবু বাহিরে আসিয়া দর্শন দিলেন ; কালোশশী দেখিল, তাঁহার মুখে ক্লান্তির কোনো নিদর্শন নাই। কালোশশীরা একে একে আগাইয়া আসিয়া প্রণাম করিল। বেলা তখন প্রায় সাতটা ; কিন্তু কালোশশী আশ্চর্য্য হইয়া বলিল,—বাবু উঠেছেন এত সকালেই ! তারপর সগর্ব্বে বলিল,—দেখলি ত' ?

অর্থাৎ প্রাতঃকালেই শয্যাত্যাগ করিবার অভ্যাস তোদেরই ছ'জনের একচেটিয়া নয় !

বড়বাবু বলিলেন,—উঠেছি অনেকক্ষণ। কি খবর তোমাদের ?

—এরা সব আপনাদের কাছে একটু দরবারে এসেছে।

—আমাদের কাছে কি দরবার ?

—আপনাদের কাছেই ত'-দরবার ওরা করবে, বাবু। বলিয়া কালোশশী তার মুখভরা হাসি উপস্থিত ব্যক্তিগণের মুখের দিকে চাহিয়া ছড়াইয়া দিল। তারপর বলিল,—নানা রকমের কষ্ট ওদের বাবু। ওদের মুখেই দয়া ক'রে শুনুন।

অগত্যা রাজি হইতে হইল। এতগুলি লোক কষ্টের কথা শুনাইতে আসিয়াছে। ইহাতে প্রীত হইবেন না এমন সৃষ্টিছাড়া মানুষ ও'রা নন। তার উপর, কথার "ইতর বিশেষ" অবগত না হইয়াই প্রত্যাখ্যান করিলে অহংকারী নাম রটিয়া অপ্রিয় হইতে হইবে। তাহাও, আর যেখানেই হোক এখানে শোভন হইবে

না। অতএব চেয়ার চৌকি দক্ষিণের রোয়াকে নামিল। তিন বাবু আর সাত মক্কেল দরবারে বসিয়া গেলেন।

বসিয়া বড়বাবু বলিলেন,—কি তোমাদের কথা বলো।

কালোশশী বলিল,—বলো নির্ভয়ে বলো।

কিন্তু লোকগুলি মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। কে আগে সুরু করিবে তাহাও যেন সমস্যা!

মেজবাবু দেখিলেন, বৃথা কালব্যয় হইতেছে। তাঁহার মনে হইল, ইহাদের প্রধান দোষ দীর্ঘসূত্রতা। দীর্ঘসূত্রতা ইহাদের মজ্জাগত। হাঁটায়-বসায়, চোখের চাউনিতে পর্যন্ত ইহাদের এমন মন্থরতা আর "যাই-যাচ্ছি আড়ামোড়া" শৈথিল্যের ভাব, যেন কেউ নেহাৎ টানে বলিয়াই নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে এরা চলে, দুরবস্থার মূল আর কোথাও নয়, এইখানেই। মেজবাবুর অভক্তি জন্মিয়া গেল।

বড়বাবু বলিলেন,—কার কি বলবার আছে বলো, আমাদের সময় কম।

—সে ত' ঠিক কথাই, আপনাদের সময়ের দাম কত! বলিয়া সাউকাড় কালোশশী লোকগুলিকে ভৎর্সনা করিতে লাগিল, 'তোদের এখানে এনে আমিই যে আহাম্মুক বনে গেলাম বাবুদের কাছে! বোকারা সব—ভেবেছিস কি বাবুরা তোদের তাঁবেদার! তোদের মুখের কথা শোনবার জন্যে হাঁ ক'রে বসে থাকবেন? তোরা থাক—আমি চললাম বাবুদের অনুমতি নিয়ে।' বলিয়া কালোশশী হাঁটুতে হাত চাপিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেই, জয়নাবের দায়টা ছিল বড়, অবলম্বন সরিয়া যায় দেখিয়া, সে-ই মরিয়া হইয়া তার ক্লেশের কাহিনী সুরু করিয়া দিল।

সংক্ষেপে তাহা এইরূপ—

তার দুর্দ্দান্ত এবং অধার্ম্মিক শ্যালকেরা তার "বিবাহের" স্ত্রীকে নিজেদের বাড়ীতে বলপূর্ব্বক আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। কিছুতেই ছাড়িয়া দিতেছে না; আনিতে গেলে মারপিটের ভয় দেখাইতেছে। এইরূপ আজ প্রায় ছয় মাস চলিয়া আসিতেছে। অধুনা কষ্ট অধিকতর হইয়াছে এই কারণে যে, পিত্রালয়ে যাওয়ার সময় জয়নাব-পত্নী অন্তঃস্বত্ত্বা ছিল। পনর দিন হইল সৌভাগ্যবতী একটি পুত্র-সন্তান প্রসব করিয়াছে, কিন্তু পিতার সঙ্গে পুত্রের "চাক্ষুষ" হইতে দুর্ব্বৃত্ত শ্যালকেরা দেয় নাই। আজও।

বড়বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—কেন এমন করে?

জয়নাব বলিল, হুজুর ব'লব কি! আমার শ্বশুরের সম্পত্তির পাঁচ আনা দু' গণ্ডা দু' কড়া দু' ক্রান্তি অংশের মালিক আমার স্ত্রী। সেইটে ওরা লিখিয়ে রেজেষ্ট্রী ক'রে নেবে এই ওদের মৎলব। সে আসতে চায়, কিন্তু তার ভাইয়েরা দলীল না হওয়া পর্য্যন্ত তাকে আটকে রাখবে।

কালোশশী বলিল,—আস্পর্দ্ধা কত!

বড়বাবু মেজবাবুকে জিজ্ঞেস করিলেন— তা কি হয়? স্বামী আর ছেলে থাকতে ভাইকে সম্পত্তি লিখে দিলে সে দলীল কেমন ক'রে 'ভ্যালিড্' হবে! আইনজ্ঞ এঁরা সবাই!

মেজবাবু বলিলেন,—আইন কি তা জানিনে। তবে সামাজিক ব্যবস্থা এই যে, স্ত্রী স্বামীর কাছেই থাকবে; স্ত্রীর সম্পত্তি স্বামীই ভোগ করবে। আইন যদি:

কাণ্ডজ্ঞানের নির্ঘণ্ট হয় তবে তাতেও তাই আছে বলে আমার বিশ্বাস। বলিয়া মেজবাবু খুব সপ্রতিভভাবে চেয়ারের হাতলের উপর অঙ্গুলির আঘাত করিতে লাগিলেন, আর ভাবিতে লাগিলেন ক্রান্তির পরও ক্ষুদ্র কিছু আছে কি না।

আইন তাহারই অনুকূলে শুনিয়া জয়নাব কাঁদ কাঁদ হইয়া উঠিল ; বলিল,—আপনারা থাকতে আইন-আদালত আমরা চিনিনে, হুজুর। খরচান্ত কাজ ; ওদিকে যেন কেউ না যায়। যদি হুকুম করেন ত' তাদের একবার ডেকে আনি হুজুরের কাছে। কালোশশীর মন দুলিতে লাগিল।

কোনদিকে টানিয়া কথা বলিলে বিচক্ষণতা বেশী প্রকাশ পাইবে ? বাবুরা কি সালিশী করিতে আসিয়াছেন ! অথবা, যাও, শীঘ্রই ডাকিয়া আন ; এমন সুবিধা আর পাওয়া যাইবে না। মনে মনে তর্ক করিতে করিতেই সময় ফুরাইয়া গেল, ছোটবাবু বলিলেন,—কি দরকারে ? দাঙ্গা বাধাতে ? তোমার স্ত্রীকে ছেড়ে দিক বলে তাদের ওপর আমরা জুলুম করতে পারব না। আজকাল সবাই এক আইন ছাড়া আর সবারই পক্ষে স্বাধীন। সে যদি আমাদের কথা গ্রাহ্য না করে। কি জোর আছে তার ওপর আমাদের ?

প্রশ্ন শুনিয়া কালোশশী শিহরিয়া উঠিল।

অপরিচ্ছন্ন দাঁত দুটি বাহির করিয়া জিব কাটিয়া বলিল, ছি ছি, অমন কথা বলবেন না—কারো ঘাড়ে—

একাধিক মস্তক নাই ইহা সত্য, কিন্তু মেজবাবু হাত তুলিয়া নির্যাতিত কালোশশীর বাক্যোচ্ছ্বাস দমন করিয়া দিলেন।

কালোশশী ঢোক গিলিল, জয়নাব মুখ নামাইয়া রহিল।

কালোশশী বলিল,—মুকুন্দ, তোমার মামলাটাও ফয়সালা করে নাও এই বেলা, তোমার আসামী ত' হাজির।

যেন জয়নাব চূড়ান্ত বিচার পাইয়া নির্বিবাদ হইয়া গেছে।

মুকুন্দের সুদের নালিশ।

পাওনাদার খতের নালিশ করিয়াছিল, ডিক্রীও পাইয়াছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও বাবুরা যদি অনুগ্রহ করিয়া এই ব্যক্তিকে বুঝাইয়া সুজাইয়া সুদ কিঞ্চিৎ ত্যাগ করাইতে পারেন, তবে গরীবের গরু কটি বজায় থাকে।

শুনিয়া পাওনাদার অল্প একটু হাসিল।

এবং বড়বাবু তাহার মামলাও সঙ্গে সঙ্গে "ফয়সালা" করিয়া দিলেন, বলিলেন,—আদালতে ডিক্রীর ওপর হাকিমী করবার অধিকার আমাদের নেই ; আমাদের কথা শুনতে ও বাধ্য নয়।

মেজবাবু বলিলেন, শুনতে আমরা বলতেই পারিনে, তার এক কারণ, উভয় পক্ষের বিবরণে আদালতে যে বৃত্তান্ত আমরা অনবগত। তোমাদের উভয় পক্ষেরই সাক্ষী ছিল ত' আদালতে ?

—ছিল হুজুর !

—তবে ?

হারজিত যারই হোক, বাবুদের ন্যায়বুদ্ধির সংস্কৃত রূপ দেখিয়া পল্লীগ্রামের লোক কয়েকটি বিস্মিত হইয়া গেল, অত ঘুরাইয়া নাক সেকেলে লোক দেখাইত না।

'কেন করবিনে', 'কেন হবে না,' 'কেন দিবিনে'—ইত্যাদি দু'টি একটি হুঙ্কারেই তখন মহা মহা বিবাদ ব্যাপার ঠাণ্ডা হইয়া যাইত, তার দ্বিরুক্তি ছিল না। "আমি বলছি"—বলিয়াই পূর্ব্বেকার কর্ত্তা ব্যক্তিরা আপামরের মধ্যে নিজেকে একাধিপত্যে অটল আর অমেয় করিয়া রাখিতেন। এই মিহি কর্ত্তব্যবোধ আর ঔচিত্য-নিষ্ঠায় উদারতা আর গুণপণা যতই থাক্, সেকেলে দরাজ স্থূল-শক্তির তুলনায় ইহা কাপুরুষতারই নামান্তর ; ইহাতে দরদ নাই, নির্ম্মুক্ত প্রসন্নতা নাই।

অপ্রস্তুতে পড়িয়া মুকুন্দ প্রভৃতি দরখাস্তকারিগণ কালোশশীর মুখের দিকে বিমূঢ়-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল—কালোশশীই এই কাণ্ডের গুরু. একরকম ভজাইয়াই লোকগুলিকে হাজিরা সে দেওয়াইয়াছে।

কিন্তু কালোশশী তাহাদের মুখের দিকে চাহিল না। বাবুদের বিচারবিমুখ দেখিয়া উহারা ক্ষুণ্ণ হইয়া গেলেও কালোশশীর খুসী হইতে বাধে নাই, বাবুরা সাবেকী আর মামুলী পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া "কাজের খতম" করেন নাই, পল্লী-আসরে একটি চমক্‌প্রদ সুচারু বৈশিষ্ট্য দিয়াছেন। অথচ কথাগুলি যা বলিয়াছেন তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য। বটেই ত'। সরকারী মহামান্য আদালত বারমাস খোলা থাকে কিঞ্চিৎ 'ফিস্' দিলেই অবারিত প্রবেশ-পত্র পাওয়া যাইবে. ওরা এ সবের কি জানেন!

বলিল,—তখনই বলেছিলাম. বাবুদের তোরা বিরক্ত করিসনে ; ওদের কাছে নিয়ে আয় আইনের তর্ক, ব্যাখ্যা করে জলের মতো বুঝিয়ে দিবেন। আদালতের স্নাত মারফতে যা শেষ করেছ তার ওপর হাত দেয় গোঁয়ারে—ও'রা তা পারেন না॥ বুঝ্‌লি ত'? এখন যা।

ওরা ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল, কিন্তু সরল সত্যটি কালোশশীকে কেহ বলিয়া যাইতে পারিল না, তুমিই ত' আমাদের আনিয়াছ। তুমিই মিথ্যাবাদী।

ছোটবাবু আকাশের দিকে চাহিয়া ছিলেন।

এমন অপরিমেয় অখণ্ডতা বাস্তবিকই বিস্ময়ের বস্তু ; এমন আনন্দে উদ্বেলিত করিয়া তোলে. যেন অনন্ত আত্মবিলয় ব্যতীত ইহার সঙ্গে যোগাযোগ ঘটিবার অন্য উপায় নাই। এই আকাশই যেন মানুষকে নাচিতে শিখাইয়াছে, ইহার দিকে চাহিয়া মানুষের পা ছন্দধৃত ভঙ্গিমায় উত্থিত পতিত হইয়া, কখন নখাগ্রে ভূমি স্পর্শ করিয়া টিপিয়া টিপিয়া সম্মুখে পশ্চাতে. দক্ষিণে বামে আলোড়িত হইয়াছিল ; কখন বাহুযুগল সম্মুখে প্রসারিত করিয়া. কখন ঊর্দ্ধে উচ্ছ্রিত করিয়া. কখন দেহ দুলাইয়া, কখন দেহ নমিত করিয়া, সঙ্কুচিত করিয়া, ঊর্দ্ধায়িত করিয়া, লতায়িত করিয়া সে প্রথম নৃত্যের সৃষ্টি করিয়াছিল।

তারপর গতি—সূর্য্যালোকে সে পথ দেখিয়াছিল।

পাখীর গানের সঙ্গে সে এমন গান গাহিয়াছিল. যার ভাষা নাই, যার ভাষার প্রয়োজন নাই।

অত্যাশ্চর্য্য নীল-ব্যাপ্তিকে খণ্ডিত করিয়া আর অলংকৃত করিয়া লঘু হস্তের স্পর্শের মতো খণ্ড খণ্ড সাদা মেঘ ভাসিয়া চলিতেছে।

দেখিয়া পৃথিবীকে এমন শান্ত নির্ব্বিকার নিরাপদ মনে হয়, যেন পৃথিবী কেবল এখনই ভূমিষ্ঠ হইল, এখনও তার চোখ ফোটে নাই।

অবাধ চমৎকার রৌদ্র দিক্‌সীমা পর্য্যন্ত মৃত্তিকার অঙ্গ পুলকিত করিয়া তুলিয়াছে।

প্রথম রৌদ্রচ্ছটা দেখিয়া মানুষ কি করিয়াছিল। ইহার ঔজ্জ্বল্য তাহাকে বিস্মিত করিয়াছিল নিশ্চয়, নিষ্কম্প নিষ্পলক দীপ্তি তাহাকে ভীত করিয়াছিল, না কৌতূহলী করিয়াছিল বেশী।

ছায়ায় দাঁড়াইয়া সে ভয়ে ভয়ে পা বাড়াইয়া এক পায় দুই পায় ছায়ার সীমায় যাইয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তারপর অতি সন্তর্পণে রৌদ্রের ভিতর পা দিয়াই গরম লাগায় তাড়াতাড়ি পা টানিয়া লইয়াছিল। একবার লাফাইয়া রৌদ্রে পড়িয়া তখনি ছায়ায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল! এমনি করিয়া কতক্ষণ সে রৌদ্র-ছায়ায় খেলা করিয়াছিল ঠিক কি! অবশেষে দেখা গেল, রৌদ্র ক্ষতি কিছু করে না। ক্রমে একেবারে নির্ভয় হইয়া রৌদ্রে যাইয়া সে অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কোথা হইতে এই অপূর্ব্ব বস্তু আসিতেছে! যে এমন জিনিষ এই শীতল মৃত্তিকায় পাঠাইয়াছে, তাহাকে স্তব কর, সূর্য্যই মানুষের আদি-দেবতা হওয়া উচিত। আকাশের নিম্নে আর রৌদ্রের অভ্যন্তরে দাঁড়াইয়া তাহার কণ্ঠ দিয়া যে অব্যক্ত আনন্দনাদ নির্গত হইয়াছিল, তাহাই বোধ হয় ওম্।

এদিকে কয়েকটি এক আউন্স ওজনের পাখী কি কাজে মাতিয়া উঠিয়াছে তাহার উদ্দেশ নাই। একটি বৃক্ষবীথিকার দুধার পল্লবে অন্ধকার, মাঝখানে বিহসিত আলোর অচঞ্চল ধারা।

পাখীগুলি তাহার মাঝে সরিয়া আসিয়াছে, একই পরিবারের কয়েকটি, তীর বেগে তারা ছুটাছুটি করিতেছে। যেন কোথায় কি ঘটিতেছে তাহা তখনই তাদের জানা চাই-ই—একই সময়ে সর্ব্বস্থানে উপস্থিত থাকিতে না পারিলে দেখাটা বাদ পড়িয়া যাইবে, সোজা পথে তাই এক নিমিষের বেশী সময় ছুটিবার উপায় নাই, এই ডাইনে, এই বাঁয়ে, এই উপরে, এই নীচুতে; মুহুর্ম্মুহুঃ দেখা দিয়া তারা পাশেই কোথায় অন্তর্হিত হইতেছে।

একটি প্রজাপতি উড়িতেছে।

ছোটবাবু বিস্মিত হইলেন, অত সূক্ষ্ম পক্ষ দুটি অত আন্দোলন সহ্য করিতেছে কেমন করিয়া। মানুষের সুখ, বিচরণের লালসা আছে, আর সৌন্দর্য্যের সন্ধানী সে, কিন্তু আজও সে প্রজাপতিটির রূপের অনুকরণ আর অন্তরের অনুসরণ করিতে পারে নাই। বোঁ করিয়া একটা বোলতা কানের পাশ দিয়া উড়িয়া গেল, ছোটবাবু চমকিয়া উঠিলেন; বলিলেন—তারপর?

মেজবাবু হাসিয়া বলিলেন,—কিসের তারপর। তারা সবাই চলে গেছে!

কিন্তু তারা চলিয়া গেলেও অপরে আসিতেছিল, তখনই একটা বুক-ফাটা চীৎকার শোনা গেল,—দোহাই বাবুদের—গরীবের মা-বাপ।

বাবুরা উদগ্রীব হইলেন।

চীৎকার শব্দ অগ্রসর হইতে লাগিল এবং দেখিতে দেখিতে নিকটবর্ত্তী হইয়া বাবুদের সম্মুখস্থ হইয়া দাঁড়াইল।

বাবুরা দেখিলেন, লোকটি প্রৌঢ় এবং তাহার হাতে ধারাল একখানা কাটারি রহিয়াছে।

—কি খবর ?

প্রশ্নের উত্তরে লোকটি যাহা বলিল তাহা এই ; সে তার গাভীটি খুঁজিয়া পাইতেছিল না, কাল দ্বিপ্রহর হইতে। আজ প্রাতঃকালে দক্ষদমন সিকদারের কথায় তাহার বিস্মৃত কথা মনে পড়িয়া যায় এবং দেখিতে পাওয়া যায় যে, দক্ষদমন সিকদারের দেওয়া সংবাদ সত্য, গরু খোঁয়াড়ে আছে। তাহার নাম মদন, কিন্তু গগন নামে এই গ্রামে একটি লোক বাস করে, যাহার কাজ কেবল পরের গরু তাড়াইয়া লইয়া খোঁয়াড়ে ঢুকাইয়া পয়সা লওয়া, ইহাকে দিনে ডাকাতি বলিতেই হইবে। গগনের অত্যাচার অসহ্য হইয়াছে : বাবুরা ইহার 'বিহিত' না করিলে সে কাটারির সাহায্যে নিজেই অন্যায়ের প্রতিকার যতদূর পারে করিবে, বাবুরা যেন তখন তাহাকে দুষ্ট লোক মনে করিয়া অপরাধী করিয়া না বসেন। অভিযোগ নিবেদন করিয়া এবং কাটারি রাখিয়া মদন বাবুদের শ্রীচরণে ভক্তিভরে প্রণত হইল, কিন্তু তাহার নাক দিয়া যে ফোঁস ফোঁস শব্দটা নির্গত হইতেছিল তাহা ক্ষান্ত হইল না।

মেজবাবু প্রশ্ন করিলেন, গরুটি ছাড়িয়ে আনতে তোমার কত লেগেছে ?

—পাঁচ আনা, বাবু।

—পাঁচ আনার জন্যে তুমি মানুষকে কাটারি দেখাচ্ছ! তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত।

ছোটবাবু বলিলেন, তুমি ছেলেমানুষী করছ। মেজাজ ঠাণ্ডা করে আমাদের সামনে তোমার দুঃখ জানালে একটা উপায় বলে দিতে হয়তো পারতাম ; কিন্তু তুমি আস্ফালন করে আমাদের মন বেঁকিয়ে দিয়েছ। বুঝলে ?

মদন বুঝিতে পারে নাই যে, আর কেউ না হোক, ছোটবাবু তাহার ক্ষতিতে নয়, তাঁহাদের সম্মুখে অসংযত আচরণে দুঃখিত হইয়া গেছেন।

মদন কথা কহিল না, কেমন অপ্রতিভ হইয়া রহিল।

বড়বাবু বলিলেন, তোমার কথা সত্যি তা কেমন করে জানব ?

বড়বাবুর মনে হইতেছিল, সমগ্র ব্যাপারটা খুব প্রকাণ্ড হইয়া উঠিতে পারে।

মদন বলিলও তাই।

—আমি গাঁয়ের লোক সবাইকে ডেকে এনে প্রমাণ দিচ্ছি, বাবু, যে ওর স্বভাবই ঐ।

ছোটবাবু শিহরিয়া উঠলেন ; বলিলেন, থাক। আমরা বিচার করবার কে! সে ভার আমাদের নিতে যাওয়া অনাবশ্যক। যদি আর কোনো কথা না থাকে তবে যেতে পারো।

মদন কাটারিখানা তুলিয়া লইয়া নিঃশব্দে চলিয়া গেল।

এবং সেই পথেই আর পরক্ষণেই যে ব্যক্তি প্রবেশ করিল, দেখা গেল, তাহার হাতে একটি চারা-গাছ রহিয়াছে, চারাটির মূল একটি সিক্ত মৃত্তিকা-স্তূপে প্রোথিত।

ছোটবাবু দেখিলেন, পাতাগুলি তার চমৎকার সতেজ। লোকটি মৃত্তিকা-

স্তূপসহ চারা গাছটিকে রোয়াকের উপর খাড়া করিয়া বসাইয়া দিল ; তারপর মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া বলিল, বিলিতি আমড়ার চারা, বাবু ; আপনাদের দেব বলে এনেছি। বলিয়া লোকটি নিজের দানের গৌরবে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতে লাগিল. বলিল, এমন আমড়া এ-গাছে ফলবে যা বলতে নেই, আম ফেলে খাবেন। কোথায় বসাব।

বাবুদের হাসি পাইতে লাগিল, কিন্তু কেহ হাসিলেন না।

মেজবাবু মিষ্টকণ্ঠে বলিলেন. তোমার বাড়ীতে বসাও গিয়ে, আমরা আজ আছি কাল নেই।

—ছি ছি, তা কি হয়! দেব বলে এনেছি, ফিরিয়ে নিয়ে যাব না। বলিয়া সে দু'বার মাথা নাড়িয়া বলিতে লাগিল, তা নিয়ে যাব না। আর আজ আছি কাল নেই, ও-কথা বলতে নেই। আপনারা চিরদিন বজায় থাকুন ধনে-পুত্রে। এই গাছে আমড়া ফলবে, আপনাদের ছেলেমেয়েরা ঝোল-অম্বল খাবে আর বলবে, গিরি কেওটের গাছের আমড়ার ঝোল-অম্বল খাচ্ছি। বসিয়ে দিয়ে যাই, বাবু ! বলিয়া গিরি কেওট অতিশয় সকরুণ-দৃষ্টিতে বাবুদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, যেন এই অপার সংকটে ত্রাণ তার চাই-ই।

এই উপঢৌকনের সামগ্রী অপূর্ব, তাহা লওয়াইবার জিদও অপূর্ব, লোকটির আশাও অপূর্ব।

এবং প্রত্যাখ্যান করিলে তাহার হতাশাও অপূর্ব হইবে মনে করিয়া ভীত হইয়া বড়বাবু বলিলেন, তা বেশ. তোমার ইচ্ছে হয়েছে যখন তখন রুয়ে দিয়ে যাও, যেখানে তোমার খুশী।

অনুমতি লাভ করিয়া গিরি কেওটের দেহ যেন আনন্দে দীর্ঘতর হইয়া উঠিল।

আরও ভক্তিসহকারে প্রণাম করিয়া সে স্মৃতি-চিহ্ন রোপণ করিতে চলিয়া গেল।

বাবুরা হাসিতে লাগিলেন।

তিনজনেই দেখিলেন, একটি শীর্ণদেহা কুক্কুরী ছুটিয়া আসিল, পশ্চাতে তার পাঁচটি স্তন্যপিপাসু সন্তান, কুক্কুরী অদূরে পা মেলিয়া দিয়া মাথা খাড়া করিয়া শুইল ; বাচ্চাগুলি স্তনে মুখ লাগাইবার শশব্যস্ত ব্যাকুলতায় কাহার ঘাড়ে কে চাপিল, তাহার ঠিক রহিল না, সকলে মুখ না লাগাইতেই জননী উঠিয়া পড়িল, বাচ্চাগুলিকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া ছুটিয়া পলাইল।

ছোটবাবু একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন, তাঁর মনে হইল, পরিত্যক্ত সন্তানগুলির পেট ভরা দূরে থাক, গলাই ভেজে নাই। তিনি উঠিয়া রোয়াকের উপর পায়চারি করিতে লাগিলেন।

দূরে কোন বাদ্যব্যবসায়ীর গৃহে সানাইয়ের শব্দ হইল, শিক্ষানবিশের ফুৎকারে যন্ত্র দিয়া যে আওয়াজ বাহির হইতে লাগিল তাহা মধুর কিছুতেই নয়, সানাইয়ের আশে-পাশে ঢোলেও কয়েকবার কাঠি পড়িল।

একটি বায়সী তার সন্তানের গলার ভিতর খাদ্য প্রবেশ করাইয়া দিতেছে, বাচ্চার এতবড় হাঁ, ভিতরটা লাল ; তার ক্ষুধার যেন ইয়ত্তা নাই, মায়ের মুখ হইতে আহার্য্য গ্রহণ করিতে তার এমনি কলরব আর অস্থিরতা।

সানাইয়ের শব্দ বন্ধ হইয়া গেল।

কোথায় একটা কোলাহল সুরু হইয়াছিল—সানাইয়ের শব্দে চাপা পড়িয়া বোধ হয় তাহা কর্ণে প্রবেশ করে নাই; সানাই থামিতেই তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

স্বীয় পল্লী অন্তর স্পর্শ করিতেছে না, ক্ষুণ্ণ এবং আনমনা হইয়া তিনজনেই ইহা ভাবিতেছিলেন, এবং সম্ভবতঃ একটা আলোচনার সৃষ্টি হইত, কিন্তু ঐ কোলাহল শুনিয়া তিনজনেই উৎকর্ণ হইয়া উঠিলেন।

ছোটবাবু যাইয়া রোয়াকের প্রান্তে দাঁড়াইলেন; সেখান হইতে কালোশশী কর্তৃক নির্ম্মিত গেট দেখা যায়, কিন্তু বেণুবন ও আম্র-বাগিচার অন্তরালে কি ঘটিতেছে তাহা জানিবার উপায় নাই।

বড়বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—গোলমাল কিসের?

মেজবাবু বলিলেন, আমরা কেউই তা জানিনে।—এমন অপ্রত্যাশিত ব্যাপার সব দেখতে হচ্ছে যে, আমি ত' অবাক হয়ে গেছি। বলিতে বলিতেই ছোটবাবু তাড়াতাড়ি আসিয়া আপন আসনে বসিয়া পড়িলেন।

—কি? বলিয়া মেজবাবু উৎকণ্ঠিত হইলেন।

ছোটবাবু বলিলেন, অনেকগুলি লোক এদিকে আসছে।

—আসুক। বলিয়া মেজবাবু, তাহাদের আসিবার সম্ভাবনা যেদিক হইতে সেইদিকে চাহিয়া রহিলেন।

বড়বাবু বলিলেন, কিছুই ভাবতে দিচ্ছে না।

তৎক্ষণাৎ যে ব্যক্তি আসিয়া দাঁড়াইল, বাবুরা দেখিলেন, সম্পূর্ণ নগ্ন হইয়া যাইতে তার অল্পই বাকি আছে, বস্ত্র বলিয়া যে আবরণ সে ধারণ করিয়াছে তাহা এমনি ক্ষুদ্র; কিন্তু তার কাঁধের লাঠিখানা খুবই বড় আর বলিষ্ঠ।

লোকটি খুব উত্তেজিত হইয়াই আসিয়াছিল। কিন্তু বুঝা গেল, সুস্থির হইয়া সে কথা বলিতে চায়।

ছোটবাবু শঙ্কায় আশায় মিলিত একটা ভাব লইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন; কিন্তু আর কেহ দেখা দিল না। খানিক নিঃশব্দ থাকিয়া এবং সম্ভবতঃ ক্রন্দন দমন করিয়া সে বড়বাবুর সৌম্য-মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া বলিল, এ গাঁয়ে আর থাকা গেল না, বাবু, গাছের ফল লুটে নিতে লেগেছে, আপনাদের দুয়োরে এসে দাঁড়ালাম—আমি বিচার চাই আপনাদের কাছে।

কাংস্য এবং মৃৎপাত্রের মতো পরস্পরের এই অবিরাম ঠোকাঠুকি এবং একজনের গাত্রে অনিবার্য্য ছিদ্র হওয়ার কাহিনী ভাল লাগিবার কথা নয়; তবু বড়বাবু মিষ্টস্বরে বলিলেন, কি হয়েছে তোমার বলো!

কিন্তু শুনিয়া উঁহাদের মনে হইল, বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া ছাড়া আর কিছুই হয় নাই!

লোকটি বলিল, তাহার সুপারি গাছে উঠিয়া প্রতিবেশী মেহেরের ছেলে আদু রাশীকৃত সুপারি ছিঁড়িয়া লইয়া গেছে ৮।১০টা খুব হইবে। অপক্ক সুপারি যাহা সে গাছের তলদেশে ফেলিয়া গেছে, তাহার নমুনা সে হাতে করিয়াই আনিয়াছিল, বাবুদের সে তাহা দেখাইল। ইহা ছোটখাট চুরি নহে; দিবাভাগে ঘটিয়াছে বলিয়া ইহা দুঃসাহসিক ডাকাতি, এবং পিতামাতার প্ররোচনায় ঘটিয়াছে

এরূপ সন্দেহ করিবার কারণ আছে বলিয়া ইহাকে প্রশ্রয় দিবার ফল আরো ভয়ঙ্কর, চোরের বাপের মায়ের কথায় যে বিশ্বাস করে সে অখাদ্য খায় ; তাহারা যত পারে অস্বীকার করুক, বাবুরা যেন তাহা বর্ণাক্ষরেও প্রত্যয় না করেন। তাহারা সবাই মিলিয়া একই সুরে তাহাকে গালি দিয়াছে, এবং তাহাদের মনে যে পাপ আছে তাহার অকাট্য প্রমাণ এই যে, বাবুদের সম্মুখীন হইতে তাহাদের সাহস হয় নাই।—এখন, বাবুরা কি সুবিচার করেন তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে—

অতিশয় বাহুল্যদোষযুক্ত ভাষায় এবং অসহিষ্ণু ভঙ্গীতে এই অভিযোগ এবং কাঁচা সুপারিটি বাবুদের সম্মুখে স্থাপিত করিয়া সে রোয়াকের উপর উঠিয়া পা ঝুলাইয়া বসিল।

ছোটবাবু বলিলেন, তোমার সঙ্গে যারা আসছিল তারা কই ?

লোকটি হঠাৎ নামিয়া দাঁড়াইল ; বলিল, তারা ফিরে গেছে, বাবু।—সাক্ষী আমার আছে, বাবু ; বলেন ত' ডাকি।

—না, দরকার নেই।—আমরা বলি, তুমি আদুকে ক্ষমা করো ; সামান্য ৮৷১০টি সুপারি ত' !—বলিয়াই মেজবাবু দেখিলেন, লোকটির চোখে বিস্ময়ের যেন অন্ত নাই।

এবং বাবুত্রয়কে বিস্মিত করিয়া সে বলিল, আপনারা বুঝলেন না আমার কথাটা, ভগবান নারাজ, যারা ভাল করতে পারে তাদের মনও তিনি কেড়ে নিয়েছেন ; আমাদের জন্যে রাখেন নাই।—বলিয়া লোকটি প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল ; বাবুরা প্রশ্ন করিবার সময়ই পাইলেন না।

বড়বাবু কুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, কি অপরাধ করলাম।

—তা জানিনে বড়দা ; শেষ করো। বলিয়া মেজবাবু উঠিলেন।

রামহরিকে ডাক পড়িল, চেয়ার চৌকি ঘরে উঠিল ; বাবুদের বিশ্রামের অবসর মিলিল।

পল্লীকে কমনীয় নম্র শান্তিনিকেতন কল্পনা করিয়া ইঁহারা তাহাকে বিচার নয়, প্রশংসা নয়, সম্ভোগ নয়, কেবল একখানি অত্যাশ্চর্য্য ছাঁচের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিতেন, কিন্তু তাহার যথার্থ স্বরূপ দেখিয়া বিব্রত কি বিস্মিত হইলেন না, হতাশ হইয়া গেলেন—তাঁহাদের অনিন্দ্য ভাবমূর্ত্তির বিকৃতি যেন তাঁহাদের আত্মকৃত পাপে পরিণামের মতো সুপ্রত্যক্ষ হইয়া দেখা দিল।

মাত্র গুটিকতক সুপারির জন্য অত বড় আলোড়ন উপস্থিত করা শুধু আধ্যাত্মিকতার অভাবেরই লক্ষণ নহে ; অত্যন্ত নির্লজ্জ স্বার্থোপাসনার পরিচয়।

মেজবাবুর মনে হইল পল্লীর শান্তি পল্লীরই শান্তিপ্রিয়তার রচনা নহে, আবহাওয়ার গুণ নহে, তার নিঃসঙ্গ নিমজ্জমান অন্তরের বেদনা নহে, কেবল কুঁড়ের যা দোষ—সেই ঝিমুনি। আরো তাঁর কণ্ঠ হইতে লাগিল ইহাই উপলব্ধি করিয়া যে, পল্লীর নিজস্ব মাদকতা নাই, কেবল কঠিন আত্মপরায়ণতা মানুষগুলির প্রত্যেককে যেমন করিয়া আপন আপন গণ্ডীর ভিতর স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছে, যে ইহার সংস্রবে তাহাকেই তেমনি চারিদিককার অজ্ঞাত স্থান হইতে বিশীর্ণ আঙ্গুল বাড়াইয়া যেন ফাঁদে জড়াইয়া গ্রাস করিয়া ফেলিতে চায়।

তিনি দেখিতে ভুলিয়া গেলেন যে, শ্রুতি-উৎপীড়ক যত গন্ডগোল এ-পর্য্যন্ত তাঁহারা শুনিতে পাইয়াছেন, তার প্রত্যেকটিই অর্থসমস্যামূলক—এবং তাহা অতি গভীর। যাহার সুপারি চুরি গিয়াছে, ঐ সুপারি ক'টিই ছিল তার অন্ততঃ এক সপ্তাহের নুন-তেলের সংস্থানের উপায়, সুপারি পয়সায় পাঁচটি। গগন প্রামাণিক বনাম মদনচন্দ্র মামলাতেও তা-ই—ঐ পেটের দায়. মদন নির্দ্দোষ গরুকে লইয়া খোঁয়াড়ে দিয়া কিঞ্চিৎ নুন-তেলের পয়সা করিয়াছে—এবং মদনের পাঁচ আনা অপব্যয়িত না হইলে ঐ পাঁচ আনায় কত কি যে হইতে পারিত তাহার ইয়ত্তাই নাই। ফন্দ' করিয়া লটকানা দোকানে দিলে ঐ পাঁচ আনায় পঁচিশটি ছোট-বড় মোড়ক পাওয়া যাইত। স্ত্রীর সম্পত্তিতে বঞ্চিত করিয়া যাহাকে শ্যালকেরা পথে বসাইবার উদ্যোগ করিতেছে সে ভাবিতেছে, স্ত্রীর ঐ পাঁচ আনা ছয় গণ্ডা দুই কড়া দুই ক্রান্তি অংশ তাহার আয়ত্তে থাকিলে তার অভাব কমিবে. শ্যালকেরা ভাবিতেছে, ভগিনীর ঐ অংশটুকু যে-সে করিয়া লিখিয়া লইতে পারিলেই কিছু আয় বাড়িবে।

আশু প্রয়োজনের অতিরিক্ত এতটুকু এককণা তাহাদের কাহারো ভাণ্ডারে নাই, মনের ভুলেও নাই, যাহার যতটুকু যাক্ ততটুকুই অমূল্য ও অত্যাজ্য, মনের তরতিব ভাঙ্গিয়া তাহাতেই তার পাগল পাগল ঠেকে। তাহাদের অবিরাম মনে হয়, যেন কাহারো অনুপস্থিতির সুযোগে আসিয়া বসিয়াছে. সে আসিলেই উঠিয়া যাইতে হইবে ; তাই তাহাদের ধৈর্য্য এত কম।

ছোটবাবু ভাবিলেন, প্রকৃতির প্রসন্নতা, ক্রীড়াশীলতা ও সাত্ত্বিকতা ইহাদের চোখের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াও ইহাদের মনের গুহায় প্রবেশ করিতে পারে নাই ; তাই এরা এত সঙ্কীর্ণ।

বড়বাবু ভাবিলেন, দৈববিড়ম্বনায় কোনো কাজই যেন মনের মতো সুষ্ঠু হইতেছে না. লোকগুলি তাঁদের অপরিপক্ক মনে করিতেছে কি অকালপক্ক মনে করিতেছে কে জানে? জ্যাঠামশায় কি বিপদেই ফেলিয়াছেন। লোকটার হাতের কাটারিখানা কি ভয়ঙ্কর! লোকগুলির দৃষ্টির আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখা গেল, কখন একনিবিষ্ট, কখন বুদ্ধিতে উজ্জ্বল, কখন প্রবীণোচিত গম্ভীর কিন্তু নিঃস্পৃহ ; কিন্তু চোখের তারা কোণের দিকে আনিয়া যখন পাশের দিকে চায়, তখন ভয় করে, অত্যন্ত ধূর্ত্ত চাহনি. দুঃসাহসী আর নির্ম্মমও বটে, মানুষের যে কোনো হানি যে কোনো সময়ে যে কোনো কারণে করিতে পারে!

কিন্তু ইঁহাদের এবং ইঁহাদের তুল্য কলিকাতাবাসী বাবুদের সম্বন্ধে কালোশশীর গোপন মতামত অবগত হইলে ইঁহারা এবং তাঁহারা সমান অবাক হইয়া যাইবেন। কালোশশী একবার কলিকাতা যাইয়া অনেকের বাসস্থান এবং কর্ম্মস্থল দেখিয়া আসিয়াছিল।

প্রথমেই তার মনে হইয়াছিল, ইহাদের দুবেলা ক্ষুধা হয় না নিশ্চয়ই ; "পায়রাখুপীর" মধ্যে আবদ্ধ জীবগুলি মাথায় হাড় না ভাঙিয়াও এদিক ওদিক কেমন করিয়া বেড়ায় তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় হইলেও পারিপাট্য প্রশংসনীয় বটে, দিব্যি ফিটফাট্। মানুষের কথা ছাড়িয়া দিলেও, গরুটি কি বাছুরটি যে একবার লেজ তুলিয়া দৌড়াইয়া আসিবে সে স্থান লোকালয়ের কাছে কোথাও নাই ;

গরু বাছুরেরই কষ্ট বেশী—শীতে ঠিরঠির করিয়া কাঁপে ; একটু রৌদ্র পায় না। লোকের ঐশ্বর্য্য খুব, তিরিশ হাজার মটর গাড়ী দিনরাত ছুটাছুটি করিতেছে—গণিয়া কেহ দেখিতে পারে না ; গাড়ীর সম্মুখে ও পশ্চাতে নম্বর থাকে। বাবুর নীচের গদি, তাঁর কোমর হইতে মাথা পর্যন্ত গদির উপর বসান থাকে. বাবু মোটরের ভিতর বসিয়া থাকেন. আর সংবাদপত্র পাঠ করেন ; যাতায়াতের ঐ সময়টাই তাঁর পাঠের অবসর। বাড়ীর পর বাড়ী গায়ে গায়ে লাগা, সম্মুখে বাড়ী, পশ্চাতে বাড়ী. মানুষ যে চোখ মেলিবে তাহার একটু ফাঁক নাই।

দেখিবার জিনিষ ? ঢের আছে ; কিন্তু আমরা তার কি বুঝি ! তবে হ্যাঁ, ব্যবসার স্থান বটে, জাহাজ, নৌকা, রেল, ষ্টিমার মটর, গো-যান যাহা চাও পয়সা দিলেই প্রস্তুত। তিন দিন তিন রাত্রি ছিলাম, দিনে ক্ষুধা পায় নাই, রাত্রে নিদ্রা হয় নাই, গ্রামে আসিয়া শরীরে বাতাস লাগাইয়া তবে বাঁচি।

বাবুরা ? এ-বাবুতে সে-বাবুতে কলিকাতায় তফাৎ কিছু নাই, ভিড়ের ভিতরে সবাই সমান নগণ্য আর বোধ হয় অপদার্থ. তবে যাহার কাছে যাহার খাতির তাহার কাছেই সে বড়।

পল্লীগ্রামে আসিয়া ইহারা কেহ কেহ একটা অদ্ভুত ভাব ধারণ করেন, মনে ভয়, মুখে বাচালতা, যার নাম দিতে চান সপ্রতিভতা ; তাঁরা মনে করেন, নির্ব্বোধেরা তাঁহাদের অস্বাচ্ছন্দ্যের অস্থিরতা ধরিতে পারিতেছে না। তাঁহাদের চতুরতা, বুদ্ধি, আর যে কোনো ব্যাপার চক্ষের পলকে বুঝিয়া ফেলিবার অসাধারণ ক্ষমতার কাছে ইহারা একেবারে বেচারা। কিন্তু ধরা পড়িয়া যান কথায়।

এক বাবু কালোশশীকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তোমরা জল খাও কোথাকার ?

কালোশশী এই বাহুল্য প্রশ্নের উত্তরে মনে মনে কৌতুকী হইয়া প্রকাশ্যে ঘাড় হেঁট করিয়া বলিয়াছিল,—আজ্ঞে, নদীর জল।

—এই মরা নদীর নোংরা জল খেয়ে মানুষ বাঁচতে পারে হে ? আমাদের কলের জল খাওয়া অভ্যাস, বুঝলে ?

কালোশশীর মনে হইল, বাবু একটি আর্ত্তনাদ চাপিয়া গেলেন ; সে ঘাড় আরো নোয়াইয়া বলিয়াছিল, আজ্ঞে, তা বই কি, আপনারা যে এদিকে আসেন সে ত' প্রাণ একেবারে হাতে ক'রে ! আপনাদের দয়া অগাধ তাই ত' আসেন। বলিয়া কালোশশী পরম দয়ালুর প্রতি কৃতজ্ঞতায় গদগদ হইয়া গিয়াছিল। বাবুরা যেন পল্লীবাসীর সৌভাগ্যশালী জ্ঞাতি-পুরুষ, অধঃপতিত আর বহুদূরবর্ত্তী এ-পুরুষের সঙ্গে মাত্র একটা গোত্রের সম্বন্ধ আছে, তাহা যিনি চক্ষুলজ্জায় লুকাইয়া রাখিতে চান না, তিনি দরিদ্রের কৃতজ্ঞতাভাজন।

বাবুটি বলিয়াছিলেন,—হ্যাঁ, আসব বই কি ! পল্লী ছাড়া কি আমাদের গত্যন্তর আছে ? ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে আমরা খুব ভাবছি ; আর চাষের কথাও আমাদের সভায় মাঝে মাঝে আলোচিত হয়—বিশেষজ্ঞ আছেন। খবরের কাগজে দেখে থাকবে।

কালোশশী সময় বুঝিয়া কোট পরিয়া দেখা দিলেও খবরের কাগজে কি থাকে তাহা কস্মিনকালেও জানে না ; কিন্তু অম্লানবদনে বলিয়াছিল,—আজ্ঞে হ্যাঁ ; আপনার নাম আমি বহুবার খবরের কাগজে দেখেছি।

শুনিয়া বাবুটি কালোশশীকে নিজের পাশে বসিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

বলিয়াছিলেন,—কিন্তু মুস্কিল কি জান! সব পল্লীরই এক সমস্যা নয়, কারো জলাভাব, কারো রোগ, কারো দারিদ্র্য, কারো আবার গো-সংকট; আবার, সে বৎসর একটা গ্রামে গিয়েছিলাম। পর্ব্বতাকার মাটির ঢিপির ওপর তারা ঘর বেঁধে বাস করে, আর বর্ষাকালে কোন একটা খাল দিয়ে নদীর জল ঢুকে ধান-পান নষ্ট করে ফেলে, তাদের সমস্যা ঐ খালটা, জলের বেগে কোন বাঁধই টিকছে না। কারো আবার তিন মাইল লম্বা এক খাল কেটে দিতে পারলে সুবিধে হয়, বর্ষার জল বেরিয়ে গিয়ে আবাদ চলতে পারে। দেখ কি দুরূহ ব্যাপার। তবে আমরা সাধারণভাবে শ্রেণীবিভাগ করে নিয়েছি, ম্যালেরিয়া আর গোচারণভূমিই আমাদের প্রথম লক্ষ্য হবে। একটিকে তাড়াব, আর একটাকে তৈরী করব। জিজ্ঞাসা করবে, কেমন ক'রে তৈরী করব? ফসলের জমি যদি ফসল বেশী দেয়, ঢের বেশী, তবে লোকে খানিকটা জমি গরুর জন্যে উদ্বৃত্ত করে রেখে দিতে অক্লেশেই পারবে। ভূমিকে উর্ব্বরা করো—সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কি বলো তুমি?

কালোশশী বলিয়াছিল, আজ্ঞে হ্যাঁ। একদিন মাথা ধরায় বাবুটি গ্রামের উর্ব্বরা ও অনুর্ব্বরা ভূমির আনুমানিক পরিমাণ লিখিয়া লইয়া তাড়াতাড়ি প্রস্থান করিয়াছিলেন। মুর্গীর ডিমের দাম এখনও রহিমতুল্লার পাওনা আছে।

তার পর তিন বৎসর কাহাকেও এদিকে দেখা যায় নাই। এবার বাবুরা আসিয়াছেন!

সেই দিনই—

তিন ভাই নদীর ধারে ধারে বেড়াইতে বেড়াইতে ছোটবাবু সহসা বিস্মিত হইয়া দেখিলেন, "গোধূলি" শব্দটা তাঁর মনে পড়িয়া গেছে, দিনান্তে প্রতিদিনই এই মনোরম লগ্নটা নিশ্চয়ই আসে, এখানে সেখানেও; কিন্তু কলিকাতার পার্কে বেড়াইবার সময় ঐ শব্দটা কদাপি তাঁর মনে পড়ে নাই। সূর্য্য এখন কোথায় তার ঠিক নাই, কিন্তু তাঁর বিপরীত প্রান্তে মেঘে মেঘে যে অগণিত বর্ণের মুহুর্মুহুঃ গ্রহণ আর মোচন ঘটিতেছে তাহা কেবল আকাশের নয়, চোখের নয়, মনেরও সম্পদ।

ছোটবাবু হাসিয়া বলিলেন, বড়-দা, আমি কবিতা লিখতে পারি বোধ হয়, দিন কতক এখানে থাকলে না লিখে পারব না।

—হঠাৎ?

—দেখছি তাই। 'গোধূলি' কথাটা ভারি মনে পড়ে গেল; আর মনে পড়ে ভাল লাগছে।

মেজবাবু ইংরেজিতে প্রকাশ করিলেন,—ভাল লাগার কারণ, মনে তোমার গোধূলির রূপ একটা ছিলই; সেইটে এই সময়ে বাইরে তোমার নজরে পড়েছে, এটাকে কাব্যের উদগার বলা যায়। এ সময়ে অনেকের বিয়ের কথাও মনে পড়ে যেতে পারে।

বড়বাবু বলিলেন,—আমার ভয় হচ্ছে, আমরা কিছুদিন এখানে থাকলে লোকে প্রকাশ্যেই আমাদের ঘৃণা করবে। আমরা এদের সঙ্গে মিশতে পারছিনে।

—তার বাধা ওরাই। বলিয়া মেজবাবু হাতের ছড়ি প্রবলবেগে ঘুরাইতে লাগিলেন।

—না বলেই মনে হয়। ওরা যে সকাল বেলা এসেছিল, ঠিকই এসেছিল; আমরা তাদের মনের ইচ্ছেটা ধরতে না পেরে তাদের ক্ষুণ্ণ করেছি। আমরা হস্তক্ষেপ না করায় যে জিতে গেছে সে-ও সন্তুষ্ট হয় নি।

ছোটবাবু হাসিয়া বলিলেন, কি করে ভেতরকার এত কথা জানলে?

—যে সুদের টাকা কমাতে এসেছিল, সে ডিক্রীদারকেও সঙ্গে এনেছিল, অত সহজে সে মুস্কিলে পড়তে আসত না যদি মনে মনে একটা কিছু সম্ভোগের আশা তার না থাকত। আমরা প্রচণ্ড একটা কথা কাটাকাটি ঝগড়ার পর তাকে জিতিয়ে দিলে সে লাফাতে লাফাতে যেত, জিতে তার সুখ হয় নি। ঢোঁড়া সাপকে দেখে মানুষ হাসে; অতি নিরীহ লোককে মানুষ অবজ্ঞা করে, বলে ঢোঁড়া, কিন্তু গোখরোকে দেখে ভয় পেলেও তার উগ্রতাকে ভালবাসে।

মেজবাবু বলিলেন, তুমি মনস্তত্ত্ববিদ তা জানতাম না—এবার কেউ এলে 'ফুল বেঞ্চে' ফেলে খানিক লাঠালাঠি করে কাজের গৌরব বাড়িয়ে অবশেষে তাকে ছুবলে দেওয়া যাবে।

ছোটবাবু বলিলেন, তা দিও, কিন্তু এদিকে আমি যে দেউলে হ'য়ে যাচ্ছি।

—কিসে?

—নদীতে যদি স্রোত না থাকে, তবে বড শোচনীয় হয় না! মনে হ'চ্ছে গ্রামটারই যেন নাড়ী বসে গেছে, গেছেও তাই। এমন সুন্দর সময়ে নদীর ধারটিতে কেউ বেড়াতে আসে নি—ঘরে বসে মশার কামড় খাচ্ছে।

বড়বাবু বলিলেন, তারা আঁতুড়-ঘর থেকে বেরিয়েই নদীর ধার দেখছে, রোজ রোজ কি আর নূতন জিনিষ দেখতে আসবে!

শুনিয়া ছোটবাবু ভাবিলেন, ইহাদের একটি চক্ষুষ্মাণ অভিভাবক চাই, যে নিজের চক্ষে দেখিয়া উহাদের দেখাইবে প্রকৃতির এই চরম প্রফুল্লতা।

বড়বাবু বলিতে লাগিলেন, এখানকার ডাকঘরের কেমন বন্দোবস্ত জানিনে, কাগজখানা পেলাম না। 'এ্যাপ্রুভারের কনফেসনটা' বেশ 'ইন্টারেষ্টিং' হচ্ছে।

মেজবাবু—কোন কেসটায়?

বড়বাবু উত্তর-ভারতের একটি প্রকাণ্ড ষড়যন্ত্রের মামলার নামোল্লেখ করিলেন, বলিলেন, 'এ্যাসটাউণ্ডিং ডেভালপমেণ্টস' হবে বলে মনে হচ্ছে।

মেজবাবু বলিলেন, চল কলকাতায় ফিরে যাই। জ্যাঠামশায় অসন্তুষ্ট হলে কি আর করা যাবে।

সংবাদপত্র না পাওয়ায় বড়বাবু সায় দিলেন, বলিলেন, আমারও যাবারই ইচ্ছে। এখানে বসে তিনদিনেই আমরা এত পিছিয়ে যাব যে, কলকাতায় গেলে মণ্টু আমাদের নতুন খবর দেবে।

মণ্টু বাবুদের পাঁচ বৎসর বয়স্কা ভগিনী-কন্যা।

এ-কথাটা সবারই মনঃপূত হইল।

নূতন নূতন আবিষ্কারের সংবাদ আর দেশ-বিদেশের মণীষিগণের বাণী নিত্য প্রচারিত হইতেছে, তাহার একটি একবার অজ্ঞাতে ঘটিয়া গেলে বিশ্বের নাগাল

আর পাওয়া যাইবে না, 'ফ্যাসানে' পিছাইয়া পড়ার মতো বর্ব্বরতা আর কিছু নাই।

তিনজনেই সমান শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন।

একটা ছাগল চরিয়া বেড়াইতেছিল। সে পেট ভরাইবে সংকল্প করিয়া বাহির হইয়াছিল; তার সে সংকল্প সারাদিন চরিবার পরেও তেমনি সতেজ আছে বলিয়া মনে হইতেছে। দূরের একটা ঘাটে নামিয়া দুইটি স্ত্রীলোক জল লইয়া যাইতেছে, দূরে নদীর যেখানে বাঁক ঘুরিয়াছে সেখানে কয়েকটি বাবলা গাছ, তার নীচে একটি বাঁশ আর একটা বালিশ পড়িয়া আছে।

ছোটবাবু বলিলেন, সে স্ত্রীলোকটি আজ আবার কাঁদলে আমি তার কাছে গিয়ে তাকে দেখে আসব।—মড়া কান্নায় হঠাৎ ভয় করে, কিন্তু এমন করে জড়িয়ে ধরে না।

সেই অন্ধকারই আসন্ন দেখিয়া তিন ভাই নিঃশব্দে বাড়ী ফিরিলেন।

বাড়ী ফিরিয়া চা-পানের সময়েও এখানকার কথাই চলিতে লাগিল।

মেজবাবু বলিলেন, লক্ষ্য করেছ, বড়দা, এখানকার সকলেরই মুখের চেহারা যেন একই রকম।

বড়-দা বলিলেন, হ্যাঁ, তারপরই বলিলেন, তা অত লক্ষ্য করিনি—কেন এমন হ'ল!

—সবাই সমান নির্ব্বোধ বলে।—সব গরুরই মুখের ছাঁদ একই রকম, সব গরুই সমান গরু বলে—বুদ্ধির তারতম্য থাকলে চেহারাও আলাদা আলাদা হ'ত।

বড়বাবুর তখন মনে হইল, কথাটা ঠিক।

মেজবাবু পুনরায় বলিলেন, তুমি তখন বলছিলে, ওদের অভিযোগের বিচার করে দিইনি বলে ওরা ক্ষুণ্ণ হ'য়ে গেছে। কিন্তু, আমরা একজনকে আতঙ্কিত করে আর একজনের কার্য্যোদ্ধার করে দেব এর কোনো যুক্তি আছে কি!

বড়বাবু স্বীকার করিলেন তা নেই।

ছোটবাবু বলিলেন, আমি নাস্তিক নই, কিন্তু মনে করি, মানুষ নিজেকে কোনোদিন একেবারে অসহায় মনে না করলে ভগবানের অস্তিত্ব কল্পনা করত না। লোকগুলি ভগবানের একটি গুণ আমাদের প্রতি আরোপ করেছে, তিনি ত্রাতা।

মেজবাবু বলিলেন, ত্রাণ করবে কাকে!—খবরের কাগজ পড়ে তা জানতে পারি, আর যতদূর শোচনীয় মনে হয়, স্বচক্ষে দেখে তেমন মনে হচ্ছে না ত'!—কাগজে লেখে, এরা মৃত্যুর গ্রাসে পতিত, কিন্তু কই! একটা ছোট ছেলে কবে মরেছিল তার মায়ের কান্না শুনলাম, আর ত' কেউ মরার কথা বললে না।

বলে নাই সত্য! কিন্তু তল্লাস করিলে চিত্রগুপ্তের খাতার কি খবর বাহির হইয়া পড়িতে পারে তাহা জানিবার কথা কাহারও মনে পড়িল না—পড়িলেও, কার্য্যানুরোধে অঙ্কপাত আর গবেষণার শ্রম, আর ঐ হিসাবের অনুসন্ধানে কাল-চক্রের অনুধাবন করা সম্ভবপর হইত কিনা সন্দেহ।

বড়বাবু ভাবিতেছিলেন; বলিলেন, চেহারার কথা কি বলছিলে? সব একরকম? তা কি হয়!—তবে শিক্ষা পায়নি বলে তাদের মুখ আমাদের পছন্দ হয় না। কালোশশীর দেখা পাওয়া যায় নাই সমস্ত দিন।

ছোটবাবু বলিলেন, চমৎকার 'টাইপ', গাঁয়ের লোক নিজেকে চালাক মনে করলে ঐ রকমই দাঁড়ায়, গরু চরানর মতো করে মানুষ চরাতে চায়—আমাদের চরাবার চেষ্টাটা দেখেছ ত' !—ওর ওপর নির্ভর করাও যায় না, নির্ভর না করেও উপায় নেই - বেশ কিন্তু !

মেজবাবু বড়বাবু উভয়েই হাসিয়া বলিলেন,—হুঁ।

এবং সেই সময়েই কালোশশী, হাঁটুর উপর কাপড় তুলিয়া আর হাঁটুর উপর পর্যন্ত ধুলো মাখিয়া আসিয়া দাঁড়াইল—গরুর গাড়ী ধুলো উড়াইয়া চলিয়া গেছে—মাঠের ধুলো কালোশশীর চুলে আর ভুরুর উপরেও স্তূপীকৃত হইয়া পড়িয়াছে।

বড়বাবু বলিলেন, এই যে ! তোমার কথাই হচ্ছিল।

কালোশশী পুলকে আপ্লুত হইয়া গেল, বলিতে লাগিল, পরম সৌভাগ্য আমার ; ধন্য আমি।—এই আসছি সাত কোশ পথ হেঁটে - আসা যাওয়ায় একদিনে আঠাশ মাইল, আপনারা গাড়ী ঘোড়ার দেশের মানুষ—আঠাশ মাইল রাস্তা হেঁটে এসেছে শুনলে বোধ হয় অবাক হয়ে যাবেন। কিন্তু আমাদের ছেলেবেলা থেকে এই অভ্যাস। বলিয়া কালোশশী বাবুদের তুলনায় নিজেকে ক্ষুদ্র প্রমাণিত করিয়া হাসিতে লাগিল।

ছোটবাবু বলিলেন, বসো।

—না, বাবু, বসব না এখন—আপনারা কেমন আছেন তা-ই এক নজর দেখতে এলাম। ভালই আছেন দেখে খুশী হ'ল মনটা। আপনারা দেশের লোক হলেও আমাদের ত' চেনেন না, আমরা তাই অতিথি মনে করে ভাবছি, সৎকারের ত্রুটি না হয়।—সরাসর তা-ই এখানেই এলাম।

—আবার আসবে ত' একবার ?

—কিন্তু ততক্ষণ আপনাদের বোধ হয় আহারাদি শেষ হয়ে যাবে।—যদি তাড়াতাড়ি করে আসতে পারি।

—না তাড়াতাড়ি করতে হবে না—এই টাকা পাঁচটি সেই ঠাকুর মশায়কে দিও, কাল যিনি এসেছিলেন।

—তাঁকেই।

- তাঁর অসুখ করেছে শুনলাম।

—তবে দেন আমাকেই—এই পায়েই তাঁকে দিয়ে যাব। অসুখ-বিসুখেই দেশটা গেল।—বলিয়া কালোশশী পাঁচ টাকার নোটখানি লইয়া, আবার মৌখিক বিদায় লইয়া এবং আবার প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

সে অদৃশ্য হইতেই ছোটবাবু হঠাৎ হা-হা করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন।

কালোশশীর আকার ক্ষুদ্র - কিন্তু কেমন করিয়া সে আশ্চর্য তৎপরতার সহিত এক সময়েই চারি-চতুর্দ্দিকে জড়েজীবে নিজেকে চিহ্নিত করিয়া ফিরিতেছে—ধূর্ত্তের সর্বঘটে স্থিতিই ছোটবাবুর হাসির বিষয়।

পরিচ্ছেদ—৮

সন্ধ্যার পর বাতাস উঠিল।

ওদিকে অভয় কন্যাকে লইয়া সঙ্কটাপন্ন।

এদিকে কোথাকার একটা ছিদ্রের ভিতর সবেগে বায়ু প্রবেশ করিয়া থাকিয়া থাকিয়া সিটির মতো বাজিতেছে। অন্ধকারে গাছের পাতার আন্দোলন দেখা যাইতেছে না। একটা খরখর শব্দ উঠিয়া কখন হঠাৎ, কখন ক্রমে ক্রমে মৃদুতর নিশ্রুতি হইয়া যাইতেছে—নিকটে একটি সুরু করিতেই যেন অসংখ্য প্রাণ সেই পুলকে সরব হইয়া উঠিল। বাবুরা জানিতেন না যে, শৃগালের স্বভাবই ঐ।—দূরের একটা জঙ্গল হইতে আর একদল তার "উতোর গাহিয়া" গেল।

ছোটবাবু মনে মনে হাসিতে লাগিলেন।

একটা জোনাকি ঘরের ভিতর উড়িয়া আসিয়া ছোটবাবুর টেবিলের উপর বসিয়া ইতস্ততঃ ঘুরিতে লাগিল, ছোটবাবু দেখিলেন, তার নীলাভ আলোটা নিবিয়া নিবিয়া জ্বলিতেছে।

নাড়া পাইয়া গাছ হইতে একটি ফল টপ্ করিয়া মাটিতে পড়িল—শব্দটা ছোট, কিন্তু চারি দেয়ালের ধাক্কায় সে ঘরের ভিতর স্ফীত হইয়া উঠিল।

ছোটবাবু বলিলেন, এখানে ভৌতিক শব্দের খুব প্রাদুর্ভাব দেখছি; আমাদের ত্রিসীমানায় জীব আছে কিনা সন্দেহ, কিন্তু শব্দ হচ্ছেই।

মেজবাবু মাসিকপত্র পাঠ করিতেছিলেন; তিনি কথা কহিলেন না; বড়বাবু কলিকাতার চিন্তায় অন্যমনস্ক ছিলেন, তিনিও কথাটা কানে তুলিলেন না।

ছোটবাবু "অর্গ্যান" বাজাইয়া একটি গজল্ গাহিলেন, তাহাতে মিনিট পনর গেল; তারপর কি করা যায় ভাবিতেছেন, এমন সময় একটি স্ত্রীলোক ঘরের আলো যেখানে শেষ হইয়াছে আর বাহিরের অন্ধকার সুরু হইয়াছে ঠিক সেই সন্ধিস্থলে দাঁড়াইল।

—কে?—ছোটবাবু প্রশ্ন করিলেন আগন্তুককে; বড়বাবু এবং মেজবাবু প্রশ্ন করিলেন তাঁহাকে,—কে!

—স্ত্রীলোক একটি।

শুনিয়া উভয়ে একটু নড়িয়া চড়িয়া বসিলেন।

স্ত্রীলোকটি নিঃশব্দে সিঁড়ি বাহিয়া উঠিয়া আসিল, কাহাকে যেন বলিল, ওদের সবাইকার পায়ের ধুলো নে। আমি ছোঁব না, আছাড়া কাপড়ে;—

আট কি নয় বছরের একটি সুদর্শন ছেলে স্ত্রীলোকটির পশ্চাদ্দিক্ হইতে সম্মুখে আসিয়া সলজ্জ মুখে এক এক করিয়া বাবুদের পায়ের ধুলা লইয়া সরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বাবুরা চাহিয়া দেখিলেন, স্ত্রীলোকটি বিধবা, অর্ধ-অবগুণ্ঠিত মুখের শ্রী যতটা লক্ষিত হইল ততটা অসুন্দর নয়, চপলও নয়।

বড়বাবু কোমলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি চাই তোমার?

স্ত্রীলোকটি কিয়দ্দূরে মেঝের উপর বসিল—বাবুরা বুঝিলেন, দুই-এক কথায় শেষ হইয়া যায় এমন রহস্য কি সমস্যা লইয়া সে আসে নাই—কিছু সময় লইবে; না বলিতেই তাই বসিল।

কিন্তু স্ত্রীলোকটি সহসাই তার বক্তব্য সুরু করিতে পারিল না—কিয়ৎক্ষণ অধোমুখে নিঃশব্দ থাকিয়া অধোমুখেই সে বলিল,—অপরাধ নিও:না, বাবা, আমি গরীব বিধবা।—বলিয়া সে দুই করতল একত্র করিয়া একটি প্রণাম নিবেদন করিল, কি মার্জনা ভিক্ষা করিল, তাহা ঠিক পরিষ্কার হইল না—কিন্তু তার কণ্ঠস্বর শুনিয়াই ওঁদের মনে হইল, যাহাই বলুক, গুছাইয়া বলিবে।

প্রণামান্তর সে বলিতে লাগিল,—আমি যে কথা তোমাদের কাছে বলতে এসেছি, বাবা, প্রাণের ব্যাকুলি অসহ্য না হলে মানুষে তা পরের সুমুখে মুখে আনে না। — সে কথা বলবার নয়—

বড়বাবু ইতিপূর্ব্বে মনে মনে শপথ করিয়াছিলেন যে, বক্তব্য ব্যক্ত করিবার কাজে কাহাকেও বাধা দিবেন না, শেষ পর্য্যন্ত শুনিবেন—নিজের আবেগে বক্তা যাহাই বলুক, যতই তা অসংলগ্ন, শ্রুতির অযোগ্য হউক।

স্ত্রীলোকটি বলিতে লাগিল,—সে কথা বলা কেবল ঘরের লজ্জার কথা বলা নয়, তোমাদের সাদা মনে কলঙ্কের ছাপ দেয়া হবে। —বলিয়া স্ত্রীলোকটি থামিয়া বোধ করি ঘৃণ্য কাহিনী বলিবার স্পষ্ট অনুমতির প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

বড়বাবু বলিলেন,—তোমার যত কিছু বলবার আছে বলো, শুনতে আমাদের আপত্তি বা অনিচ্ছা নেই। তুমি স্ত্রীলোক হয়ে অসঙ্কোচে যা বলবে তা খুব অশ্রাব্য হয়তো হবে না।

স্ত্রীলোকটি মৃদু একটু হাসিল, বলিল,—আমারই মেয়ে আর জামাইয়ের কথা—

—জামাই বুঝি নেয় না মেয়েকে? বলিয়া ছোটবাবু অর্গ্যানের ডালা বন্ধ করিলেন।

তাঁহারই দিকে এক মুহূর্ত্ত দৃষ্টি তুলিয়া স্ত্রীলোকটি বলিল, নেয় না, কিন্তু তাই আমার বলবার কথা নয়।

—বলবার কি তা বলো।—বলিয়া ছোটবাবু অর্গ্যানের টুল ছাড়িয়া চেয়ারে আসিয়া বসিলেন—মেজবাবুর সেই 'ফুল বেঞ্চ' জাঁকিয়া উঠিল।

—আমার মেয়ের যখন বিয়ে দিই তখন তার বয়েস মাত্তর এগারো, আর জামাইটির বয়েস ছত্রিশ। জামাইয়ের ঘর দুয়ারের অবস্থা ভাল, আর ক্ষেত-খামার আছে; ভেবেছিলাম, মেয়ে সুখেই ঘরকন্না করবে; কিন্তু অদেষ্টের আপদ যে সঙ্গেই ছিল তা জানতাম না।— বলিয়া স্ত্রীলোকটি ক্ষণেক থামিয়াই বলিল,— জামাইয়ের একটি—বলিয়া স্ত্রীলোকটি থামিয়া রহিল—

বড়বাবু শালীনতা অতল জলে নিক্ষেপ করিয়া চোখ বুজিয়া বলিলেন,— রক্ষিতা ছিল?

—ছিল বাবা; বহুপূর্ব্ব হতেই। জামাইয়ের ঘর আর আমাদের ঘর আর তার ঘর এই গ্রামেই; তবু আমরা তা জানতাম না। মেয়ে শ্বশুর-ঘরে দু'মাস

থাকে, আমার কাছে আসে, আবার যায়, আবার আসে।—মেয়ের বয়েস বাড়তে লাগল, কিন্তু বয়েস তার গায়ে ফুটল না—

মেজবাবু কথাটা বুঝিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিলেন,—তার মানে?

কিন্তু ছোটবাবু আর বড়বাবু বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহারা কেহ কাহারো চোখের দিকে চাহিতে পারিলেন না—

স্ত্রীলোকটি বলিল,—বেটাছেলের বয়স হলে গোঁফ-দাড়ির রেখা দেয়, মেয়ে-ছেলেরও গায়ে তেমনি—

মেজবাবু বলিলেন,- ও। তারপর? বলিয়া কথাটাকে ফিরিয়া দিয়াও লাল হইয়া উঠিলেন।

—মেয়েকে সে একবার মেরে-ধরে তাড়িয়ে দিলে; আমি গেলাম বলতে-কইতে —আমাকেও সে হাত তুলে মারতে এল।

ছোটবাবু প্রশ্ন করিলেন,—তার মা, বাবা নেই? অর্থাৎ তোমার মেয়ের শ্বশুর শাশুড়ী নেই?

—শ্বশুর নেই, শাশুড়ী আছে; কিন্তু সে না থাকারই মধ্যে—সে অন্ধ। তার সোয়ামীর পারার দোষ ছিল—

ছোটবাবু চোখ নামাইয়া তাড়াতাড়ি বলিলেন,—যাক্।—আসল কথাই বলো। —বলিয়া ছোটবাবু মনে মনে শপথ করিলেন, পাশে খাল কাটিয়া গল্পের মূলস্রোতের শাখা বাহির করা ঠিক নয়, অতএব আর করিবেন না।

—খুব একটা সোরগোল হয়ে গাঁয়ে ঢি ঢি পড়ে গেল- মনের লজ্জায় মানুষের সামনে তখন আমি মুখ তুলতে পারিনে।—দশজনের কথায় জামাই মোটে আমল দিল না—বললে, করতে হয় একঘরেই করো, তবু ঐ কেটো-পুতুলকে আমি ভাত-কাপড় দিয়ে পুষব না—বলে সে তার জিনিষপত্তর নিয়ে তুললে সেই মেয়েটির বাড়ীতে, এ বাড়ী তালাবন্ধ রইল।—দশজনের পরামর্শে তখন মেয়েকে দিয়ে জামাইয়ের নামে খোরপোষের নালিশ করালাম; নুটিশ পেয়ে জামাই গিয়ে জবাব দিলে যে, ওর চরিত্তির ভাল নয়, ওকে আমি ত্যাগ করেছি।—বাড়ীর ছোটলোক-বাগ্দী রাখালের সঙ্গে ওর প্রেণয় আছে।—কিন্তু আদালতের হাকিম তা শুনলেন না—বললেন, সব মেয়েকেই সতী বলে ধরে নিতে হবে—অসতী প্রেমাণ করতে এমন প্রেমাণ চাই যার আর কাটাই নেই।—পরিবারকে খাওয়া-পরা দিতে সোয়ামী বাধ্য—আর চৌকিদারের এজাহারে পষ্ট জানা যাচ্ছে ঐ লোকটা ঐ বাড়ীতে রাত্রে যাওয়া-আসা করত- এখন সর্ব্বদাই থাকে। আর স্ত্রীর উপর যদি তার ভালবাসাই থাকবে তবে শত্তুর সেই বাগ্দীটাকে এখনো রেখেছে কেন?—বলে হাকিম আমার মেয়েকে মাসে মাসে আট টাকার খোরপোষের বরাদ্দ করে দিলেন—বাংলা মাসের পয়লা টাকা দিতে হবে—মেয়ের দাবিও ছিল তা-ই; পাঁপিরের মামলার খরচাও তাকে দিতে হ'ল অনেকগুলো টাকা—সে সরকারের টাকা, তখনি তারা আদায় করে নিয়েছে।—

মাসে মাসে আটটা করে টাকা গুণে দেয়া বড় কঠিন। জামাই তখন আমার কাছে এসে কেঁদে পড়ল; হাত-পা জড়িয়ে ধরে বললে,—আমার অপরাধ হয়েছে,মা, ক্ষমা করো; তোমার মেয়েকে তুমি পাঠিয়ে দাও—আর আমি তাকে কিছু বলব না।

আমি বললাম, বাপু, তুমি ফাঁদে পড়েই পা ধরতে এসেছ। আমার মেয়েকে তুমি

যে কলঙ্ক দিয়েছ তাতে তোমার মুখ দেখতেই নেই—তোমাকেও ধিৎকার, আমার মেয়ের অদেষ্টকেও ধিৎকার।—মেয়েও বললে, ও-র ঘরে আমি আর যাবো না।

জামাই সেদিনকার মতো মুখ বুজে চলে গেল; তার পরদিনই আবার এল প্রাণনাথ ঠাকুরকে সঙ্গে করে। ঠাকুরকে আপনারা জানেন—আপনাদের কাছে তিনি এসেছিলেন শুনেছি।—তিনিই ছিলেন জামাইয়ের দক্ষিণহস্ত—তাঁর বুদ্ধি নিয়েই জামাই মেয়ের নামে বাগ্দী অপবাদ দিয়েছিল; মামলাতেও তিনি জামাইয়ের হয়ে সাক্ষী দিয়েছিলেন—প্রধানই ছিলেন তিনি।

মিনিট-দশেক আগেই এই পূজ্যপাদ ব্রাহ্মণকে পাঁচ টাকা সাহায্য পাঠান হইয়াছে—মেজবাবু আর বড়বাবু ছোটবাবুর উপর একবার সংকেতময় দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিয়াই দৃষ্টি ফিরাইয়া আনিলেন—

ছোটবাবু একটু হাসিলেন মাত্র—

জ্যেষ্ঠদ্বয়ের অসাক্ষাতে এই দানটা না করিলেও দান সম্বন্ধে কালব্যয় করা ইংরেজি প্রবচন অনুসারে ক্ষতিকর মনে করিয়া তিনি ইচ্ছার উদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ইচ্ছাকে পূর্ণ করিয়াছিলেন—দাদাদের পরামর্শ লয়েন নাই, পরামর্শের ব্যাপারই বা কি এমন।

স্ত্রীলোকটি বলিতে লাগিল,—প্রাণনাথ ঠাকুরও অনেক নরম নরম করে মেয়েকেও রাজি করালেন, আমাকেও রাজি করলেন। বললেন, তোরা এখনও একঘরে হয়ে আছিস ত'? তোদের আমি জাতে তুলে দিচ্ছি দাঁড়া।

আমি বললাম, তুমি একবার জামাইয়ের টাকা খেয়ে আমাদের একঘরে করেছিলে, এখন আবার তারই টাকা খেয়ে ঘরে তুলতে এসেছ!—ঘর আমরা চাইনে; তবে অত করে যখন বলছ তখন মেয়ে পাঠিয়ে দেব, কেননা শ্বশুরঘরই মেয়েমানুষের তীর্থ্য।

জামাই নিজের বাড়ীর তালা খুলে তার জিনিস-পত্তর এই বাড়ীতে আনলে, মেয়েকে আমি বুঝিয়ে সুঝিয়ে পাঠিয়ে দিলাম, আজ তিনদিন হ'ল পাঠিয়ে দিয়েছিলাম; কিন্তু মেয়ে আজ দুপুরে আবার কেঁদে-কেটে আমার ঘরে পালিয়ে এসেছে।

মেজবাবু বলিলেন,—মেরেছে বুঝি?

স্ত্রীলোকটির চোখে জল টলটল করিতে লাগিল—বলিল,—মার ত' ভালই, বাবা; হাজার গুণে ভাল—আপন পরিবারকে কে না মারে? পাড়াগাঁয়ে পরিবারকে মারা এমন গা-শিউরণো কথা নয়। কিন্তু—

বলিয়া স্ত্রীলোকটি একটু থামিয়া মুখ ফিরাইয়া আঁচল দিয়া চোখ মুছিয়া লইল; তারপর বলিল—সেই ছোটলোক বাগ্দীটা, জামাইয়ের গরুর রাখাল সে বেটা—তার নামের সঙ্গে মেয়ের নাম জড়িয়ে জামাই খোরপোষের মামলায় জিততে চেয়েছিল, সে বেটা সুবিধে পেয়ে গেল—মেয়ের মুখের দিকে সে কেমন করে তাকায়, তাকিয়ে কেমন করে হাসে—মেয়ে তা সইতে পারল না—

—জামাইকে বলেছে?

—সে জানে। তারই উসকানিতেই বাগ্দীটা করছে ওকাজ, নতুবা সাহস পাবে কোথায়। —বলিয়া স্ত্রীলোকটি নীরব হইয়া রহিল।

ছোটবাবুর ক্ষুব্ধ অন্তরে অজ্ঞাতা বধূর ক্ষুব্ধ অন্তরের ধিক্ ধিক্ প্রতিধ্বনি

বাজিতে লাগিল ; এবং স্ত্রীলোকটির এই ক্ষেত্রে যাহা যাচঞা তিনিই তাহা প্রকাশ করিলেন ; বলিলেন, —এমন অভদ্র আচরণের কথা আমরা আগে কখনো শুনিনি —সম্ভব যে তা-ও হঠাৎ মনে করতে পারছিনে।—তোমার জামাইকে আর বাগ্দীকে ডেকে শাসন করে দেব এই কি তোমার ইচ্ছে ?

স্ত্রীলোকটি মাথার কাপড় আরো একটু টানিয়া দিয়াছিল ; মাথা নাড়িয়া জানাইল, ঐ তার ইচ্ছা বটে।

—তোমার গ্রামের লোকে তাকে শাসন করতে পারে না কেন ?

—ধমক্ ধামক্ দিতে পারে ; কিন্তু সূক্ষ্ম কথাকে তারা ছোট মনে করে, আর চোখের ইসারাকে তারা সূক্ষ্ম মনে করে…

মেজবাবু অস্থির হইয়া বলিয়া উঠিলেন, — ছিঃ, ছিঃ।—এই স্থানে জ্যাঠামশায় আমাদের বাস করতে পাঠিয়েছেন! তারপর ছোটবাবুকে উদ্দেশ্য করিয়া নিম্নস্বরে বলিলেন, —তুমি উত্তেজিত হ'ও না।

ছোটবাবুও নিঃশব্দ হইয়া রহিলেন—

বিসর্জনের পর সুগঠিতা বহুবর্ণা প্রতিমাকে জলের উপর টানিয়া তুলিলে যেমন দেখা যায়, তাঁহাদের শ্রীময়ী ভাবমূর্ত্তি তেমনি শ্রীহীনা হইয়া এই নীরবতার মাঝখানে বিরাজ করিতে লাগিল—অন্তঃস্রোতে তার সমুদয় বর্ণ-অলংকার রূপ পরিচ্ছদ ধুইয়া গেছে…শুধু রূপহীনতাই তার চরম দুর্গতি আর বিকৃতি নহে—তার অভিশপ্ত দেহ যেন দুরারোগ্য ক্ষত লইয়া দেখা দিয়াছে।

গোধূলিজাত রসাত্মক বাক্যের পিপাসা ছোটবাবুর আর অনুভূত হইতেছে না ; স্ত্রীলোকটিকে শেষ ও সুসঙ্গত কি কথাটা বলিতে দেওয়া যায়, বড়বাবু তাহাই চিন্তা করিতেছেন এবং মেজবাবু নিরপরাধী জ্যেষ্ঠতাতের প্রতি ক্রোধ দমন করিতেছেন, এমন সময় কান্ত বিশ্বাস চেনা পথ দিয়া অন্ধকারেই ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া প্রবেশ করিয়াই চোখে হঠাৎ প্রখর আলো লাগায় থমকিয়া চোখ পিট্‌পিট্ করিতে লাগিল…মুখে বলিল,—ধাঁ করে আলোটা বড় চোখে লেগেছে। বলিয়া স্পষ্ট করিয়া চোখ খুলিয়া বলিল,— বাবু শীগ্‌গির আসুন—অভয় তার মেয়েকে খুন করেছে। বলিয়া বাবুদের মুখের দিকে নিষ্পলকচক্ষে চাহিয়া সে ক্রমাগত হাঁপাইতে লাগিল…এই হাঁপানিটাও অবশ্য গল্প-গঠনের উপাদানের মধ্যেই —

সংবাদটা সহসা প্রবেশ করিয়া বাবুদের মনের কোথায় যাইয়া পড়িল তাহা নির্দ্দেশ করা কঠিন ; কিন্তু যা রুদ্ধ হইলে মানুষ একেবারে বাঁচে না সেই নিঃশ্বাস ব্যতীত সচেষ্ট প্রাণময়তার লক্ষণ তাঁহাদের আর কিছুই রহিল না…

সেই স্ত্রীলোকটি উঠিয়া দাঁড়াইল—

কান্ত বিশ্বাস বলিল, —অভয় নদী সাঁতরে পালিয়েছে দেখেই আমি আসছি… আমি চললাম, কালোশশীকে ডেকে নিয়ে আসি আপনাদের কাছে। বলিতে বলিতে যেমন হঠাৎ সে আসিয়াছিল তেমনি হঠাৎ বাহির হইয়া গেল…বাহির হইয়া সে ফিক্ করিয়া একটু হাসিল।

স্ত্রীলোকটি বাবুদের মুখের দিকে একবার চাহিয়া সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইল… তার আর কিছু শুনিবার কি বলিবার নাই—পিতা কর্তৃক পুত্রী হত্যার কাছে জামাতৃ কর্তৃক কন্যার নিগ্রহ অনুপাতে একেবারে তুচ্ছ হইয়া গেছে। তিন ভাই কেবল

বসিয়া রহিলেন. একটা পতঙ্গের গুঞ্জরণ ঘরের ভিতরটা পুনঃ পুনঃ প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল. একোদ্দিষ্ট একটা ফলকের মতো বাতাসের সিটি যেন চোখের সম্মুখে উন্মীলিত হইয়া রহিল···পাতার শব্দ উতরোল হইয়া একটানা বহিতে লাগিল···

কিন্তু সংবাদটা মিথ্যা বলিয়াই বোধহয় ভগবান তাঁহাদের প্রতি দয়া প্রকাশ করিলেন, বুকে ধড়ফড়ানি যন্ত্রণাটা দিলেন না, "খুন" শব্দটা বার্ত্তাবহ যে ভঙ্গীতে উচ্চারণ করিয়াছিল সেই ভঙ্গীটা ছোটবাবুর চোখের সামনে মূর্ত্ত হইয়া ভাসিতে লাগিল·· মেজবাবুর মনে পড়িতে লাগিল, কালোশশী সৎলোক বলিয়া প্রশংসাপত্র দিয়া একটি চুপচাপ লোককে অভয় বলিয়া পরিচিত করিয়া দিয়াছিল···

কিন্তু সকলের চেয়ে সাংঘাতিক অবস্থা হইল বড়বাবুর—

একজনের হাতের ধারাল কাটারি, আর একজনের তুঙ্গ কণ্ঠ, তৃতীয় ব্যক্তির হস্ত —সবগুলি জড়াইয়া একটি ত্রিশৃঙ্গ ত্রিশূলের মতো এককর্ম্মা একধর্ম্মী হইয়া যেন একই ক্ষেত্রে হত্যারঙ্গে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে···তিনি চক্ষু মুদিত করিয়া রহিলেন···

খানিক পরে ছোটবাবু বলিলেন,—বড়দা, প্যাক করতে বলি ?

বড়বাবু আর মেজবাবু উভয়েই বলিলেন,—বলো ।

রামহরিকে ডাকিয়া ছোটবাবু জিনিসপত্র গুছাইতে বলিয়া দিলেন, আর বড়বাবু বলিয়া দিলেন, কেহ যদি ডাকে তবে হাঁকাইয়া দিবি ।

পরিচ্ছেদ—৯

তিনজনে সাইকেলে উঠিতেছেন, এমন সময় জামাই-কন্যা-কাহিনী-উক্ত প্রাণনাথ ঠাকুর উত্তরীয়ে অসুস্থ দেহ এবং সুবর্দ্ধিত টিকি আবর্ত করিয়া আসিয়া দেখা দিলেন···

তখন সকাল ছ'টা—

কিন্তু পথ চলতি লোকের মুখে পাড়াগাঁয়ে সংবাদ খুব ত্বরিত বেগেই রটে ।

ছোটবাবু হাসিয়া বলিলেন,—যাচ্ছি ঠাকুর । টাকা ক'টি পেয়েছেন ?

টাকার কথাটা না বলিলে বাবুদের যাইবার কারণানুসন্ধান করিয়া সময়োপযোগী ক্ষোভ প্রকাশ প্রাণনাথ ঠাকুর নিশ্চয়ই করিতেন ; সে আক্কেল তাঁহার আছে ; কিন্তু টাকার কথায় তিনি চমকিয়া উঠিলেন এবং মানুষের এই আসিয়া এই যাওয়ার দুঃখটা সেই চমকে বিদ্ধ হইয়া নির্ব্বাক হইয়া রহিল— বলিলেন,—টাকা ! কই না !

—কালোশশীর হাতে দিয়েছি ।

শুনিয়া ঠাকুরের হতাশার কিছু বাকি রহিল না—মুখ চোখ বসিয়া গেল ; রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন,—কালোশশীর হাতে দিয়েছেন ! সে আর পাব না, বাবু । কালোশশীর হাতে টাকা পড়লে সে টাকা আর বেরোয় না ।

বাবুদের সাইকেল চলিতে লাগিল ।

———